শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০)

৭৮-৫০.

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মৈত্রী (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দ	৫
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮
মায়ের আলাপ	...	১২
সাবিত্রী মহাকাব্যের ভূমিকা	অনির্বাণ	১৯
বেদ ও আমাদের সংস্কৃতি	গৌরী ধর্মপাল	২৮
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি		৩৬
চন্দননগরের স্মৃতিচারণ	...	৩৮
উর্ধ্বায়ণ	শতদল	৪০
দুটি কবিতা	সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত	৪১
দুটি সনেট	জ্যোতির্ময়ী দেবী	৪২
একটি অপরাজিতার কাহিনী	ভাস্কর গুপ্ত	৪৩
সিদ (নাটক)	পিয়ের ক্রেঁই	৪৮

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০	,,	৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০	,,	৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathmondir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Ponicherry-2

756.3
002/25
P8447

756.3
002/25

Sri Aurobindo is

an emanation of the

Supreme who came on

earth to announce the

manifestation of the New

Era and a new world: the

Supramental

Let us prepare

for it in all sincerity

and eagerness.

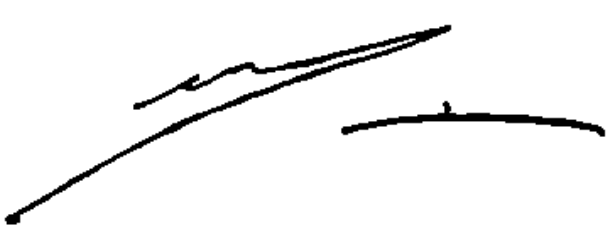

দৈত্য

শ্রীঅরবিন্দ

মহাযোগী সিদ্ধেশ্বর, আশুতোষ শূলী,
কৈলাসশিখরবাসী। যাঁহার প্রভাবে
কারণনিহিত বিশ্ব নিগূঢ় স্ববীজে,
রুদ্র ঘোরে, দৈত্যপ্রিয় মহেশ্বর শম্ভু।
দৈত্য আমি অংশ তোর। দারুণ প্রচণ্ড
নিষ্ঠুর অসহনীয় জ্বালাময়ী শক্তি
মম চিত্তে জ্বলে সদা দাবানল সম।
তব শক্তি জানি, তারে রোধি নাই শম্ভু।
এই শক্তিবশে আছি ক্রূর চণ্ডকর্ম্মা
ভীম সিংহনাদে পূরি দশদিক বিশ্বে
বিচরণ করি সদা, দলি মানবের
ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি, বধি গর্ব্বিত ক্ষত্রিয়ে,
পাষণ্ড ব্রাহ্মণ ভণ্ডে, এই শক্তিস্রোতে
পুরাতন ভাঙ্গি চূর্ণি নবীন প্রয়াসী।
ব্রাহ্মণের ছলনায় অন্ধ নরজাতি।
ব্রাহ্মণের কুশিক্ষায় পদানত সদা
মনুষ্যত্ব হারাইয়া দাসত্বে ব্যসনী
স্বধর্ম্ম ভুলেছে নর, অনার্য্য দুর্ব্বল
নীচক্ষুদ্রকর্ম্মা। মহতী বেদান্ত শিক্ষা
বিকৃত করিয়া নিত্য বিহরিছে ভণ্ড,
ভেদনীতি. প্রসারিয়া স্বার্থ-সিদ্ধপটু
"মহান মহান আমি পড় পদপ্রান্তে
নরগণ," এই রবে ধর্ম্ম সত্য সুখ
মজাইয়া মানবের কঠিন নিগড়ে
চিরকাল রাখে বাঁধি'। হে মহাতপস্বী,
হে ভেদবিজয়ী প্রাজ্ঞ, প্রনষ্ট-আশ্রয়,
সমবুদ্ধি। তব রাজ্যে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল
সমান। অপক্ষপাতী ঈশ্বর সর্ব্বদা।
উচ্চ নীচ ছোট বড় স্বকর্ম্মে স্বগুণে।
ক্ষণস্থায়ী সেই ভেদ, স্থায়ী অন্তঃস্থলে
অভেদ অপাপ শুদ্ধ সমধর্ম্মী-আত্মা
একপ্রাণ একজাতি প্রেম ন্যায়-ডোরে

মানবের শত জাতি সচেষ্ট বাঁধিতে।
যুগে যুগে মহেশ্বর মানব-অন্তরে
হুতাশন সম উঠি অন্যায় অনৃত
অবিচার অত্যাচার ভস্ম করে জ্বলি।
ছাড়ে না তথাপি স্বার্থ, অনৃত আবার
সত্য-নাম-বেশধারী ভুলায় মানবে।
কপট অধর্ম্ম দিয়া মোহাই ধর্ম্মের
জগতের সিংহাসনে বিরাজে আবার।
ক্রোধে জ্বলি সদা, শম্ভু, চাই উছলিয়া
নিক্ষলম মহানাদে ভীমশক্তি বলে,
বিনাশ করিতে যত মিথ্যা এই ভবে,
গড়িব নূতন বিশ্ব যেথা না আসিবে
অনৃত কলহ স্বার্থ। একপ্রাণ সদা
গভীরে অনুপ্রাণিত সুখী নরজাতি
হর্ষপূর্ণ প্রেমপূর্ণ বিশাল সমাজে
মসৃণ প্রীতিনিগড়ে বদ্ধ একতায়
আনন্দবিভোর যেন দেবতা নন্দনে
ভেদ স্বার্থ যুদ্ধ ভুলি ধরাগত স্বর্গ
ভুঞ্জিবে। মহতী আশা বিরাজে সর্ব্বদা
এ হৃদয়ে। বিরোধে ব্রাহ্মণ ধূর্ত্তমনা,
বিরোধে নৃপতি স্বার্থপর, ধনপ্রিয়
বৈশ্য, ঈর্ষ্যাপরায়ণ দেবজাতি দিবে।
আর না সহে এ প্রাণে বিশ্বের যাতনা,
আর না সহে এ প্রাণে এ ক্রন্দনধ্বনি।
উঠিব উঠিব, শম্ভু, মহাক্রোধানলে
দগ্ধ করি শত্রুগণে সাম্য সত্য প্রেম
প্রচার করিব বিশ্বে। ধৌত করি রক্তে
শুদ্ধ করিবারে উঠি মলিন পৃথিবী।
ব্রাহ্মণের রক্তে ডুবি মিথ্যা ও অনৃত,
ক্ষত্রিয়ের রক্তে ডুবি সবল অন্যায়*
বৈশ্যরক্তে ডুবি স্বার্থ মজিবে মজিবে,
আর না উঠিবে মাতি ভারাক্রিষ্ট ধরা
সবলের অট্টোল্লাসে দুর্ব্বল-ক্রন্দনে।
সংহারিব সংহারিব দেবতা নন্দনে

---

* বিকল্প : ডুবুক ক্ষত্রিয়রক্তে দৃপ্ত অত্যাচার

ছারখার করি স্বর্গ, শ্মশান হইবে
স্বার্থকলুষিত সুখ। অমরের প্রাণে
প্রবেশ করাতে মৃত্যু দাও মোরে শক্তি।
চায় রক্ত চায় রক্ত সংক্ষুব্ধা করালী।

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—১৬শ সূক্ত

১। অয়মগ্নি সুবীর্যস্যেশে মহঃ সৌভগস্য।
রায় ঈশে সুপত্যস্য গোমত ঈশে বৃত্রহথানাম্ ॥১॥

অয়ম্—এই
অগ্নিঃ—অগ্নি
সুবীর্যস্য—পরমবীর্যের, বীরশক্তির
ঈশে—অধিপতি, শক্তিমান
মহঃ—মহান, বিপুল
সৌভগস্য—পরম ভোগানন্দের
রায়ঃ—ধনের সম্পদের
ঈশে—অধিপতি, শক্তিমান
সু-অপত্যস্য—উৎকৃষ্ট শোভন সন্তান-সন্ততির
গো-মতঃ—জ্যোতির্ময় গো-যূথের
ঈশে—অধিপতি, শক্তিমান
বৃত্র-হথানাম্—বৃত্র হননের জন্য

এই যে অগ্নিদেব, মহাবলের এবং মহা ভোগানন্দের অধিপতি তিনি, তিনি হলেন অধিপতি গো-ধনের আর সমর্থ সন্তান-সন্ততির, বৃত্রদের সমর্থ হন্তা তিনি ॥১॥

২। ইমং নরো মরুতঃ সশ্চত বৃধং যস্মিন্রায় শেবৃধাসঃ।
অভি যে সন্তি পৃতনাসু দূঢ্যো বিশ্বাহা শত্রুমাদভুঃ ॥২॥

ইমম্—এই
নরঃ—হে শক্তিমান দেবতা
মরুতঃ—হে প্রাণশক্তিবৃন্দ
সশ্চত—তোমরা ধরে থাক
বৃধম্—ক্রমবর্ধমান (অগ্নিকে)
যস্মিন্—যার মধ্যে
রায়ঃ—ধনসম্পদ
শেবৃধাসঃ—আনন্দের বর্ধক
অভি (+সন্তি)—বিরুদ্ধে রয়েছে
যে—যারা

(অভি+) সন্তি—বিরুদ্ধে রয়েছে
পৃতনাসু—যুদ্ধে
দুঃ+ধ্যঃ (দুচ্যঃ)—দুর্মতি যারা
বিশ্বাহা—প্রতিদিন, দিনের পর দিন
শত্রূন্—শত্রুদের
আ-দভুঃ—বিনষ্ট করেছে, ধ্বংস করেছে

হে দেবতা, হে প্রাণশক্তিস্বরূপ তোমরা ধরে আছ সেই ক্রমবর্ধমান অগ্নিদেবকে যাঁর মধ্যে রয়েছে আমাদের আনন্দবর্ধক ধনরাশি, দিনের পর দিন তারা ধ্বংস করছে আমাদের শত্রুদের, সেই সব দুর্মতিদের যারা যুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে ॥২॥

৩। স ত্বং নো রায়ঃ শিশীহি মীঢ্বো অগ্নে সুবীর্যস্য।
তুবিদ্যুম্ন বষিষ্ঠস্য প্রজাবতোঽনমীবস্য শুষ্মিণঃ ॥৩॥

সঃ—সেই
ত্বম্—তুমি
নঃ—আমাদের
রায়ঃ—ধনসম্পদ
শিশীহি—দান কর
মীঢ্বঃ—প্রাচুর্যদাতা
অগ্নে—হে অগ্নি
সুবীর্যস্য—পরমবীর্যের, পরম বীরশক্তির, পরম বলবত্তার, শৌর্যবলের
তুবিদ্যুম্ন—বহুল দ্যুতিময়
বষিষ্ঠস্য—পরমধনে ধনীর
প্রজাবতঃ—সন্তানসন্ততিদের
অনমীবস্য—দুঃখশোকবর্জিত
শুষ্মিণঃ—শক্তিমত্তার

হে অগ্নি, বহুল দ্যুতি তোমার, আমাদের কাছে নিয়ে এস সেই সম্পদ তোমার যা পরম-ধনে ধনী, শোকবর্জিত বলীয়ান ; যা পরিপূর্ণ বীর্যে সন্তানসন্ততিতে এবং শৌর্যে ॥৩॥

৪। চক্রির্যো বিশ্বা ভুবনাভি সাসহিশ্চক্রির্দেবেষ্বা সুবঃ।
আ দেবেষু যততা আ সুবীর্য আ শংস উত নৃণাম্ ॥৪॥

চক্রিঃ—কর্মী
যঃ—যে
বিশ্বা—বিশ্ব
ভুবনা—ভুবনের
অভি—মধ্যে
সাসহিঃ—শক্তিপ্রয়োগ করছেন

চক্রি—কর্মী (তিনি)
দেবেষু (+আ)—দেবতাদের মধ্যে
ধুবঃ—কর্মরাজির
(আ+) দেবেষু—দেবতাদের মধ্যে
যততে—শ্রম করে চলেছেন, প্রযত্ন করে চলেছেন
আ+সু-বীর্যে—শক্তিমত্তার মধ্যে
আ+শংসে—আত্মপ্রকাশের মধ্যে
উত—এবং
নৃণাম্—মানুষের

তাঁর শক্তি তিনি প্রয়োগ করছেন, সকল ভুবনের তিনিই কর্তা, সকল দেবতাদের মধ্যে তিনিই কর্মকর্তা, তিনিই প্রযত্ন করে চলেছেন দেবতাদের মধ্যে, সকল সামর্থ্যের মধ্যে, মানুষের আত্মপ্রকাশের মধ্যে ॥৪॥

৫। মা নো অগ্নেঽবতয়ে মাবীরতায়ৈ রীরধঃ।
মাগোতায়ৈ সহসস্পুত্র মা নিদেঽপ দ্বেষাংস্যা কৃধিঃ ॥৫॥

মা—না, করো না
নঃ—আমাদের
অগ্নে—হে অগ্নি
অবতয়ে—অনতির কাছে, অচেতনার কাছে
মা—করো না
আবীরতায়ৈ—অবীরত্ব, বীরত্বের অভাবের কাছে
(মা+) রীরধঃ—অর্পণ কর (না)
মা—করো না
গোতায়ৈ—গো-শূন্যতার কাছে, গাভীর অভাবের কাছে
সহসঃ+পুত্র—হে শক্তির পুত্র
মা+নিদে—বন্ধনের কাছেও নয়
অপ (+কৃধিঃ)—দূরে সরিয়ে দাও
দ্বেষাংসি—শত্রুদের, বিদ্বেষীদের
আ—আমাদের কাছ থেকে
(অপ+) কৃধিঃ—দূরে সরিয়ে দাও

হে অগ্নি, অচেতনার কাছে আমাদের ধরে দিও না, ধরে দিও না বলহীনতার কাছে, জ্যোতিহীনতার কাছেও নয়, বন্ধনের কাছেও নয়; হে শক্তির পুত্র, আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও দ্বেষীদের ॥৫॥

জ্যোতি—মূলে গো—গো-ধন।

৬। শন্নি বাজস্য সুভগ প্রজাবতোঽগ্নে বৃহতো অধ্বরে।
সং রায়া ভূয়সা সৃজ ময়োভুনা তুবিদ্যুম্ন যশস্বতা ॥৬॥

শন্নি—সমর্থ হও তুমি
বাজস্য—পরিপূর্ণতার জন্য
সু-ভগ—হে পরম আনন্দময়
প্রজা-বতঃ—সুফলপূর্ণ, ফলপ্রদ
অগ্নে—হে অগ্নি
বৃহতঃ—বৃহতের জন্য
অধ্বরে—এই যজ্ঞযাত্রায়
সম্ (+সৃজ)—সংযুক্ত করে ধর
রায়া—সম্পদের সঙ্গে
ভূয়সা—প্রভূত
(সম্+) সৃজ—সংযুক্ত করে ধর
ময়ঃ-ভুনা—আনন্দের সৃষ্টা
তুবি-দ্যুম্ন—হে বহুল দীপ্তিময়
যশস্বতা—মহিমাময়

সমর্থ হয়ে ওঠ এই যজ্ঞযাত্রায়, ফলপূর্ণ পরিপূর্ণতার জন্য, বহুল জ্যোতিধারা তোমার, আমাদের সংযুক্ত করে ধর সেই বিপুল, সেই মহিমাময় সম্পদের সঙ্গে, পরম আনন্দ নিয়ে আসে যে ॥৬॥

মায়ের আলাপ

১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫

(Les Bases du Yoga, pp. 88-93, ed. Ashram)

শ্রীমা : যা, এখানে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "পার্থিব কোন জিনিসের প্রতিই আসক্তি থাকা উচিত নয়," তাহলে তুমি যখন আমাদের কিছু দাও, আর সেটা যদি হারিয়ে যায় এবং আমরা সে জন্যে কষ্ট পাই, সেটাও কি একটা আসক্তি ?

শ্রীমা : উচিত সেটা না হারানো (সকলের হাস্য)। তবে সত্যি বলতে, ব্যাপারটা যেন নিছক বাহ্য জিনিসটার প্রতি আসক্তিতেই না দাঁড়ায়...সেটা থাকা উচিত নয়। জিনিসটার মধ্যে যেটা রয়েছে, অর্থাৎ আমি যেটা দিয়ে রাখি সেটার ভিতর, তার দিকেই নিজেকে খুলে রাখা উচিত। সেটাই হল আসল কথা। অবশ্য, দুর্যোগ একটা সকল সময়েই ঘটতে পারে। এটা নিশ্চিত যে, তুমি যদি জিনিসটার প্রতীক মূল্য বা তার ভিতরকার আধ্যাত্মিক মূল্য দাও, তাহলে সেটাকে হারানোর সম্ভাবনা খুবই কম হয়, কারণ তাহলে সেটার সঙ্গে তোমার এক রকমের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, যার দরুণ সেটাকে হারানোর সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে না। সেটা তোমার কাছে কাছেই থাকে।

আমার ধারণা, আমি কাউকে একটা কিছু দিলে সে যদি সেটা হারিয়ে ফেলে, তখন বুঝতে হবে, জিনিসটা বাহ্যত যা, সেই খোসাটার প্রতিই সে আকৃষ্ট হয়েছিল, যেটা আমি জিনিসটার ভিতরে রেখেছিলাম তার প্রতি হয়নি, নইলে সেটা হারিয়ে যেত না। মনে হয় এর পিছনে বেশ একটা গভীর ভাবে অনুভব করবার শক্তির অভাব রয়েছে। সম্ভবত জিনিসটার চেহারা দেখেই সে খুব মেতে উঠেছিল, সেটার পিছনে যা ছিল তা উপলব্ধি করার দিকে তার বিশেষ ঝোঁক ছিল না।

শ্রীমা : এখানে লেখা রয়েছে, "বিশেষ করে একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে বিশেষ রকমের খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন, যেগুলোর মধ্যে বিশেষ বিশেষ ভিটামিন আছে, কারণ সেগুলো দরকার...?

শ্রীমা : ও হল আধুনিক বিজ্ঞানের কথা...হ্যাঁ,...বেশ কথা, যদি পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা কর, তত দিনে ওরা অন্য আরও সব জিনিস আবিষ্কার করে ফেলবে, আর ও সব বদলে যাবে, ভিটামিনের কথাও লোকেরা ভুলে যাবে...কিন্তু সে কথা যাক, তুমি কি জানতে চেয়েছিলে ?

শ্রীমা : উত্তর ত তুমি দিয়েই দিলে। (সকলের হাস্য)
কিভাবে জিনিসগুলোকে ব্যবহার করা উচিত ?

শ্রীমা : আ ! সেটা হল...প্রথমত জিনিসগুলো সত্য সত্যই কি কাজে লাগতে পারে সেটা জানা চাই, সেগুলোর সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই, যাতে নষ্ট বা বিকৃত না হয় এবং সব চেয়ে কম গণ্ডগোল হয়, সে বিষয়ে সব চেয়ে বেশী যত্নবান হওয়া চাই।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ধর, তোমার একজোড়া কাঁচি আছে। কাঁচি ত নানা-রকমেরই ধর, কোনটা কাগজ কাটার জন্যে, কোনা সুতো কাটার জন্যে...এখন তোমার যে কাঁচিটা দরকার ঠিক সেটাই যদি তোমার কাছে থাকে, তাহলে সেটাকে সেই কাজের জন্যেই তুমি ব্যবহার করবে। কিন্তু আমি এমন লোকেদের জানি, যাদের কাছে কাঁচি থাকলে তারা কোনরকম বাছ-বিচার না করে তা দিয়ে যা খুশি তাই কাটে। কখন ছোট ছোট রেশমী সুতো কাটছে, কখন তাই দিয়ে আবার পাতলা লোহার তার কাটছে, এমন কি সেই কাঁচি দিয়েই তারা আচারের টিনের ঢাকনা পর্যন্ত কাটছে। যে কোন কাজে তাদের একটা যন্ত্রের দরকার হলেই হাতের কাছের সেই কাঁচিটা দিয়ে তারা কাজ সারে। তার ফলে, স্বভাবতই কিছু দিন পরে তারা এসে আমাকে বলে, "আমার কাঁচিটা খারাপ হয়ে গেছে, আমি আর একটা চাই।" আমি যখন তাদের বলি, "না, তুমি আর একটা কাঁচি পাবে না, কারণ তুমিই ওটা নষ্ট করেছ, তুমি কাঁচি ব্যবহার করতে জান না," তখন তাদের আঁতে ঘা লাগে, একেবারে অবাক হয়ে যায়। আর এ-ত গেল মাত্র একটা, এমন আরও খুড়ি খুড়ি দৃষ্টান্ত তোমাদের দিতে পারি।

লোকেরা কোন একটা জিনিস ব্যবহার করে ফেলে রাখলে, সেটাতে ময়লা পড়ে, ক্রমশ ময়লা লেগে লেগে কিছুদিন পরে সেটা নষ্ট হতে আরম্ভ করে। কিন্তু সেটাকে যে পরিষ্কার করা উচিত তা তারা ভুলে যায় বা গা করে না, কারণ তা করতে আবার সময় লাগে ত।

তোমার কাছে যে জিনিসটা আছে, সেটার প্রতি একরকমের শ্রদ্ধার ভাব থাকা চাই, উচিত সেটাকে খুব সাবধানে এবং যত্ন করে ব্যবহার করা, এবং যতদিন সম্ভব নষ্ট হতে না দিয়ে বজায় রাখা। তার কারণ এ নয় যে, সেটার প্রতি তোমার ভীষণ টান আছে, এবং তুমি সেটা হাতছাড়া করতে চাও না। কারণটা হচ্ছে, যে কোন জিনিসই হোক তা শ্রদ্ধার পাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে সেটাকে তৈরী করতে অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছে এবং প্রচুর মেহনৎ করতে হয়েছে, সুতরাং যে পরিমাণে চেষ্টা এবং খাটুনি তার পিছনে দেওয়া হয়েছে সেটা বিবেচনা করে জিনিসটার প্রাপ্য শ্রদ্ধা তাকে দেওয়া দরকার।

কেউ কেউ আছে, যাদের কোন কিছুই নেই, এমন কি যেটা না হলে নয় এমন জিনিসও নেই। তারা নিজে হাতে, যেমন তেমন করে হোক সেগুলো তৈরী করতে বাধ্য হয়, কারণ তাদের রোজকার ব্যবহারের জন্যে সেগুলো দরকার। তেমন কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তারা সত্যিই প্রচুর মেহনৎ করে এবং দস্তুর মতো মাথা ঘামিয়ে এমন কতক-গুলো জিনিস তৈরী করতে পেরেছিল যেগুলো না হলে চলে না। কিন্তু কত যত্ন নিয়ে, কি ভাবে যে তারা সেগুলোকে ব্যবহার করত তা সত্যিই দেখবার জিনিস ছিল, কারণ জিনিস-গুলোকে গড়ে তুলতে তাদের যে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে, সে কথা তারা সঠিক মনে রাখত আর নিজে হাতে তৈরী করেছে বলে, সেগুলোর প্রতি কি মমতাই না তাদের ছিল। অথচ দেখ, যাদের পকেট বোঝাই টাকা তাদের কোন জিনিসের দরকার হলেই সোজা দোকানে গিয়ে টাকা ফেলে সেটা কিনে নিয়ে আসে। সেগুলোর প্রতি তারা কোনরকম যত্ন শ্রদ্ধা দেখায় না। তার দ্বারা তারা যে কেবল নিজেদেরই অপমান করে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অতি কদর্য দৃষ্টান্ত দেয়।

কতবার আমায় বলতে হয়েছে, "না, তোমার কাছে যেটা রয়েছে সেটাই কাজে লাগাও। যতদূর সম্ভব ভাল করে সেটাকে ব্যবহার করতে চেষ্টা কর। শুধু শুধু ফেলে দিও না, অনর্থক চেও না। তোমার কাছে যেটা আছে তাই দিয়েই চালিয়ে নিতে চেষ্টা কর, সেজন্যে যে পরিমাণ যত্ন, শৃঙ্খলা এবং কৌশল প্রয়োগ করা দরকার, আর দেখো, যেন কোন রকম গণ্ডগোল না হয়।"

শ্রীমায়ের আমাদের কাছে একটা ছোট্ট নোটবই* আছে। প্রতি মাসে সাধকদের যা যা দরকার সেগুলো তাতে লিখে দিত। পরে দেখা গেল, চাহিদা অতিমাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে বরাদ্দের পরিমাণ ঠিক করে দিতে হল। কিন্তু তাতেও প্রায়ই উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল ফলতে লাগল।

মনে পড়ছে, একবার একজন সাধকের ঘর দেখতে গিয়েছিলাম। সে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। কাহিনীটি এখনও আমার বেশ মনে আছে। তার ঘরের দেয়ালে একটা গা-আলমারী ছিল, তাতে পাঁচটা তাক। আলমারীটা দিব্যি বড়... সবকটা তাকই ভর্তি। ছোট ছোট কাপড়কাচা সাবানের টুকরো দিয়ে ঠেসে ভর্তি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কি কাণ্ড! এত সব সাবানের টুকরো দিয়ে তুমি কর কি? এগুলো জমিয়ে রেখেছ কেন? ব্যবহার করলেই ত পার!" সে অম্লান বদনে বললে, "আমাদের ত প্রতি মাসেই একটা করে সাবান বরাদ্দ আছে। তাই প্রতি মাসে আমি একটা করে নিই। কিন্তু মাসে পুরো একটা সাবান আমি শেষ করে উঠতে পারি না। তাই টুকরোগুলো জমিয়ে রাখি।"

প্রশ্ন : না, সে কি তার পরেও নিতে লাগল? (সকলের উচ্চহাস্য)।

শ্রীমা : ব্যাপারটা ছিল ওই রকম। সে জমাচ্ছিল, কারণ একটা করে সাবান তার বরাদ্দ ছিল, তাই সে একটা নিত। আর নিত বলেই আগের টুকরোটা সরিয়ে রাখত। গল্পটি নিছক সত্য ঘটনা, আমি একটুও বানিয়ে বলছি না।

এখানে অনেকেই আছেন যাঁরা ওই গোত্রেরই। অবশ্য আমি তাঁদের নাম করব না, তবে তাঁদের আমি ভাল করেই চিনি। অনেকেই ওই রকম। তাদের নেবার অধিকার আছে, তাই তারা নেবে। দরকার না হলেও নেবে। এ হল—সত্যিই এমন একটা মনোবৃত্তি...এর সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভাল।

আমার কৃপণও আছে। সে সোনার মোহর দিয়ে সিন্দুক বোঝাই করে, কিন্তু কোনদিন ব্যবহার করে না। সোনা কখন নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু যথার্থত নৈতিক

---

* Prosperity—প্রসপারিটি ("শ্রীবৃদ্ধি") থেকে প্রতি মাসের পয়লা আশ্রমের সাধকদের জন্যে প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র দেওয়া হয়। যেমন সাবান, তেল, দাঁতের মাজন, জামা, কাপড় প্রভৃতি। তারা নোটবুকের একটি কাগজে লিখে, সেটি মাসের শেষ সপ্তাহে উক্ত বিভাগে দিয়ে আসে। আগেকার দিনে মা নিজে প্রত্যেকের কাগজ দেখে অনুমোদন বা সংশোধন করে দেওয়ার পরে জিনিসগুলি তাকে দেওয়া হত। এখনকার দিনে তাঁরই ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা সে কাজ সেইভাবেই করে থাকেন।

দিক থেকে তা নষ্ট হয়। কারণ যে জিনিসটা হাতে হাতে যোয়েনা, সেটা খুবই অসুস্থ হয়। যাক, এসম্বন্ধে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রশ্ন : মা, কোন্ জিনিসগুলো আমাদের জীবনে সত্যিই না হলে নয়?

শ্রীমা : আমার ত মনে হয় না যে সকলের বেলায় তা একই জিনিস হবে। সেটা নির্ভর করে দেশের উপর, নির্ভর করে লোকেদের অভ্যাসের উপর, আর সত্যি বলতে, যদি খুঁটিয়ে দেখা যায়, তাহলে আমার বিশ্বাস, খুব বেশী কিছুর দরকার হয় না। ব্যাপারটা কি জানো, যদি পৃথিবীর নানা জায়গা ঘুরে বেড়াও ত দেখবে, প্রত্যেক দেশের লোকেদের শোবার অভ্যাস আলাদা রকমের, খাবার অভ্যাস আলাদা রকমের, জামাকাপড় পরার অভ্যাস আলাদা রকমের, স্নান প্রসাধন ইত্যাদি করার অভ্যাস বিভিন্ন রকমের। আর স্বভাবতই তারা তোমায় বলবে, যে সব জিনিস তারা ব্যবহার করে থাকে সেগুলো তাদের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু সেখান থেকে আর এক দেশে যাও, দেখবে সেখানকার লোকেদের জন্যে, আগের ওই সব জিনিস কোনই কাজে লাগবে না, কারণ তারা অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করে, আর সেগুলো তাদের কাছে অতখানিই দরকারী, সে সব তাদের না হলেই নয়। এর পরে আরও অন্য দেশে যাও, দেখবে সেখানে একেবারেই অন্য জিনিস চাই। তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, যে লোকটা এইভাবে নানা দেশ কিছুটা দেখে বেড়িয়েছে, সে মনে মনে ভাববে, "সত্যিই কোন্ জিনিসটা না হলে নয়? আমার মতে একটা দাঁতমাজার ব্রাশ অপরিহার্য। আমার প্রতিবেশী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "টুথ্‌ব্রাশ" আবার কি জিনিস? আমি ত আঙুল দিয়ে দাঁত মাজি। তাতে দিব্যি কাজ হয়।" সব কিছুর বেলাতেই ওই রকম।

খাদ্যবস্তুর বেলায় দেখ, তোমার ধারণা বিশেষ কতকগুলো খাবার জিনিস তোমার না হলে চলে না, কারণ সেগুলো থেকেই তুমি প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে থাক। আর ঠিক ওই বিশেষ জিনিসগুলিই তোমার চাই, কারণ ওইগুলিই খেতে তুমি অভ্যস্ত। কিন্তু অন্য একটা দেশে তাদের সম্পূর্ণ অন্য জিনিস চাই।

তাই নিয়ম বেঁধে দেওয়া চলে না। আর যদি কেউ সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে চলার পক্ষপাতী হয়, আমার বিশ্বাস, সেটা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার, কারণ সেটা প্রত্যেকের নিজের নিজের দেহের উপরই নির্ভর করে। মানুষের চেতনার যত বিস্তার হতে থাকে ততই সে লক্ষ্য করে, আগে যে সব জিনিস তার না হলে চলত না, সেগুলো মোটেই অপরিহার্য নয়। সেগুলো ছাড়াও তার স্বাস্থ্য দিব্যি ভাল আছে, সে বেশ ভাল করেই কাজকর্ম করতে পারছে, আগে সেগুলোকে অপরিহার্য বলে ভাবত, সেগুলো না পেয়েও সে যথেষ্ট শক্তিশালী। সারা পৃথিবীতে অপরিহার্য বলে কিছু আছে কি? আমি স্থূল, বাহ্য জিনিসের কথাই বলছি। হ্যাঁ, বলতে পার, কিছুটা খাদ্যবস্তু—সে বিষয়েও কোন সাধারণ নিয়ম বেঁধে দেওয়া চলে না। কারণ সেটা আবার নির্ভর করে স্থানীয় আবহাওয়ার উপর।

প্রকৃতি যথেষ্ট দূরদর্শী। প্রত্যেক ঋতুতে সেই সময়কার উপযোগী খাদ্যবস্তু সে উৎপন্ন করে। কিন্তু তাই বলে মানুষকে এর মধ্যে জড়ানো চলবে না, বললে চলবে না যে, প্রকৃতি এটা করছে মানুষের কল্যাণের জন্যেই, কারণ আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা তা নয়।

মানুষ পৃথিবীতে আসার অনেক আগে থেকেই প্রকৃতি ওসব উদ্ভাবন করেছিল। তবে এটা ঠিক যে, কোন একটা দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে সেখানকার উৎপন্ন বস্তুগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়। ঠিক যেমন লক্ষ্য করা গেছে যে একটা দেশের পশুদের বিরাট আকৃতির সঙ্গে সেই দেশের আয়তনের বিরাটত্বের একটা সামঞ্জস্য আছে। উদাহরণ যেমন, ভারতবর্ষের হাতীগুলো আফ্রিকার হাতীদের চেয়ে আকারে অনেক ছোট। লোকে বলে, তার কারণ আফ্রিকা হল বিরাট দিগন্তবিস্তৃত, তাই সেখানকার জানোয়ারগুলোও বিরাট আকারের।

সৃষ্টিতে একরকমের সামঞ্জস্য বিধান হয়ে থাকে, তাই যে পরিমাণে কোন দেশ আয়তনে সংকীর্ণ হতে আরম্ভ করে, সেখানকার পশুরা সেই সব অঞ্চলের সংকীর্ণতা অনুসারে খর্বাকৃতি হয়ে থাকে। তারপর যখন সেখানকার খোলা জায়গার আয়তনের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে পশুদের আয়তনের আর সামঞ্জস্য থাকে না, তখন তারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যদি প্রচুর ঘরবাড়ি গড়ে তুলতে থাক, তাহলে ভাল্লুক, নেকড়ে প্রভৃতি আর থাকবে না। স্বভাবতই প্রথমে সিংহ আর বাঘগুলো বিলুপ্ত হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মানুষ এ ক্ষেত্রে কিছুটা দায়ী...ভয়ের দরুণই মানুষ ধ্বংস করতে লেগে যায়। কিন্তু লোকসংখ্যা যত বেশী বাড়তে থাকবে আর খোলা জায়গা কমতে থাকবে, ততই বন্য পশুদের সংখ্যাও কমতে থাকবে। সুতরাং নিয়ম কি ভাবে করা যাবে।

প্রশ্ন মা, মানুষের যত বেশী টাকা হয়, তত বেশী তার প্রয়োজনগুলো বেড়ে যায়...

শ্রীমা : বাছা, মানুষের যত টাকা বাড়ে তত তার দুর্গতির অবস্থাও বাড়ে। হ্যাঁ, ওটা একটা দুর্গতিই বটে।

টাকার মালিক হওয়াটাই একটা দুর্গতি। মানুষকে তা পশু করে তোলে, তাকে কৃপণ, দুর্বৃত্ত করে তোলে। জগতের চরম দুর্গতিগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি। টাকা এমন জিনিস যা মানুষের কাছে থাকা উচিত তখনই, যখন তার মধ্যে আর কোন বাসনা নেই, কোন আকাঙ্খা নেই, কোন আসক্তি নেই, চেতনা যখন তার দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে। পৃথিবীতে যত টাকা আছে সব তার কাছে থাকতে পারে, সকলেরই তাতে উপকার হবে। কিন্তু মানুষ যদি তা না হয়, তাহলে তার যত টাকা থাকবে তত সেটা তার পক্ষে অভিসম্পাতের মতন হয়ে দাঁড়াবে। এ কথা আমি যে কোন লোকের মুখের উপর বলব, এমন কি যে মনে করে ধনী হওয়ার যোগ্যতা তার আছে, তারও মুখের উপর বলব। ও হল একটা দুর্গতি, সম্ভবত একটা অপমান, অর্থাৎ একটা দিব্য-অসন্তোষের অভিব্যক্তি।

মানুষটা গরীব না হয়ে যদি বড়লোক হয়, তাহলে তার পক্ষে ভাল হওয়া, জ্ঞানী হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া, উদার হওয়া, চের বেশী উদার হওয়া, অনন্তগুণে কঠিন। বুঝতে পারছ কি বলছি? আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক লোককে দেখেছি। সবচেয়ে বেশী উদার প্রকৃতির যাদের দেখেছি, সর্বদা সকল দেশে, তারাই হল সবচেয়ে বেশী গরীব। আর যেই পকেট ভারী হতে আরম্ভ করে, অমনি তাদের একটা রোগে ধরে, সেটা হল অর্থের প্রতি ইতর আসক্তি। আমি তোমাদের একেবারে দিব্যি করে বলতে পারি, এটা একটা অভিশাপ।

তাই টাকা যেই পাবে অমনি প্রথম কর্তব্যই হবে, তা উৎসর্গ করা। কিন্তু একথাও আবার সত্যি যে, বাছবিচার না করে দেওয়া উচিত নয়। তাই টাকা পাওয়া মাত্রই দাতাকর্ণ হতে যেও না, যেভাবে হিতৈষী ব্যক্তিরা বদান্যতা প্রকাশ করে থাকেন, কারণ তাঁরা, তাঁরা যে অতিশয় দয়াশীল উদারচেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ধারণা তাঁদের ভরে রাখে। সাত্ত্বিক ভাবে কাজ করা চাই, তার মানে, যাতে অর্থের শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার হয়, তাই করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেককেই তার উর্ধ্বতম চেতনাতে খুঁজে বের করতে হবে, তার যে টাকা আছে সেটার শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার কি ভাবে হতে পারে। আর সত্যি বলতে, টাকার দাম তখনই যখন তা হাতে হাতে ফেরে। প্রত্যেকের বেলাতেই এবং সকলের জন্যেই টাকার দাম তখনই যখন সেটা খরচ করা হয়। যদি খরচা করা না হয়—শোন বলি, লোকেরা বুদ্ধি করে এমন সব জিনিস বেছে নেয়, যেগুলোর কোন ক্ষয় নেই, যেমন, সোনা সেটা কখন নষ্ট হয় না, পচে যায় না। কিন্তু নীতির দিক দিয়ে সেটা নষ্ট হয়ে যায়ই। আর এখন ত সোনার বদলে কাগজের নোটের চল হয়েছে, তাই যদি সুদীর্ঘকাল কাগজের পুঁজি করে রেখে দাও, আর সেগুলোকে মাঝে মাঝে দেখাশুনো না কর, তাহলে পরে যখন তোমার বাক্স খুলবে তখন দেখতে পাবে, যত রাজ্যের কাগজে-পোকা তোমার কাগজের টাকাগুলোকে ছেঁকে ধরে ভক্ষণ করছে। পরে সেই পোকায় কাটা নোট ব্যাঙ্ক নিতে আপত্তি করবে।

কোন কোন দেশে এবং কোন কোন ধর্মে চিরকাল বলে, ভগবান যাকে ভালবাসেন তাকে তিনি গরীব করেন। কথাটা সত্যি কি না জানিনা। তবে একটা জিনিস সত্যি, অবশ্যই যখন কেউ বড়লোকের ঘরে জন্মাল বা পরে খুব বড়লোক হল, অর্থাৎ ব্যবহারিক দিক থেকে প্রচুর অর্থের অধিকারী হল তখন নিশ্চয়ই সেটা একটা নির্দেশ নয় যে, ভগবান তাঁর দিব্যকরুণার প্রতীক হিসেবে তাকে নির্বাচন করেছেন। আর সে যদি সত্যিই সঠিক পথ ধরে ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকে স-সম্মানে ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

অর্থ হল একটি শক্তি, একথা আগে একবার তোমাদের বলেছি। ও হল বিশ্ব-প্রকৃতির একটি শক্তি এবং এ শক্তিকে হতে হবে প্রবহমান একটি উপায়, গতিশীল একটি শক্তি, যেমন যে জলটা বয়ে চলেছে সেটা হল প্রবহমান শক্তি। ও হল এমন কিছু যাকে উৎপাদনের কাজে সংগঠনের কাজে লাগানো যেতে পারে। খুবই সুবিধাজনক উপায়, কারণ যথার্থত ওটা হল সব কিছুকে সম্পূর্ণভাবে এবং স্বাধীনগতিতে প্রবহমান রাখার একটি উপায়।

যারা এই শক্তিকে ব্যবহার করবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি তা জানে, কেবল তাদেরই হাতে এর থাকা উচিত, অর্থাৎ যে কথা তোমাদের গোড়াতেই বললাম, যারা নিজেদের অন্তরে বাসনাকে উচ্ছেদ করেছে, অথবা যে ভাবেই হোক, যারা ব্যক্তিগত সকল কামনা এবং আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছে, তাদের হাতেই এই অর্থশক্তির থাকা উচিত। সেই সঙ্গে আবার থাকা চাই, এমন একটি অন্তর্দৃষ্টি যা পৃথিবীর প্রয়োজনগুলো কি, তা বুঝতে পারার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাপক, আর থাকা চাই এমন একটি পূর্ণপরিণত জ্ঞান, যা ওই সব প্রয়োজনকে সুব্যবস্থিত করতে পারবে এবং এই শক্তিটিকে সেই সেই ভাবে কাজে লাগাতে পারবে।

এছাড়াও যদি ওই সব লোকেদের অন্তরে একটা উর্ধ্বের আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকে, তাহলে

তারা এই শক্তিকে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে এমন কিছু গড়ে তোলবার জন্যে ব্যবহার করতে পারবে যা দিব্যশক্তি, দিব্যসামর্থ্য এবং দিব্যকরুণাকে প্রকাশ করতে পারে। আর তখন এই অর্থ শক্তি, এই সমৃদ্ধি, এই অর্থবল, যেগুলোকে এইমাত্র আমি অভিলাষের সঙ্গে তুলনা করলাম, সে সবই সর্বোত্তমের আশীর্বাদে পরিণত হবে, এবং সমগ্র জগতের কল্যাণ করবে।

অন্যরূপ আমার বিশ্বাস যেগুলো সব চেয়ে ভাল, সেই জিনিসগুলোই সব চেয়ে খারাপ হয়ে যায়। হয়ত যা যেগুলো সবচেয়ে খারাপ সেগুলোও সবচেয়ে ভাল হয়ে উঠতে পারে। অনেকে আছে যারা একথাও বলে যে, সবচেয়ে খারাপ লোকগুলোই সবচেয়ে ভাল হয়ে ওঠে। আশা করি সব চেয়ে ভাল লোকেরা সব চেয়ে খারাপ হবে না, কারণ সেটা বড়ই দুঃখের বিষয় হবে।

যাক সে কথা, অবশ্যই শ্রেষ্ঠ শক্তিকে যদি অসৎ ভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা অতি বিরাট এক বিপর্যয়ে পরিণত হতে পারে। অথচ সেই বিরাট শক্তিকেই যদি ভাল ভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে তা ভগবানের আশীর্বাদে পরিণত হতে পারে। সবই নির্ভর করে, মানুষ কি ভাবে সব কিছু ব্যবহার করে তার উপর। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি যথার্থ স্থান আছে, তাকে কাজে নিয়োগ করার একটি যথার্থ উপায় আছে এবং তার যথার্থ ব্যবহারও আছে। কিন্তু তাকে যদি অন্য কাজে লাগানো হয়, তাহলে যত গণ্ডগোল বাধে, যত বিভ্রান্তি আর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তার কারণ, জগত এখনও যে অবস্থায় রয়েছে তাতে খুব কম জিনিসই আছে, যেগুলোকে যথাযথ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে, আর খুব অল্প জিনিসই তাদের সত্যিকারের জায়গায় রয়েছে। তার কারণ, পৃথিবী এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে, তাই যত রকম দুঃখ দুর্দশা এবং কষ্টভোগই সর্বত্র চলছে। যদি প্রত্যেকটি জিনিস তার ঠিক ঠিক জায়গায় থাকত, যদি সামঞ্জস্য পূর্ণ সাম্য অবস্থা বিরাজ করত, তাহলে সমগ্র জগত উন্নতির পথে এগিয়ে যেত, এবং এখন যে দুঃখ দুর্দশা এবং কষ্ট ভোগের অবস্থায় রয়েছে, সেটার কোন দরকারই হত না। এই হল ব্যাপার।

তাই কোন কিছুই আপনা থেকে খারাপ নয়, কিন্তু অনেক কিছুই (প্রায় সমস্ত কিছুই) তাদের স্বস্থানে নেই।

হয়ত দেহের মধ্যেও ব্যাপারটা ওই রকমই। কোন কিছুই নিজে থেকে খারাপ নয়। কিন্তু অনেক কিছুই তার স্বস্থানে নেই, আর তাইতেই মানুষ অসুস্থ হয়। একটা আভ্যন্তরীন অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়, তার ফলে মানুষ অসুখে পড়ে। আর মানুষ যদি অসুখে পড়ে, তাহলে সর্বদাই তাদের বিশ্বাস, সেটা তাদের দোষ নয়। কিন্তু দোষ সর্বদাই তাদের। সে কথা বললে তারা ভীষণ চটে যায়, বলে 'মানুষের দয়ামায়া নেই।' অথচ ব্যাপারটা সত্যি। বেশ, তাহলে এই যথেষ্ট, নয় কি?

এখানেই শেষ করা যাক। আজ একেবারে মাত্রা পুরো হল, কি বল।

সাবিত্রী মহাকাব্যের ভূমিকা

অনির্বাণ

সাবিত্রী মহাকাব্যকে বলা যায় শ্রীঅরবিন্দের জীবন-বেদ। তিনি বলেছিলেন, তাঁর জীবনকাহিনী বাইরে থেকে কেউ কিছুই বুঝবে না। সেই সেবাবিষ্ট দুনিরীক্ষ্য অপরূপ জীবনকে তিনিই বিদ্যুত-উদ্ভাসে রূপ দিয়ে গেছেন এই সাবিত্রীতে। রূপ দিয়ে গেছেন এই সাবিত্রীতে। সাবিত্রী একাধারে কাব্য এবং দর্শন। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ একবার বলেছিলেন আমার মনে হয় দার্শনিকতার চেয়ে কবি স্বভাবই আমার মধ্যে প্রবল। কবি শব্দের প্রাচীন একটা সংজ্ঞা আছে। প্রাচীনরা বলতেন কবি ক্রান্তদর্শী। প্রাকৃত চেতনার ওপারেও যার দৃষ্টি যায় তিনিই ক্রান্তদর্শী এবং কবি তাঁকেই বলব। এই বিচারে কাব্য ও দর্শন বলতে গেলে সমার্থক।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ করে বেদে আমরা দেখি কবি সংজ্ঞাটি ঋষি ও জগৎস্রষ্টা উভয়ের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হয়েছে। অথর্ববেদের ঋষি একজায়গায় বলেছিলেন—"দেবস্য পশ্য কাব্যম্—ন মমার ন জীর্যতি"। এ জগৎ দেবতার কাব্য—তাঁর পরমচেতনার প্রকাশ। তেমনি শ্রীঅরবিন্দের পরম চেতনার প্রকাশ এই সাবিত্রী মহাকাব্য। সাবিত্রী তাঁর জীবন-কাব্য জীবন-দর্শন এক কথায় ওই তাঁর জীবন-বেদ।

দর্শন ও কাব্যে সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য আছে। দর্শন অর্থে দিব্যদর্শন—ঠিক philosophy বলতে যা বোঝায় তা নয়, জিজ্ঞাসা অর্থেও নয়। দর্শন হল পরম এবং চরম কোনও অনুভব। এ অনুভবে যেমন আছে ঊর্ধ্বমুখতা তেমনি রয়েছে উৎক্রান্তি—প্রাকৃত চেতনাকে ছাপিয়ে যাবার একটা প্রবণতা। একে বলতে পারি আমাদের চেতনার পৌরুষের দিক। ভাবই সেখানে মুখ্য, ব্যঞ্জনা অরূপের অভিমুখে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটা ব্যাপারও ঘটে। ওই পরম অনুভবকে বাণীরূপ দেওয়ার এক স্বাভাবিক আকূতি জাগে হৃদয়ে—যে বাণীরূপকে ঋষিরা বলতেন বাক্।

ঋগ্বেদে একটি মিথুনের কথা পাই—ব্রহ্ম এবং বাক্। "যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্" ১০।১৬৪।৮। ব্রহ্ম সেই পরমচেতনা দর্শন বা দিব্য অনুভব তাঁরই। আর বাক্ সেই পরমচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কাব্য তারই বাণীরূপ। এমনি করে দর্শন ও কাব্য মিলে যায়। সব ক্ষেত্রে না মিললেও মূল তত্ত্ব এই-ই।

কবিকৃতির উৎস সন্ধান করতে গেলে আমরা দেখব তার চেতনার উষাকাল হতেই মানুষের বিশেষ পরিচয় সে কবি। সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আদিতে পাই, ওই কবিকে। জাতকবি যিনি তিনি প্রথম হতেই সেবাবিষ্ট। যেসব কাব্য অতি প্রাচীন কিংবা আমরা এখন যার সূচনা বা অবশেষ পাই তার মধ্যে দেখি কাব্যের দুটি ধারা আছে। একটিকে বলতে পারি লৌকিক অন্যটি অলৌকিক। এই অলোকসামান্য কাব্যের পিছনে যাঁদের হাত আছে প্রাচীন অর্থে তাঁদেরই ঋষি বলতে পারি। কোনও একটি ঊর্ধ্বশক্তির বিশেষ আবেশে তাঁদের চেতনার যে উজ্জীবন ঘটেছে তাকেই তাঁরা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। সেই প্রকাশেরও দুটি ধারা।

একবারায় কাব্যের প্রকাশ ঘটেছে দেবতাকে আশ্রয় করে। যাদের আমরা বর্বর অসভ্য মনে করি এক্ষেত্রে তাদেরও গণনা করতে হবে, কারণ তাদের মধ্যেও দেখি বাণীরূপে চেতনার কে-প্রথম রূপায়ণ তা ঘটছে দেবতাকে আশ্রয় করে। দেব-প্রশস্তিই কাব্যের আদি রূপ। সেই সঙ্গে রয়েছে বীর প্রশস্তির আবৃত্তি। ঋগ্বেদের ঋষি তাকে বলতেন 'নারা-শংসী'। সমস্ত কাব্যসাধনার মূল উৎস হল দেবতা অথবা দেবমানব—এই উভয়ের প্রশস্তি। আর তারও মূলে প্রেরণা যোগাচ্ছে চেতনার উদ্দীপনা। কোনও বিশেষ আবেশে চেতনা উদ্দীপ্ত হয়েছে বৃহতের একটি মহিমা দর্শন করে বা ভূমাকে আভাসে জেনে হয়তো চেতনা তাঁর বিপুল হয়েছে। সেই বৈপুল্যের আনন্দ তাঁর বাণীতে এনেছে ছন্দ, বাণী ধরেছে কাব্যরূপ। একেও আবার আমরা বলতে পারি কাব্যের পৌরুষেয় দিক। এতে পৌরুষের চেতনারই প্রকাশ ঘটে। ঊর্ধ্বাভিসারী জীবনের একটা আভাসও এর মধ্যে ফুটে ওঠে।

এই ধারারই পাশাপাশি রয়েছে কাব্যের লৌকিক ধারা। তার মধ্যে দেখি প্রাকৃত জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনাকে রূপ দেবার প্রয়াস। এও আবহমান কাল চলে আসছে। এই দুটি মূল ধারা হতে কবিতারও দুটি ধারা দেখা দিয়েছে, কাব্যরূপ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি করছে মহাকাব্য আর খণ্ড কাব্য। Lyric শব্দটা আমরা ব্যবহার করছি না। এদেশের আলঙ্কারিকরা কাব্যের যে-দুটি বিভাগ স্থির করেছেন, আমরা সেইটিই নিচ্ছি।

মহাকাব্যে আছে জীবনের বিশালতা, উত্তুঙ্গতা—মহনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করার ফল। আর খণ্ড কাব্যে সেই মহিমাকেই ক্ষুদ্র পরিসরে হিল্লোলিত করে তোলা হয়। এক সময় মহাকাব্যের যুগ দেখা গিয়েছিল। এই মহাকাব্যেরও আবার বলতে পারি দুটি দিক আছে। কখনও তা সৃষ্টি হয় একটা জাতির সমস্ত জীবনকে মন্থন করে। এর প্রাচীন উদাহরণ—গ্রীক মহাকাব্য হোমারের ইলিয়ড। তার মধ্যে একটা বিশালতা আছে। কিন্তু লৌকিক ভাবনা-বেদনার সংবেদন যতটা প্রবল, অলৌকিকের ততটা নয়। দেবতা সেখানে রয়েছেন, কিন্তু মহিমার চাইতে তাঁর মানবীয়তাই অধিক প্রকট। তবে সমষ্টি জীবনাদর্শকে বিধৃত করে রাখা যদি মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ হয় তো গ্রীক মহাকাব্যে তা প্রস্ফুট। গ্রীক ইতিহাসে এমন একটা যুগ গেছে যখন সমস্ত জাতির চেতনাকে পুষ্ট করেছে হোমারের ঐ কাব্য। তার গভীরতর কোন একটা অর্থও সম্ভব ছিল, পরে তা হারিয়ে গেছে।

আমাদের দেশের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। কালবিচারে রামায়ণ পূর্ববর্তী, মহাভারত তার পরিণাম। এ দুটিতে মহাকাব্যের আরেক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। এরাও জাতির জীবনকে প্রদ্যোতিত করেছে এবং আজও করে চলেছে—কিন্তু তার কেন্দ্রে রয়েছেন দেবমানব নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের জীবন মহাভারতেই নিবদ্ধ থাকে নি—হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতেও উপচে পড়েছে। পুরাণ সাহিত্যের মধ্যে ভাগবতকেও আমরা মহাকাব্যের পর্যায়ে ফেলতে পারি। দেবমানবেরই চরিতাখ্যান এবং ভাগবতানুসারী আরেক মহাকাব্য চৈতন্যচরিতামৃত।

এসব কাব্যের উল্লেখ করা এইজন্য যে, কাব্যের যে অলৌকিক একটি দিক আছে এবং লোকোত্তরের প্রেষণা রয়েছে তার মধ্যে—এ-সত্য ওই সমস্ত কাব্যে যেমন ফুটেছে,

অন্যত্র তা নয়। এদের প্রত্যেকটির কেন্দ্রে রয়েছেন দেবমানব। তাঁর জীবনে কি ঘটেছিল তা হয়তো আমরা ভুলে গেছি। আমরা যেভাবে তাঁকে জেনেছি তার অনুকূলে অনেক কল্পিত কাহিনী হয়তো জুড়ে দিয়েছি তাঁর নামে, তাই দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছি তাঁকে। কিন্তু সব ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর মহিমা, তাঁর দিব্যচেতনার উত্তুঙ্গতা। আর তার ফলে, যে-জীবনকথা একসময় কাব্যে রূপ নিয়েছিল তা রূপান্তরিত হয়েছে তত্ত্বে কিংবা দর্শনে।

জীবনকে তত্ত্বে বা দর্শনে রূপান্তরিত করে কাব্য ও দর্শনকে এক করে তোলার পরিচয় আমরা এদেশে পাই বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। শ্রীকৃষ্ণের জীবন একটা **divine event**। চরিতকার শ্রীচৈতন্যের জীবনকে যেন তারই এক অনুবৃত্তি ওই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের পরিশেষ রূপে উপস্থাপিত করেছেন। সমগ্র বিশ্বের যা চরম পরিণাম শ্রীচৈতন্যকে তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত করে সেই দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেছেন।

সাবিত্রীও ঠিক এই শ্রেণীর মহাকাব্য। সাবিত্রীর বৈশিষ্ট্য হল আপাত দৃষ্টিতে তা একটি আখ্যান অবলম্বনে রচিত। শ্রীঅরবিন্দ এইজন্য সাবিত্রীকে বলেছেন এটি **legend**, আবার সেই সঙ্গে বলেছেন এটি একটি **symbol**ও বটে। ওই **symbol** বা প্রতীকের পিছনে যে-সত্য, সে-সত্য শ্রীঅরবিন্দেরই জীবন। কাজেই সাবিত্রী কাব্যের মধ্যে তাঁর আত্মচরিতের মহিমা রয়েছে। তিনি একবার বলেছিলেন যে তাঁর জীবন দুনিরীক্ষ্য।* কাব্য ঠিক এই ধারাতেই রচিত হওয়া উচিত। দর্শন যখন জীবনে রূপায়িত হয়, কাব্য হয় তারই আলেখ্য তারই প্রকাশ ; কাব্যরচনার এই মূলসূত্রটি যদি আমরা মেনে নিই তাহলে বলতে হবে, সাবিত্রী সার্থক মহাকাব্য।

এই কাব্যের স্বপ্ন শ্রীঅরবিন্দ দেখেছিলেন বহু পূর্বে। **Future Poetry** লেখার সময়ই এই কাব্যাদর্শের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইউরোপীয় কাব্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করে তিনি ভবিষ্যতের দিকে তার একটা ইসারা দেখতে পেয়েছিলেন। সেই ইসারাতে মানুষের আত্মোপলব্ধির আশ্বাস পেয়েছিলেন তিনি। আর ওই আত্মোপলব্ধিকে ভিত্তি করেই কাব্য একটা নতুন রূপ নেবে, ইন্দ্রিয়চেতনার উর্ধ্বে উঠে যাবে, এ-আশা তাঁর ছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের আঘাতে তাঁর সে-আশা আজও ফলবতী হয়নি।

যুদ্ধের পর থেকে যেন কাব্যচেতনার মোড় ফিরে গেছে। মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ যে বিশালতা, জীবনের বিপুল মহিমার উত্তুঙ্গ অনুভব—তা থেকে দূরে সরে গেছি আমরা। আমাদের চেতনায় দেখা দিয়েছে অবক্ষয়—লৌকিক কাব্যের ছোট কথাকেই আমরা বড় করে তুলছি। কবিজীবনে একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছে তখন থেকে। সেই সঙ্কটের যুগ আমরা এখনও পার হতে পারিনি। **Future Poetry**তে শ্রীঅরবিন্দ এরও একটা আভাস পেয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন একি **decadence** দেখা দিচ্ছে সাহিত্য ক্ষেত্রে? সেই **decadence** আজ সত্য হয়ে উঠেছে।

কবির কাব্যে তিনটি ভাব প্রকাশিত হতে পারে—মানবচেতনার বৈপুল্য ও মহিমা, প্রাকৃত জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা এবং জীবন মন্থন-জনিত হলাহল। আধুনিক

* তেমনি সাবিত্রীর তাৎপর্যও দুনিরীক্ষ্য।

জীবনে নানা সমস্যা প্রবলাকার ধারণ করেছে। কবি সেসব সমস্যা হতে দূরে থাকতে পারেন নি। জীবন সমস্যাসঙ্কুল, অথচ নানা দিক হতেই বৃহতের আহ্বান আসছে। কিন্তু সে-আহ্বানে ইন্দ্রিয়-চেতনাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারছি না আমরা। এই যে দোটানা—কবিচেতনা আজ এই দোটানায় বিপন্ন। এ-যুগটাই সঙ্কটের যুগ।

ভূমার মহিমা, জীবনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ আর জীবনের সঙ্কট—সাবিত্রী মহাকাব্যে শ্রীঅরবিন্দ এ তিনটির একটিকেও উপেক্ষা করেন নি। তিনটিকে স্বীকার করেও সে-কাব্য এই তিনের মন্থনে হয়ে উঠেছে অপরূপ। সাবিত্রীতে সমস্যা রয়েছে। সে সমস্যা শুধু সমাজ কিম্বা রাষ্ট্রের নয়। মর্ত্য জীবনের গোড়াতে রয়েছে যে সমস্যা বস্তুত সেই জীবন-মরণ সমস্যা সমাধানের একটা প্রয়াস ও ইসারা নিয়েই তাঁর সাবিত্রী মহাকাব্য সৃষ্ট হয়েছে। এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে তিনি যেন চেতনার কোন উত্তুঙ্গতা হতে নেমে এসেছেন অবীচির গহনে—নেমেছেন একটা বেদনা নিয়েই। সে-বেদনা যে-কোনো আধুনিক কাব্যের বেদনা হতে ন্যূন তো নয়ই, বরং বলা যেতে পারে এ সেই নতুন সৃষ্টির তপস্যার এক চিরন্তন বেদনা। আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভাবনা-বেদনার ছোট ছোট তরঙ্গগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবৃতি। কিন্তু মহনীয়তা হতে ভ্রষ্ট নয় তার একটিও। সাবিত্রীর মহাকাব্য-রূপের এই হল বুনিয়াদ।

এ কাব্য শ্রীঅরবিন্দ শেষ করে যেতে পারেননি—কোন কোন স্থানে তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এতে তিনি হাত দিয়েছিলেন সবার আগে। শোনা যায় তিনি যখন বয়োপাতে তখনই এর সূত্রপাত; আর জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এ-কাব্য রচনা করে গেছেন—রচনা করেছেন গুহাহিত হয়ে।

একজায়গায় তিনি বলছেন, একাব্য আমি অন্য কারও জন্য রচনা করিনি, করেছি আমার নিজের জন্য। এ যেন আত্মপ্রকাশেরই আকূতি—ব্রহ্মের যে বাকে স্ফূর্ত হবার প্রেষণা, তা হতেই যেন এ কাব্যের সৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দের ইচ্ছা ছিল, এর একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখে যাবেন, তা আর হয়নি। কিছুকিছু চিঠিপত্রে এই কাব্য সম্পর্কে তিনি কিছু কথা বলে গেছেন! এই কাব্যের গঠনরীতি ও এর পিছনে যে চেতনার ক্রিয়া—তার খানিকটা আভাস ওই সব চিঠিতে তিনি দিয়ে রেখেছেন। কাব্যপরিচিতির দিক থেকে তাঁর দেওয়া এই আভাসগুলি অমূল্য।

প্রথমেই তিনি একটা কথা বলছেন যে কবি বাস্তবিকই ক্রান্তদর্শী। কথাটা Future Poetryতেও তিনি বলেছিলেন। কাব্যের বিষয় তুচ্ছাতিতুচ্ছ হলেও তার 'পরে মহিমার আলো যদি না এসে পড়ে তো আর যা-ই হোক কাব্য সৃষ্টি হয় না। এই ক্রান্তদর্শিতা চেতনার উর্ধ্বায়ন ছাড়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন আলঙ্কারিকতা কাব্যকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, কি ভাবে এ-দেশে কাব্যসাধনা হয়েছিল তার একটা আভাস দিতে পারি। তাঁরা বলতেন কাব্য বৈদিকই হোক আর লৌকিকই হোক তার মূল লক্ষ্য চিদাবরণ ভেদ। মানুষের চৈতন্য আচ্ছন্ন, যদি কোনও কিছুর আবেশে বা গভীরতর কোনও বেদনায় সে-আবরণ সরে যায়, তখন চৈতন্যের যে-নতুন দীপ্তি আমরা অনুভব করি, তাই হচ্ছে কাব্যের মূল।

এই কবিচেতনাকে দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে বলতে পারি এর স্থান মানসভূমির উর্ধ্বে। এ-চেতনা বিজ্ঞান চেতনা। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য তার সামান্য প্রত্যয়—সব কিছুকে

universal-এর দৃষ্টিতে দেখা। যা একান্তভাবে আমার তাকে সবার মধ্যে ব্যাপ্ত করা অথবা যা সবার মধ্যে ছড়িয়ে আছে, তাকে আমার মধ্যে দেখাই বিজ্ঞানের লক্ষণ। চেতনার এই ব্যাপ্তি ও মুক্তি যদি কাব্যে না থাকে, তাহলে সে-কাব্য সার্থক হতে পারে না। কাব্যের একটা সাধারণ লক্ষণ এই। সাবিত্রী কাব্যে যে-চেতনা কাজ করছে, তাকে শ্রীঅরবিন্দ একটা নাম দিয়ে বলেছিলেন, এ হল overhead poetry, মূর্ধণ্য চেতনার কাব্য। মূর্ধণ্য চেতনা বলতে আমাদের হৃদয়ের সাধারণ ভাবাবেগ ও সাধারণ বুদ্ধির দীপ্তি—এই দুটিকেই ছাপিয়ে যাওয়া বোঝায়। কিন্তু প্রয়োজনমত এই হৃদয় ও বুদ্ধিকেও সে ব্যবহার করে। কোনও উত্তুঙ্গ ভাবকে বাণীরূপ দিতে গেলে আমাদের এই ভাষা এই ভূমির রূপকল্পগুলিই যখন ব্যবহার করতে হয়, তখন বিজ্ঞানভূমির নীচে যা কিছু ভাবনা তাকেও এ মহাকাব্যের অঙ্গীভূত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দও তাই করেছেন।

কিন্তু মূর্ধণ্য চেতনার কাব্যের একটা সাধারণ ভূমিকা আছে যা লোকোত্তর—মানসচেতনার উর্ধ্বে বিজ্ঞানচেতনার সামান্য দৃষ্টিই (universal vision) এই কাব্যের মূল ভিত্তি।

এই দৃষ্টি অবলম্বন করে শ্রীঅরবিন্দ কবিচেতনার কয়েকটি স্তর ভাগ করেছেন। এক জায়গায় তাঁর কাব্যকে supramental বলে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলেন, তাঁর কাব্য supramental নয় over mental। তারপর আর তিনটি স্তরের কথা তিনি বলেছেন, যার ব্যাখ্যা Life Divine-এ তিনি দিয়ে গেছেন এবং Synthesis of Yoga ও নানা স্থানে ওগুলির ক্রিয়াকারিতার আলোচনা আছে। উত্তরমানস প্রতাসনানস বোধিমানস ও অধিমানস—উপনিষদের ভাষায় বলতে পারি এগুলি বিজ্ঞানভূমিরই স্তর। একটির পর একটি সাজানো আছে আবার পরস্পর ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে স্তরগুলি। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন আমার কাব্য বা বাণী যে শুধু অধিমানস হতেই এসেছে তা নয়। কখনও উত্তর মানস কখন বা প্রতাসমানস বা বোধিমানস হতেও এসেছে। তবে অধিকাংশ বোধিমানস হতেই এসেছে তার প্রেরণা।

খুব সংক্ষেপে এই স্তরগুলি সম্পর্কে আলোচনা করলে সাবিত্রী কাব্যের আবহাওয়াটি (atmosphere) ধরা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলতেন কবির কাব্য সহৃদয় সংবেদ্য, কবি হৃদয়ের সঙ্গে যে শ্রোতার হৃদয় এক হয়ে গেছে সে-ই কবিকে ঠিক বুঝতে পারে। এই জন্য সাবিত্রী কাব্যপাঠের ভূমিকারূপে চেতনার কোন ভূমিতে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা হওয়া দরকার। কাজ পারি বা না পারি, অন্তত সেই দিকে চিত্তকে উদ্যত রাখি যেন—তার নীচে নামিয়ে না আনি, মনকে সেদিকে হঁশিয়ার হতে হবে। একথা বলবার একটা কারণ আছে। এদেশের এবং ওদেশের কোন কোন সমালোচক বলেছেন, সমগ্র সাবিত্রী কাব্য যেন একটা বুদ্ধির কসরৎ। সাবিত্রী পাঠকালে আপাত দৃষ্টিতে সেই রকম মনে হবে। এর কাব্যমূল্য একটা আছে নিশ্চয়ই। কারণ বুদ্ধির দীপ্তি এমন ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে এই কাব্যে, তাঁর বাঁধুনি এমন আঁটসাট যে সহজেই তা চিত্তে বিস্ময়োদ্রেক করে। কিন্তু কাব্যের প্রাণ যে-হিল্লোল যে-রস তা যেন এতে

খানিকটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। একজন নয়, অনেকেই এমন মন্তব্য করেছেন। আমরা কবির কাব্য আস্বাদনে আমাদের সহৃদয়তার যে অভাব আছে—এইখানেই তার পরিচয় পাই। যথোপযুক্ত আবহ সৃষ্টি না করলে কাব্য আস্বাদন করা যায় না। এই কাব্যে অনেক কিছুই অত্যন্ত তুচ্ছ বা আমাদের অতি পরিচিত বলে অনায়াসে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায় হয়তো। কিন্তু এই সব অতি পরিচিত ভাব ও ভাবনার ভিতর দিয়ে যে-মহিমা এবং যে-সব নিগূঢ় ইঙ্গিত এবং ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্য যদি আমরা প্রস্তুত না থাকি, তাহলে তার প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করা আমাদের অসাধ্য হবে। এজন্য সাবিত্রী কাব্য আলোচনার পূর্বে এটি চেতনার কোন ভূমির কবিতা, সে সম্পর্কে আমাদের খানিকটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আগে যে চারটি ভূমির নাম করা হল, তার প্রত্যেকটিরই মূল ভিত্তি অদ্বৈত চেতনা। কথাটা শুনতে খুব বড়। কারণ আমাদের ধারণা অদ্বৈতবোধ চেতনার উত্তুঙ্গতম ভূমি। তা সত্য। কিন্তু অদ্বৈতচেতনা কেবল একরস তো নয়, তার মধ্যে রয়েছে চিদ্‌বিলাস। সে-বিলাসের পরিচিতি শ্রীঅরবিন্দের ওই চারিটি ভূমির বিবৃতিতে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে উত্তরমানস আমাদের চেতনার এমন একটা গড়ন, যাতে সর্বত্র সেই একত্বে দর্শন হয়। কাজেই তার মধ্যে আছে একটা সমরসতা। সমরসতা কি বোঝাতে হলে সাধারণ একটা উপমা দেওয়া যায়। ধরা যাক কারও জ্বর হয়েছে। তার মনটা আগের মতই কাজ করে চলবে। কিন্তু তখন জ্বরের অনুভূতিটিও সবসময় তার সাধারণ চেতনার পিছনে রয়ে যাবে। ফলে সমগ্র চেতনায় আসবে একটা রূপান্তর। উপমাটি অত্যন্ত লৌকিক এবং তুচ্ছ হলেও আমরা বুঝতে পারি, সমরস চেতনার স্বরূপ কেমন। এই ভাবটি চিত্তে সর্বদা জাগ্রত থাকাকে, যোগের ভাষায় বলতে পারি ভাবনাকে মূর্ধায় বহন করা। প্রাচীন সাধনশাস্ত্রে একে বলা হত বায়ুর ঊর্ধগামীতা। বায়ু বা প্রাণস্রোত ঊর্ধগামী হলে জগতে খণ্ডদৃষ্টিতে যা দেখছি, তার পিছনে অখণ্ডভাব আবিষ্কৃত হয়। সকলতা এবং অখণ্ড দৃষ্টিই তাহলে উত্তরমানসের দুটি প্রধান লক্ষণ। তার আরেক বৈশিষ্ট্য, চেতনা তখন বস্তুর পিছনে ভাবকে দেখে। শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনা মাতৃভাবে তন্ময়—সর্বত্র তিনি মাকেই দেখতেন। "যত্র নারী তত্র গৌরী"। এক্ষেত্রে প্রত্যেক নারীর যা বৈশিষ্ট্য, তা হারিয়ে যাচ্ছে না তাঁর দৃষ্টিতে, অথচ চেতনা সে বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তার পিছনে যে অখণ্ড মহাভাব ও তার উল্লাসবৈচিত্র্য সেইগুলি দেখছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, কখনও কখনও কবিতার কয়েক ছত্র হয়তো ওই উত্তরমানস হতেই আসছে। তখন রূপায়ণের দুটি বিভাব যেন খুলে যায়। একদিকে অন্তরে রূপোল্লাস, যেন জ্যোৎস্নায় সমুদ্রে ঢেউ উঠছে—সে ঢেউয়ের বিবিক্ততা থাকবে, একটি হতে অন্যটিকে পৃথক করা যাবে কিন্তু সেই ঢেউয়ের গোলা বাইরের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সব কিছুর মধ্যে নিবিড় একটা রসের যোগ ঘটিয়ে দেবে। বাণীতে এ-ভাব অভিব্যক্ত হলেই বলব, এটি এসেছে উত্তরমানস হতে।

কবিকৃতির অনেকটাই হয়তো উত্তরমানস হতে আসে। কেননা আমাদের ভাষা বর্তমানে যে আকার পেয়েছে, তাতে ওই চেতনাকে অনেকটা প্রকাশ করা যায়। অবশ্য কাজটা খুব সহজ নয়। কারণ ভাষার মূলেও রয়েছে ইন্দ্রিয়নির্ভরতা—বস্তু হতে ভাবের

দিকে যেতে গিয়েই ভাষার সৃষ্টি করেছি আমরা। তাতে ভাষার মাঝে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে অবলম্বন করে সীমার মাঝে অসীমের ইশারা ফোটানো চলে। তার ফলে সীমার খণ্ডতা ও পরিকীর্ণতা বজায় থাকলেও উত্তরমানসের প্রভাবে একরসতার একটি প্রবাহ তার অন্তরে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। এইজন্য সাবিত্রীর মত মিষ্টিক কবিতা যেসব জায়গায় বর্ণনা-প্রধান (Descriptive) হয়ে ওঠে, সেগুলিকে উত্তরমানস হতে উদ্ভূত বলা চলে।

শ্রীঅরবিন্দ প্রভাসমানসের কথা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, চেতনা বা প্রজ্ঞার সহজ প্রভাস্বরতা যদি সৌরদীপ্তির মত জ্বলে ওঠে এবং তাই যখন চেতনার সহজ ধর্ম হয়ে যায় তখনই তাকে বলি Illumined mind। এই প্রভাস্বরতাকে উপমা দিয়ে বোঝানো কঠিন। উপনিষদের ঋষি যাকে বলেছেন ব্রহ্মকোষ—সৌরবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকলে ওর মধ্যে তরল পারার মত যে টলটলানি দেখা যায়, প্রভাস-মানসের লক্ষণ ওই প্রভা-তরল জ্যোতির্ময়তার মত বলা যায়। প্রভাসমানস উত্তরমানসের প্রসূতি। বিবিক্ততা এখানেও আছে কিন্তু সে বিবিক্ততা যেন সংহত। একের মধ্যে অপরের অনুপ্রবেশ সেখানে স্বাভাবিক। চেতনার এই অবস্থাতে কোনও লোকোত্তর সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা যায় যাতে, একই কালে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ে বিষয়ের ধর্মও প্রকাশিত হয়। তবে কিনা আগেই বলেছি সহৃদয়তা না থাকলে এই প্রকাশ পাঠক ও শ্রোতার কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এই পর্যন্ত গেল যেন রূপের ব্যাপার। একটিতে রয়েছে রূপের খণ্ডতা কিন্তু অখণ্ড ভাবনায় তা অনুবিদ্ধ। অন্যটিতে খণ্ড ও অখণ্ড যেন একাকার। এর পরই বোধিমানসের এলাকা। এ ভূমিতে জাগে এক সাজুয্যভাবনা বা সাজাত্য বোধ। যিনি বোধ করছেন আর যা বোধ করছেন—দুয়ে যেন একাকার। অতএব সেখানে প্রজ্ঞার স্ব-ভাব, অনুপ্রবেশ —বাহির হতে কিছু ভিতরে আহরিত হচ্ছে তা নয়; এখানে সহজ ধর্ম উৎসারণ। ক্ষিপ্র-গতিতে এই উৎসারণ আলোর কতগুলি আড়াল ভেঙে দেয়। তখন প্রভাস-মানসেরও অপ্রত্যক্ষ মহাভাস্বর সত্যকে প্রত্যক্ষগোচর শুধু নয়, স্পর্শগোচর করে তোলে। বোধি-মানসের এই হল মুখ্য লক্ষণ। কবি-চেতনা বোধির আবেশে কাব্য সৃষ্টি করলে তা হয়ে ওঠে মন্ত্রমালা—তার মধ্যে দেখা দেয় বোধিশক্তি। কাব্য তখন যথার্থই তেজস্ক্রিয় (dynamic), এবং তার এই স্ফুরত্তা যে কত উঁচুদরের, তা ভাষায় ঠিক ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

বোধিমানসেরও উর্ধ্বে রয়েছে অধিমানস। দুটির মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য, তা হল ব্যক্তি-চেতনা ও বিশ্ব-চেতনার প্রভেদ। ব্যক্তি-চেতনা গাঢ় থেকে গাঢ়তর গাঢ়তম হলে তার মাঝে বোধিমানসের আবির্ভাব সম্ভব হয়। কিন্তু সেই চেতনা যদি বিস্ফারিত হয়ে জগতের মূল কারণের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, তাহলে যে দীপ্তি যে উল্লাস ও বৈচিত্র্য অথচ যে অদ্বৈত চেতনা ফোটে, তাই হল অধিমানস চেতনা। শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীর প্রথমাং-শের কিছুটাকে বলেছেন, অধিমানস চেতনার উৎস হতে উৎসারিত। এমন কোনও কবিতা যদি থাকে, যার মধ্যে ফুটেছে বিশ্বতশ্চক্ষুর দর্শন, সমষ্টি জীবন বা মহাজীবনের মর্ম সত্য আভাসে ছাড়া যা ব্যক্ত করা যায় না, তবুও যে কবিতা এমন ভাবে তা ব্যঞ্জিত করছে যা বিদ্যুচ্চমকে শ্রোতার চেতনায় অসীমের ইশারা এনে দেয় অথচ, সমস্ত বর্ণনাটুকু এক

অথও সৌষম্যের বৃত্তে ধরা থাকে তবে তাকেই বলব অধিচেতনার কাব্য। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন, কোনও কবিতা বেশিক্ষণ এই মনে ধরে রাখা যায় না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মনের এই চারটি ভূমির যে-কোন ভূমি হতেই কাব্যসৃষ্টির সূচনা হতে পারে। তবে উৎস যে-ভূমিই হক না কেন, অধিষ্ঠান রূপে এদের সবার পিছনেই থাকবে অতিমানস চেতনা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ Supramental expression কথাটা ব্যবহার করতে চাননি। তিনি বলছেন, কোথাও কোথাও সাবিত্রী অধিমানস চেতনার অভিব্যক্তি—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোধিমানস ওর উৎস, আর উচ্চ-মানসের অভিব্যক্তি তো আছেই, প্রভাসমানসের দানও খানিকটা বটে। সাবিত্রীতে যে কবি-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, এই তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এ-পরিচয় আমাদের কাছে দুরধিগম্য। সাবিত্রী কাব্য পাঠকে বেদপাঠের মত শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করাই এজন্য সুবুদ্ধির কাজ।

এতক্ষণ যে-কথাটা আলোচনা করা হয়নি, এবার তাতে আসা যাক। মহাকাব্যের একটা লক্ষণ বিশালতা—এটি ব্যাপ্তির দিক। তাছাড়াও উত্তুঙ্গতা ও গভীরতার দিক আছে। ব্যাপ্তির দিক থেকে এবং জীবনের সবখানি দিয়ে যখন তার প্রকাশ ঘটে তখন মহাকাব্যের আকার হয় বৃহৎ। সাবিত্রীর আকারও বৃহৎ। কিন্তু আরেক ধরণের কাব্যকেও মহাকাব্য বলা যায়—যেমন বেদ বা উপনিষদ। এর মধ্যে যে বিশালতা, তা ব্যাপ্তির দিক থেকে নয়—এর মধ্যে ব্যাপ্তির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে উত্তুঙ্গতায় ও গভীরতায়। এই দৃষ্টিতে কবিকৃতির একটা ধারা পাই এবং শ্রীঅরবিন্দ সেটিও সাবিত্রীতে ব্যবহার করেছেন। ব্যাপ্তির ব্যঞ্জনা বজায় রেখেও উত্তুঙ্গ ও গভীর একটি বিরাট ভাবকে স্বল্প পরিসরে প্রকাশ করেছেন তিনি যেন শ্লোকে নিবদ্ধ করেছেন, বলা যায়। কাব্য-পরিচিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ এই দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলছেন, সমগ্র কাব্যটি আমি লিখেছি অমিত্রাক্ষর ছন্দে। কিন্তু ইংরেজির blank verseএ যে প্রবহমানতা, গড়িয়ে চলার ভাব—সেটি তিনি নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, একেকটি ভাবকে আমি কয়েকটি ছত্রে আবদ্ধ করেছি। একটি দুটি তিন কি চারটি—বড় জোর সাতটি লাইনে একটি সম্পূর্ণ ছবি ফুটে উঠেছে। তারপর এসেছে একটা পূর্ণচ্ছেদ। আবার এমনি একটি ভাবকে তিনি পূর্ববর্তী ছবিটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। এই শৈলীর পরিচয় আছে উপনিষদে ঋগ্বেদের সূক্তে। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন ভাষাকে যেন সেখানে হাতুড়ি পিটিয়ে ঘন নিবদ্ধ করা হয়েছে। সাবিত্রীতে তিনিও ভাষাকে অমন করেই পিটিয়ে ঘনবদ্ধ করে তুলেছেন—কোথাও একটু ফাঁক নাই।

এর একটা উদ্দেশ্য আছে। একটি ছত্রের মধ্যে একটা ভাবকে যদি এমনি করে বেঁধে দেওয়া যায়, তবে তার মাঝে বিকীরণ শক্তির আবির্ভাব ঘটে। মন্ত্রশক্তির মূল রহস্য তাই। পরিকীর্ণ যে ভাবটি বর্ণনার মাধ্যমে তরঙ্গায়িত করা যেত, তাকেই যদি ঘনীভূত করি, অথচ শব্দবিন্যাস এমন ভাবে হবে যে, তার মধ্য হতে বিদ্যুতের মতই বিদ্যোতিত হবে অসীমের ব্যঞ্জনা—আর তার মূলে থাকে যদি উচ্চ বা প্রভাস মানসের প্রেরণা, তবে সেই কবিতা বা কাব্যের ছত্রগুলি হয়ে ওঠে মন্ত্র। সাবিত্রীতে যে-সব তত্ত্ব আছে, তা আমরা দিব্য-জীবন যোগ-সমন্বয় প্রসঙ্গ এবং শ্রীঅরবিন্দের অন্য অনেক লেখাতেই পাব। সেসব

জায়গায় তত্ত্বগুলি প্রাকৃত চেতনার যোগ্য করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বুদ্ধিগ্রাহ্য। কিন্তু সাবিত্রীতে সেই সব তত্ত্বই এমন ভাবে পরিবেশিত হয়েছে যে তা বুদ্ধিগ্রাহ্য না হয়ে হয়েছে বোধিগ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয়। তার ফলে সাবিত্রী কাব্য চেতনাকে আবিষ্ট করে—মন্ত্রের মত তার মনন সম্ভব। সেই সঙ্গে একথাও বলা ভাল যে সাবিত্রী কাব্য দ্রুত পাঠের উপযোগী নয়। একে গ্রহণ করার ক্ষমতা স্বভাবতই আমাদের সীমাবদ্ধ। সাবিত্রী বহু-দিনের মনন ও নিদিধ্যাসনে ধারণার যোগ্য হলে তবেই, তার তত্ত্বোপলব্ধি সম্ভব। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য—উপনিষদের এ আদেশ সাবিত্রী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মননের সুবিধার জন্যই শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র কাব্যটিতে ওরকম gap রেখে রেখে লিখেছেন; পর্বে পর্বে ভাগ করে দিয়ে গেছেন। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দিয়ে আমরা যেমন চাতাল পাই, এবং সেখানে একটু বিশ্রাম করে আবার সিঁড়ি ভাঙি—এ কাব্য পাঠের রীতিও তেমনি হবে। একবার পড়েই বুঝে ফেলব, সাবিত্রী মহাকাব্য সম্পর্কে এ আশা পোষণ করা দুরাশা মাত্র।

সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে গীতার বিশ্বরূপ দর্শন যোগাধ্যায়ের। ছোট হলেও এটি মহাকাব্যের মর্যাদা পেয়েছে। বিশ্বরূপদর্শনে যে ছবি ফুটেছে সেই ছবির সামনে অর্জুনের চেতনায় যে-রূপান্তর যে উন্মেলন ঘটেছে বলে বোধহয় তা অতুলন। শ্লোক কয়টি বাহিরের বিচারে ব্যাপ্তির বিশালতা না পেলেও অন্তরের দিক থেকে ও ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে মহাকাব্যের সমতুল্য। গীতা মন্ত্রমালা যেমন মননযোগ্য সাবিত্রীও তেমনি মন্ত্রমালা। শ্রীঅরবিন্দ যদি ইংরেজীতে না লিখে সংস্কৃতে লিখতেন, আমাদের মনে হয় সাবিত্রী কাব্য তিনি বেদমন্ত্রের মত করেই লিখতেন। তিনি যেমন সাবিত্রী কাব্যে একটি বা দুটি ছত্রে ভাবকে রূপ দিয়েছেন, বেদমন্ত্রেও প্রতিটি ভাব এই রীতিতে গ্রথিত। এই তথ্যটি বেদ-মন্ত্রেও প্রতিটির মর্মার্থ আবিষ্কারে একটি সহায়। পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে দুরান্বয় বলে একটা জিনিষ দেখা দিয়েছে যাতে কোন একটি ছত্রের অন্বয় খুঁজতে গিয়ে আমাদের দুতিনটি ছত্র ডিঙিয়ে যেতে হয়। বেদে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত বিরল। যদি কোথাও তা করতে হয় তো বুঝতে হবে, আমরা সেখানে আমাদের কল্পিত কোন অর্থ আরোপ করছি। দুরান্বয় না থাকায় প্রত্যেকটি মন্ত্রে আমরা ছন্দের নির্দিষ্ট পাদব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারি। সাবিত্রী কাব্য এই রীতিতে গাঁথা—আদ্যন্ত এটি বেদমন্ত্রমালা স্বরূপ।*

---

* শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে প্রদত্ত শ্রীঅনির্বাণের ভাষণ টেপ রেকর্ডার থেকে তোলা হয়েছিল; তা নিয়ে সম্পাদনার কাজটুকু করেছেন শ্রীমতী নারায়ণী দেবী। মূল বক্তব্য প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে। প্রথম দিনের ভাষণ এই পর্যন্তই। "সাবিত্রী" মহাকাব্যের এই হল ভূমিকা।

বেদ ও আমাদের সংস্কৃতি

গৌরী ধর্মপাল

লোকসংস্কৃতির একটি মূল্যবান দলিল হল প্রবাদ। সূত্রের মতো সংক্ষিপ্ত অথচ অলঙ্কারে ঝোরালো তীক্ষ্ণ এইসব প্রবাদের মূল্য আমাদের অভিজাত বিদগ্ধ সূত্রসাহিত্যের চেয়ে একবিন্দুও কম নয়। এক একটি প্রবাদের মধ্যে অনেক সময় একটি সমগ্র জাতির বা দেশের বা যুগের ইতিহাস কথা কয়ে ওঠে। কাজেই প্রবাদের সাক্ষ্য অবহেলা করার জিনিষ নয়।

আমাদের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যের মধ্য থেকে বেছে বেছে দুটি গ্রন্থকে অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে এই প্রবাদ। গ্রন্থ দুটি হল—বেদ এবং মহাভারত। প্রবাদ বলছে 'সব বেদে আছে" এবং "যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে।" মহাভারতের জনপ্রিয়তার কারণ বুঝতে পারি। কথকঠাকুরদের কল্যাণে মহাভারতের গল্প-কাহিনী-শিক্ষা-অনুশাসন গঙ্গা-যমুনাগোদাবরীনর্মদাকৃষ্ণাকাবেরীর মতোই সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের মনের মাটিতে রস এবং পলি জুগিয়ে চলেছে। ভাস কালিদাস ভারবি মাঘের মতো কবিরা সংস্কৃত ভাষায় এবং কাশীরামদাস এঝুত্তচ্ছন (মালয়ালী কবি) প্রমুখ কবিরা দেশীয় ভাষায় এই মহাভারতের কাহিনীকে নবনব রূপ দিয়ে প্রচার করেছেন, এ ছাড়াও আরো যে কত শত কবি মনীষী—এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দও আছেন —এই রত্নাকর থেকে রত্ন আহরণ করেছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। ফলে মহাভারত হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের অতি আপন অতি-চেনা অতি ঘনিষ্ঠ। কৃষ্ণ অর্জুন যুধিষ্ঠির দুর্যোধন দুঃশাসন ধৃতরাষ্ট্র শকুনি দ্রৌপদী কুন্তী গান্ধারী সত্যবতীকে আমরা ছোটবেলা থেকেই চিনি-জানি। আর মহাভারতের নির্যাস গীতার তো কথাই নেই। ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বইয়ে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ভারতীয় বই বোধহয় এইটিই। খুব কম করে ধরলেও অন্তত কুড়িটি শতাব্দী এবং আশি পুরুষ ধরে তন্ন তন্ন অনুশীলন এবং অনুষ্ঠান করার পর মহাভারত সম্বন্ধে আমাদের লোকদর্শন যদি ঘোষণা করে থাকে, যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে, তবে সে ঘোষণার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু বেদ? বেদকে আমরা কতটুকু চিনি—জানি? মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র, পরুচ্ছেপ দৈবোদাসি, শিশু আঙ্গিরস, দীর্ঘতমা ঔশিজ, বামদেব গৌতম—বেদের এইসব প্রথম সারির ঋষিকবিদের নামের সঙ্গে আমাদের স্বীণতম পরিচয়ও নেই। পুরাণের ইন্দ্রকে আমরা চিনি। কিন্তু বেদের ইন্দ্রের স্বরূপ আমাদের একেবারেই অজানা। বেদের যে অংশ নিয়ে তবু কিছুটা নাড়াচাড়া হয়েছে, সেই উপনিষদেরই বা কতটুকু আমরা সাধারণ মানুষেরা জানি? অপরিচয়ের অথৈ সমুদ্র থেকে কয়েকটামাত্র নাম কোনরকমে কিছু গল্পের ভেলায় ভর দিয়ে মাথা জাগিয়ে আছে—যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী মৈত্রেয়ী জনক নচিকেতা সত্যকাম শ্বেতকেতু—ব্যস। আর জেগে আছে কিছু মন্ত্র এবং মন্ত্রের ভগ্নাংশ প্রধানত রবীন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং সংহিতা এসব তো সুদূরতম সুদূর। অথচ বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করে বসলাম, 'সব বেদে আছে'। এ কি পাগলের প্রলাপ, বা শাস্ত্রাজ্ঞের উপহাস্য

দেবাক,..না অঙ্কের বড়াই, না কি আত্মবিস্মৃতির রসাতলে ডুব দিতে দিতে অতীত স্মৃতির সোনার তরী থেকে ভেসে-আসা একটুকরো খড় ধরে ভেসে থাকার চেষ্টা ?

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই শেষেরটাই সত্যি। 'সব বেদে আছে' এই তুচ্ছ সামান্য প্রবাদটিই হল আমাদের ইতিহাসের সব চাইতে মূল্যবান অসামান্য সূত্র। একটি ছোট্ট কথার মধ্যে ভারত ইতিহাসের বিশ্বরূপ ফুটে উঠেছে।

In the fixed tradition of thousands of years they have been revered as the origin and standard of all that can be held as authoritative and true in Brahmana and Upanishad, in Tantra and Purana, in the doctrines of great philosophical school and in the teachings of famous saints and sages. The name borne by them was Veda, the Knowledge,—the received name for the highest spiritual truth of which the human mind is capable. (On the Veda, P. 3)

"ব্রাহ্মণে উপনিষদে, তন্ত্রে পুরাণে, বহুমান দর্শন সম্প্রদায়গুলির সিদ্ধান্তে এবং প্রসিদ্ধ সাধুসন্তদের বাণীতে যা কিছু প্রামাণিক, যা কিছু সত্য—তার উৎস এবং মানদণ্ড বলে মান্য হয়ে আসছে বেদ, হাজার হাজার বছরের অক্ষুণ্ণ ঐতিহ্যে। বেদ কেন ? বেদ মানে জ্ঞান। মানুষের মন যে চরম আধ্যাত্মিক সত্যে পৌঁছুতে সমর্থ, তারই স্বীকৃত নাম হল বেদ।"

বেদ হল ভারত-ঠাকুমার সেই অক্ষয় ঝুলি যার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে এই ভারত-ভূমির যত মত, যতপথ, যত ধর্ম, যত দর্শন, যত বিদ্যা, রূপকথা, পুরাণকথা, দ্বৈত অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, সৎ, অসৎ, শূন্য, পূর্ণ, না, হ্যাঁ, নিঃশ্রেয়স, অভ্যুদয়। বেদ হল সেই অরণ্যানী যে বৃষের গম্ভীর ধ্বনি থেকে শুরু করে ছোট্ট পোকার চিকচিক শব্দ পর্যন্ত সব কটি সুর তার বীণার ঘাটে ঘাটে বাজিয়ে চলেছে (ঋ, ঋ, ১০।১৪।৬।২)। বেদ হল সেই রাত্রি যে তার বিপুল অন্ধকার দিয়ে সযত্নে ঢেকে রেখেছে সেই কুলায়টিকে 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্—যেখানে বাসা বেঁধেছে বিশ্বের ব্যঞ্জনা, যেখানে পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে এই সৃষ্টির জাগ্রৎ স্বপ্ন আর সুষুপ্তি আর এই তিনকে মিলিয়ে এবং পেরিয়ে যা সেই তুরীয় চতুর্থ বিশ্বত্তর সত্য। এই বেদের উর্বর ভূমিতে নিত্য নতুন সৃষ্টির বীজ বুনে চলেছে অদিতির সৃষ্টিধর সাত আদিত্য-পুত্র—সাত ভাই চম্পা। তারই পাশাপাশি পড়ে আছে দিক্‌চিহ্নহীন তেপান্তরের মাঠ অসদ্ভূতির ধু ধু প্রান্তর, যেখানে একটি বন্ধ্যা কামধেনুর সঙ্গে একা একা বসে খেলা করে অদিতিজায়ের দুয়ো ছেলে মার্তাণ্ড—মরা-ডিম। সে কিছু হয় না, শুধু হতে চায়। সে সৃষ্টি নয়, সৃষ্টির কামনা। সে হচ্ছে না, সে শুধু ইচ্ছে। যা হয়েছে, যতদূর হয়েছে, তার মনোমত হয়নি, পছন্দ হয়নি, তাই সে আর তার ঐ কামধেনু দুজনে মিলে ইচ্ছে করেই চলেছে, করেই চলেছে, তাদের ইচ্ছের খর খর ঝাঁপনে শিউরে শিউরে উঠছে অসদ্ভূতির তেপান্তরের মাঠ, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় কণায় কণায় কানাকানি চলেছে...

এই বেদকে আমরা ভুললাম কেন ? কী করে ভুললাম ? যদি বা ভুললাম, ঐ বড়াইটুকু ভুলনামনা কেন, যে সব বেদে আছে ?

এর উত্তর হল—

ভুলে থাকা নয় সে তো তোলা
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে ঘোর দিয়েছে দোলা।

আমরা শুধু বেদের মূল ভাষাটিকেই ভুলেছি, অর্থকে ভুলিনি, ভাবকে ভুলিনি, পরমার্থকে ভুলিনি। সে ভাব সে অর্থ সে পরমার্থ হাওয়ার মতো রোদের মতো ধুলোর মতো বাঁশির সুরের মতো ছড়িয়ে গেছে জড়িয়ে আছে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গে অঙ্গে। আমাদের সমস্ত সাধনার তলে তলে সেই অজস্র জলের আহ্বান।

বেদের অর্থ উর্বশীর মতো পলাতক হবার আগেই তাকে বেঁধে ফেলা হয়েছিল ইতিহাস অর্থাৎ মহাভারত আর পুরাণে হাজার পাকে। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থং উপবৃংহয়েৎ'—বেদের অর্থ ফলাও করবে ইতিহাস আর পুরাণের দ্বারা—এই ছিল অনুশাসন। উদ্দেশ্যহীন বাজে গল্প ফেঁদো না, বেদের মধ্যে যা বীজ হয়ে ইসারা হয়ে ইঙ্গিত হয়ে লুকিয়ে আছে, তাকে আবিষ্কার কর পল্লবিত কর, সূক্ষ্মদৃষ্টির অণুবীক্ষণের তলায় ধরে ধরে দেখ তার বৃহৎ রূপ, রচনা কর বৃহৎ কথা। তাই করেছেন ইতিহাসকার, তাই করেছেন পুরাণকার। বেদের ভাবভূমির উপরে তাঁরা রচনা করেছেন জননমনোরঞ্জন বিপুল সাহিত্য, এক দু'কূল-প্লাবিনী রসের জাহ্নবী যা ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে বয়ে নিয়ে গেছে বেদের পলিমাটি, যার উপরে ভারতবর্ষের মানুষ ফলিয়েছে সোনার ফসল—একদিকে ধর্ম অর্থ কাম, মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ধারক এই ত্রিবর্গ, আর একদিকে মোক্ষ—বাঁধভাঙা বাঁধহারা আনন্দচেতনা যার থেকে জন্ম নেয় নতুন সৃষ্টি।

তন্ত্রের একটি মূলতত্ত্ব হল 'অগ্নীষোমাত্মকং জগৎ—এই জগৎ অগ্নি-সোমসবল। এটিই বেদের এবং বৈদিকযজ্ঞবাদের একটি মূলতত্ত্ব।

নাই রস নাই দারুণ দহনবেলা, দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তুষায় হানে রে—এই হল অগ্নি পুরুকাব, পুরুকাব বহকান মর্ত্য মানুষের অনন্ত কামনা। সেই কামনা বলে এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে, ইহার মাধুরী বাড়াও হে। মাধুরী বাড়াও, মধু দাও, সৌম্য মধু, আনন্দ মধু, প্রিয়ংমধু, প্রেমের মধু। মধুসং পার্থিবং রজঃ—মধু দ্যৌঃ অস্তু নঃ পিতা। মধুময়ী এই পৃথিবী, মধুময় হোক দ্যুলোক, আমাদের পিতা। মিলে যাক সব দিবা আর পার্থিব বসু, পৃথিবীর ধন আর স্বর্গের ধন।

ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের দুটি বাদে আর সব কটিতেই অগ্নি-সূক্তের স্থান মণ্ডলের গোড়াতেই। অর্থাৎ অগ্নি দিয়ে সাধনার শুরু। বৈদিক যজ্ঞের গোড়াতেও এই অগ্নি-সমিন্ধন অর্থাৎ আগুন জ্বালানো। যজমানের ভিতরে যে আগুন জ্বলছে—অগ্নিসব দেবতার দান, উর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ—তারই একটি বাহ্য প্রতিরূপ হল এই যজ্ঞাগ্নি। এই আগুনেই সব দিতে হবে, আমার যত বিত্ত, আমার যত বাণক্ত, আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা, আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা কেনা, আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে, জোমার করে দেব, তখন তারা আমার হবে সব দিতে হবে।

তাই যজমান এই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেন ঘৃত, তাঁর তপস্যার জ্যোতিবিন্দু; দেন ব্রীহি বা তৈত্রী পুরোডাশ যা তাঁর মাটি-ফুঁড়ে ওঠা ঊর্ধ্বমুখী উদ্ভিদ চেতনার প্রতীক, দেন পশু, তাঁর অশুদ্ধ প্রাণকে শুদ্ধ প্রাণে রূপান্তরিত করে দেবতার বাহন করার জন্যে, আর

দেন সোম—তাঁর এই পার্থিব জীবনের যত কিছু আনন্দ, তাকে দিব্য আনন্দে ভরে তোলার জন্যে, অল্পসুখকে মহাসুখ করার জন্যে, আমার আনন্দকে সবার আনন্দ করার জন্যে। এই আনন্দই অমৃত, এই সোম। এঁরই উদ্দেশ্যে যজমান বলেন,

হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহপ্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?

যা ঘটছে ব্যক্তিতে, তাই আবার ঘটছে বিশ্বে। পঞ্চতপা পৃথিবীর হোমকুণ্ড থেকে আগুন উঠছে ঊর্ধ্বমুখী বাষ্প হয়ে। দেবতার প্রসাদে তাই আবার ঝরে পড়ছে বর্ষা হয়ে।

যজ্ঞের শুরু অগ্নিতে, সারা সোমে। সব যাগের সেরা হল সোমযোগ। এই সোমের বৈশিষ্ট্য এবং মহিমা বোঝাতে ঋক্‌সংহিতাকার নবমমণ্ডলটিকে সংকলন করেছেন শুধু সোমসূক্ত দিয়ে। এই সোমকে পাওয়াই হল সিদ্ধির চরম—সোম্য আনন্দের অক্ষীরমান উৎসর বুড়ি ছুঁয়ে অমৃতকুম্ভ মাথায় নিয়ে নেমে আসা এই ধুলার পৃথিবীতে, জগতের আনন্দ যজ্ঞের নিমন্ত্রণে সবাইকে ডাক দেওয়া।

এই তো গেল মহাভারত পুরাণ তন্ত্রের কথা। দর্শন কী বলে? প্রসিদ্ধ ষড়দর্শনের সব কটিই বলছে, আমরা শ্রুতিতেই বদ্ধমূল, বেদ থেকে এসেছি আমরা। পদে পদে বেদকে সাক্ষী মেনে এগোচ্ছে এই সব দর্শনের সূত্রগুলি।

বিশ্বমূল তত্ত্ব সম্পর্কে বেদ বলছে—

সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা (ঋ ১০।১২৯।৪)

মনীষা দিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে খুঁজতে মরমী কবিরা শেষ পর্যন্ত পেলেন তাকে হৃদয়ে, জানলেন অসতের বুকে ফুটে আছে সৎ। একক প্রকাণ্ড না-এর আকাশে ফুটে আছে সৃষ্টির কুসুম।

যে আকাশকুসুমকে ধরতে চাইছে পৃথিবীর যত দর্শন, তাকে কেমন সহজে ফুটিয়ে তুললেন কবি প্রজাপতি পরমেষ্ঠী, আবার ফুটিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলেন, হাতে ধরে রাখলেন না, চটকালেন না, ঘেঁটে ঘেঁটে মধুগন্ধ বার করে সিন্থেটিনে পরিণত করলেন না, সেই অসীম রহস্যের সামনে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—

ইয়ং বিসৃষ্টির্ যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ত্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ (ঋ ১০।১২৯।৭)
এই বিচিত্র সৃষ্টি কোথা থেকে হল?
কেউ কি করেছে একে, না কেউ করে নি?
পরম ব্যোম যে এর রাজরাজেশ্বর
সেই বুঝি জানে শুধু
অথবা কি জানি, সে-ও হয়ত জানে না।

সদ্‌বাদ, অসদ্, কৃতবাদ্, অকৃতবাদ, অজ্ঞেয়বাদ—সবস্ত এসে মিলে গেল কবির বিস্ময়-বিস্ফারিত হৃদয়ারবিন্দে। কবির মানাভূমি দর্শনের যুদ্ধভূমির চেয়ে সত্যতর জন্মস্থান হয়ে

দাঁড়াল সত্যের বৃহত্তের ব্রহ্মের আধার। শিশুর বিস্ময় আর প্রাজ্ঞের জিজ্ঞাসার এত সহজ সমন্বয় আর কি কোথাও আছে? সত্যদর্শনের এই সহজ হৃদয়ভূমি থেকে দর্শন আস্তে আস্তে নেমে এসেছে মনীষার বুদ্ধির তর্কের ভূমিতে। সূত্র বার্ত্তিক ভাষ্য টিকা টিপ্পনীর কোদাল চালাতে চালাতে ক্রমশ বুড়িয়ে গেছে, ভারী হতে হতে শেষ পর্যন্ত তার পাখা গেছে ভেঙে। বেদের স্বপর্ণ পক্ষীরাজকে টুকরো টুকরো করে তার এক একটি অঙ্গের উপর এক একটি পীঠ বানিয়েছে এক একটি দর্শন-সম্প্রদায়, এক একটি ধর্মসম্প্রদায়।

বলেছিলাম বেদের ভাষাকে ভুললেও তার ভাবকে আমরা ভুলিনি। সেই ভাবীর কাছে নানান ছলে—ধর্মের ছলে দর্শনের ছলে কাব্যের ছলে—ভাব শিখে আমরা ভাবীর দিকে অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি, কবে আমাদের অভাব ঘুচবে কবে আমা-আমাদের স্বভাবে ফিরব, সেই আশায়। এখন নিজের প্রতিবাদ নিজেই করে বলতে চাই যে বেদের ভাষাকেও আমরা ভুলিনি। শুধু ভুলিনি নয়, এমন করে তাকে মনে রেখেছি যে এমন মনে রাখার দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। কয়েক হাজার বছর ধরে টেপ-রেকর্ডের মতোই প্রায় অশ্রান্ত অক্লান্ত ভাবে বেদকে আবৃত্তি করে এসেছেন, স্মৃতিতে রেখেছেন আমাদের বেদাধ্যায়ীরা। সুতরাং বেদের ভাষাকে আমরা সাধারণ মানুষরা ভুললেও সবাই ভুলেছে একথা ঠিক নয়।

তাহলে? ভাবও ভুলিনি, ভাষাও ভুলিনি, কী ভুললাম তাহলে? কী ভুলল আমাদের ভোলা মন?

ভোলা মন ভুলে নয়েছে ঐ ভাষার সঙ্গে ভাবের সম্পর্কটি। আর এর থেকেই যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত। সেই প্রাচীন কালেই যাস্কের নিরুক্তে দেখি বেদব্যাখ্যায় নানান সম্প্রদায়ের উল্লেখ। যেমন বেদের যমদেবতা অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যাস্ক বলছেন —কে এই অশ্বিদ্বয়? কেউ বলেন দ্যুলোক আর পৃথিবী। কেউ বলেন, দিন আর রাত। কেউ বলেন সূর্য আর চাঁদ। ঐতিহাসিকরা বলেন, পুণ্যকৃৎ দুজন রাজা। যাস্কের নিজের মত হল, সব কিছুকে ব্যাপ্ত করেন (অশ্—ব্যাপ্তি) বলে অশ্বী। দুজনের একজন ব্যাপ্ত করেন রস দিয়ে, আর একজন জ্যোতি দিয়ে। একজন তমোভাগ অশ্বী, আর একজন জ্যোতির্ভাগ অশ্বী। মধ্যরাত্রি থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এঁদের কাল। অন্ধকার ভেঙে ভেঙে আলো ফোটান এঁরা।...তেমনি, বৃত্র কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, নৈরুক্তরা বলেন, বৃত্র হল মেঘ, ঐতিহাসিকরা বলেন বৃত্র হল ত্বষ্টার পুত্র একজন অসুর। তারপরই যেন একটু আমতা-আমতা করে বললেন, অহিবত্ তু খলু মন্ত্রবর্ণো ব্রাহ্মণবাদাশ্চ' অর্থাৎ মন্ত্রের ভাষায় এবং ব্রাহ্মণের বর্ণনায় কিন্তু বৃত্রকে দেখি সাপের মতো, যে তার শরীরকে বাড়িয়ে স্রোতগুলোকে আটকে দিয়েছিল, তাকে হত্যা করার পর সেই স্রোতেরা কলকল করে বয়ে গিয়েছিল।" এরপর কোন মন্তব্য না করে তিনি উদাহরণ দিতে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ একটা নিগূঢ়ার্থের আঁচ পেয়েছেন কিন্তু ধরতে পারেননি, অথবা ধরতে পেরেও বলতে চাননি বলে চুপ করে গেছেন।

বেদের যে ব্যাখ্যা সবচেয়ে বেশী প্রচারিত এবং প্রচলিত তা হল সায়ণাচার্যের ভাষ্য। এই ভাষ্যে বেদের যে অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যা পাই, তাতে বেদের মহিমা কিছুই পরিস্ফুট হয় না।

এই সায়ণভাষ্যের ধ্বজা ধরেই আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বেদাভিযান সুরু হয়েছিল। কিন্তু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনেক ধুলো উড়িয়েও তাঁরা বেদের মধ্যে কোন গুপ্তধনই আবিষ্কার করতে পারেননি।

বেদকে নিয়ে এই প্রচণ্ড ভুলবোঝাবুঝির কারণ কী? বেদের উপনিষদ্-অংশের মাহাত্ম্য সবাই মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন, এবং ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যায় বিরোধ থাকলেও উপনিষদ্‌কে 'বর্বরের বিড়বিড় বলতে কেউ সাহস করেননি। কিন্তু এই উপনিষদ্ বেদের যে মূল মন্ত্রভাগের অর্থাৎ সংহিতার অনুবৃত্তি, সন্তান, ব্যাখ্যান, তার সম্পর্ক এ-মন্তব্য যেন অনায়াসেই করেছেন বাঘাবাঘা পণ্ডিতেরা। এর কারণ কী?

কারণ বেদ নিজে। বেদ হচ্ছে কাব্য। শুধু পণ্ডিত যে, মরমী নয় পরশী রসিক নয়, তার বোঝার জিনিষ জগতে আর যাই হোক, বেদ নয়। আর এ কাব্য রচিত এমন সন্ধ্যা ভাষায়, এমন স্বার্থক নানার্থক শ্লিষ্ট ভাষায়, যে তার মর্মোদ্ধার করতে তিনিই পারবেন যিনি একাধারে মরমী কবি ও মনীষী—**The words of the Veda could only be known in their true meaning by one who was himself a seer or mystic, from others the verses withheld their hidden knowledge.**

একটি গোপন অর্থের রত্নভাণ্ডার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, আর একটি সামান্য অর্থের সাধারণ ভাণ্ডার বাইরে সাজিয়ে রেখে, অথবা বলতে পারি ঐ সামান্যকেই অসামান্য করে নিয়ে, সামান্যে-অসামান্যে ওতপ্রোত করে দিয়ে তারই মালা গলায় পরে বসে বেদবতী বাক্, বেদেনী মেয়ে—

কেউ ভাবছে পুঁতির মালা, কেউ ভাবছে রত্নহার
বেদের মেয়ে ঝনঝনিয়ে শুনছে শুধু শব্দ তার।
অর্থে অর্থে শব্দসায়র, শব্দ ওঠে ঘাই দিয়ে
বেদের মেয়ে শুনতে থাকে, হাসতে থাকে তাই দিয়ে।
শব্দ জোড়ে, শব্দ ভাঙে, বিশ্বজুড়ে শব্দ ঢেউ
কেউ শুনছে, শুনছে না কেউ, শুনতে গিয়ে ফিরছে কেউ।

সবার সামনে খোলা মেলা হয়ে পড়ে রয়েছে এই যে বেদের গোপন কথা, তার খবর বেদ নিজেই দিয়েছেন অনেক জায়গায়। চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি বামদেব গৌতম একটি ঋকে (৩। ১৬) অগ্নিকে সম্বোধন করে বলছেন,

এতা বিশ্বা বিদুষে তুভ্যং বেদা
নীথান্যগ্নে নিণ্যা বচাংসি।
নিবচনা কবয়ে কাব্যানি
অশংসিষং মতিভির্ বিপ্র উক্থৈঃ
হে কবি অগ্নি, বিদ্বান্, ওগো বেধা
আমি কবি এক কম্পুহৃদয়ে তোমাকে দিলাম আনি
কাব্য আমার পথে যেতে যেতে সাধা
মরমের কথা, মনের বারতা, গভীর গোপন বাণী।

এই মন্ত্রের 'নিণ্যা বচাংসি'র অর্থ হল লুকোন কথা, গোপন কথা, গভীরে নিহিত গুহাহিত কথা। এই গোপন কথা তাঁরা বলেছেন শ্লেষ-রূপক-প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে। যেমন, মন্ত্রের লক্ষ্য হল গো, অশ্ব, বাজ, শ্রবঃ। গবেষক বললেন, বুঝেছি, গো মানে গরু, অশ্ব মানে ঘোড়া, বাজ মানে লুটের মাল, আর শ্রবঃ মানে নামডাক। অতএব সহজ সিদ্ধান্ত কী? না, বৈদিক যুগের লোকগুলো যাগযজ্ঞ করত এইসব পাবার জন্যে। অথচ বেদের সন্ধ্যাভাষায় গো মানে হল জ্যোতি, আলোক ধেনু, আলোক দুগ্ধকরা অমৃতপরিস্রবিনী, অশ্ব মানে ওজঃ, বাজ মানে বল-তেজ, শ্রবঃ মানে শ্রুতি, পরা বাক্‌কে পরমব্যোমকে শুনতে পাওয়া। গো-অশ্বের পরিচিতরূপটিও এ অর্থের আড়ালে ঢাকা পড়েনি। যেমন, শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি, ঘুড়ি লক্ষের দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি—এই গানে ঘুড়ি তার ঘুড়িত্ব প্রায় সম্পূর্ণ বজায় রেখেই একটি অলৌকিক সত্যের প্রতীক হয়েছে। তত্ত্বকথা ঘুড়ির মজায় মজে এ'ঘুড়ির মতোই আনন্দে উড়েছে নীল আকাশের অঙ্গনে।

Thus there emerged in my mind, revealing itself as it were out of the ancient verses, a Veda which was throughout the scripture of a great and antique religion already equipped with a profound psychological discipline,—a Scripture not confused in thought or primitive in its substance, not a medley of heterogeneous or barbarous elements, but one, complete and self-conscious in its purpose and in its purport, veiled indeed by the cover, some times thick, sometimes transparent, of another and material sense, but never losing sight even for a single moment of its high spiritual aim and tendency. (On the Veda, P. 49-50)
'এমনি করে ধীরে ধীরে আবার মনের মধ্যে সেই প্রাচীন মন্ত্রগুলির মধ্য থেকে জেগে উঠল বেদ, যেন আমার কাছে তার স্বরূপটি অনাবৃত করে দিয়ে। সে বেদ হল এক মহিমময় পুরাণ ধর্মের শাস্ত্র এক গহন যৌগিক পদ্ধতির দ্বারা প্রথম থেকেই সমৃদ্ধ। সে শাস্ত্রে চিন্তার অসংলগ্নতা নেই, সে শাস্ত্রের ভাববস্তু নয় আদিমানবোচিত, সে শাস্ত্র নয় বর্বরের গাড়ে-বত্রিশ ভাষা, সে হল অখণ্ড পূর্ণ, এবং নিজের লক্ষ্য এবং বক্তব্যের ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে সচেতন। যদিও তা একটি অন্য এবং অধিভূত অর্থের কখনো স্বচ্ছ কখনো স্থূল আবরণে ঢাকা, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও সে বিস্মৃত হচ্ছে না তার চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এবং অভিনিবেশ।" কিন্তু হায় in the later ages the very device used by the Rishis turned against the preservation of the knowledge...The letter lived on when the spirit was forgotten; the symbol, the body of the doctrine, remained, but the soul of knowledge had fled from its coverings. (ঐ P. 61)

'পরবর্তী কালে ঋষিদের প্রযুক্ত (আধ্যাত্মিক কাব্যকলার) কৌশলটিই কাল হয়ে দাঁড়াল, বিদ্যাকে ধরে রাখা গেল না...বর্ণানুপূর্বী বেঁচে রইল, কথা বেঁচে রইল, তাৎপর্য গেল হারিয়ে। বিদ্যার আত্মা পালিয়ে গেল, পড়ে রইল শুধু তার খোলস।"

মহাকালের করস্পর্শে এই খোলস আবার নড়েচড়ে উঠেছে, ফণা মেলে উঠে বলেছে হাজার ফণা সুতাশঙ্খ—

বাস্তু সাপের ফণা
ভুলে ভাঙছে বেনা
পাতালে পাতাল টান
জাগছে নি মহীস্তান
সেই সাপ-পেটে চোক
বল ক্রোক বল্ ক্রোক
নিগূঢ় যন্ত্র বল
শেষ না, অশেষ বল
শোকসমুৎথ শ্লোক
ক্রোক ক্রোক ক্রোক ক্রোক।

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

শ্রীমায়ের ভাষ্যসহ

৬—বিলম্বে আমি শিখলাম যে বুদ্ধির যখন মৃত্যু, প্রজ্ঞার তখন জন্ম—এই মুক্তি-লাভের পূর্বে আমার ছিল শুধু জ্ঞান।

শ্রী

আরও একবার তোমাদের বলি, এইসব সূত্রাবলীর গঠন ইচ্ছে করেই স্ব-বিরোধী করা হয়েছে যাতে মনে একটু ধাক্কা লাগে এবং তাকে যথেষ্ট সজাগ করে তোলে যার ফলে সে বোঝবার চেষ্টা করবে। এসবকে একান্ত আক্ষরিক অর্থে কখনই গ্রহণ করতে নেই। প্রাজ্ঞ হতে গেলে বুদ্ধি লোপ পেতে হবে—এধরনের কথায় কেউ কেউ যেন উদ্বিগ্ন হয়। তা নয়, মোটেই তা নয়।

যা হতে হবে তা হল এই যে বুদ্ধি আর থাকবে না সবার উপরে প্রভু হয়ে।

সত্যকার জ্ঞানের মত কিছু মানুষের অধিকারে আসবার আগে পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল জীবনে বুদ্ধির প্রভুত্ব অপরিহার্য, না হলে মানুষ হয়ে পড়ে তার আবেগ-উত্তেজনা, খেয়াল-খুশি, কম-বেশি বিশৃঙ্খল ভাবানু কল্পনার হাতে খেলার পুতুল এবং তখন প্রজ্ঞা শুধু নয় নিজেকে মানান-সইভাবে চালিয়ে নেবার মত একান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু হতেও বহুদূরে সরে যাবার বিপদ দেখা দেয়। কিন্তু কেউ যখন তার সত্তার সকল অধমাঙ্গকে বিচারবুদ্ধির সহায়ে চালিত করতে সক্ষম হয়, যে বিচারবুদ্ধি হল মানুষী বোধবৃত্তির শীর্ষ, তখন কেউ যদি চায় সে-অবস্থাকে ছাড়িয়ে যেতে, যদি চায় সাধারণ জীবন, সাধারণ চিন্তা, সাধারণ দৃষ্টিতে জিনিসসব দেখার থেকে মুক্তি পেতে, তাহলে যা প্রয়োজন তাহল, যদি এমনভাবে বলা যায়, বিচারবুদ্ধির শিরোদেশে ওঠা—তাকে ঘৃণাভরে পদদলিত করে নয়, বরং তারও উর্ধ্বে ওঠবার, তাকেও ছাড়িয়ে যাবার এক উপায় হিসাবে তাকে ব্যবহার করে; এমন কিছুতে উঠে যেতে যা বুদ্ধির অনুজ্ঞা মেনে চলতে খুবই কম বাধ্য; এমন কিছু যা অযৌক্তিক হয়ে উঠতে পারে কারণ তাহল এক সমূর্ধ্বের অযৌক্তিকতা, যার সঙ্গে রয়েছে এক সমর্ধ্বের জ্যোতি; এমন কিছু যা, সাধারণ জ্ঞানের অতীত, যা তার অন্তঃপ্রেরণা লাভ করে উর্ধ্ব হতে, অনেক অনেক উর্ধ্ব হতে, ভাগবত প্রজ্ঞা হতে।

এই হল এর অর্থ।

শ্রীঅরবিন্দ যে জ্ঞানের কথা এখানে বলছেন তাহল প্রাকৃত জ্ঞান, একাগ্রতার সহায়ে লব্ধ জ্ঞান নয়; এ জ্ঞান অর্জন করা যায় তর্কবুদ্ধির সহায়ে, চিন্তার সহায়ে, সাধারণ যত উপায়ে।

কিন্তু আর-একবার বলি—আর, পরবর্তী সূত্রগুলি প্রসঙ্গে আবার এতে ফিরে আসবার সুযোগ হবে—বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে ব্যস্ত হয়ো না এই বিশ্বাসে যে সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রজ্ঞার মধ্যে প্রবেশ করবে, কারণ প্রজ্ঞায় প্রবেশ করবার জন্য তোমায় প্রস্তুত হতে হবে; অন্যথায় বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে যথেচ্ছাচারের মধ্যে গিয়ে পড়বার ভয় আছে এবং তা বেশ বিপদজনক।

যা-কিছু তিনি লিখেছেন তার মধ্যে, বিশেষ করে তাঁর "যোগ-সমন্বয়" গ্রন্থে, শ্রীঅরবিন্দ অনেকবারই আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন তাদের কল্পনাবিলাসের বিরুদ্ধে যারা মনে

করে যে কঠোর আত্ম-সংযম ছাড়াই তারা সাধনা করতে পারে, আর যারা সবরকমের প্রেরণা-তেই কর্ণপাত করে যা তাদের নিয়ে চলে বিপদসঙ্কুল ভাবৈকল্যের মধ্যে যেখানে তাদের মত অবদমিত, প্রচ্ছন্ন, গোপনচারী বাসনাকামনা সাধারণ রীতিনীতি ও বিচারবুদ্ধি থেকে মুক্তির অজুহাতে অবাধে আত্মপ্রকাশ করে।

কেউ মুক্ত হতে পারে তখনই যখন সে মানুষী আবেগের উর্ধ্বে অনেক উর্ধ্বে উঠে যায়। মুক্ত হওয়ার অধিকার শুধু তারই আছে যে অর্জন করেছে এক নিরহঙ্কার সমূর্ধ্বের স্বাতন্ত্র্য, সকল বাসনা সকল প্রবৃত্তি যার শেষ হয়েছে।

কিন্তু সাধারণ সমাজবিধি অনুযায়ী যারা খুবই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, খুবই নীতিনিষ্ঠ তাদেরও নিজেদের প্রাজ্ঞ বলে মনে করলে চলবে না, কারণ তাদের প্রজ্ঞা হল এক মিথ্যা-ভ্রম মাত্র এবং তার মধ্যে নেই কোন গভীর সত্য।

বিধান ভাঙতে গেলে বিধানের উর্ধ্বে উঠতে হবে, রীতিনীতি অগ্রাহ্য করতে গেলে উঠতে হবে তার ওপরে, নিয়মশৃঙ্খলা মানতে না চাইলে উঠে যেতে হবে সেসবের অতীতে। আর এই মুক্তির প্রণোদনা কখনো আসবে না ব্যক্তিগত অহংবুদ্ধি থেকে, আসবে না কোন উচ্চাভিলাষের পরিতৃপ্তি বা নিজের ব্যক্তিত্বের মহিমাবৃদ্ধির জন্য, হীনবড়া ভাব নিয়ে অন্যদের প্রতি তাচ্ছিল্য পোষণ করে নিজেকে গোষ্ঠির উর্ধ্বে বসিয়ে তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার জন্যও নয়। যখনই নিজেকে বোধ হবে যেন অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর বিদ্রূপের সঙ্গে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবে এই ভাব নিয়ে : "আমি, আমি আর ওই ওদের মত নই" —তখনই সাবধান হবে, কারণ সেই মুহূর্তেই তুমি পথভ্রষ্ট হয়েছ, রসাতলে তলিয়ে যাবার বিপদ এসেছে তোমার।

কেউ যখন প্রজ্ঞার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই সত্যকার প্রজ্ঞা যার কথা শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলছেন, তখন আর উত্তম বা অধম বলে কিছু থাকে না, সেখানে শুধু শক্তির খেলা যার মধ্যে সব জিনিস তার যথাস্থানে রয়েছে আপন গুরুত্ব অনুসারে ; আর যদি কোন ক্রমোচ্চ শ্রেণী-বিভাগ থেকেও থাকে তবে তাহল পরমপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ, উত্তম-অধমের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ নয়।

আর, মানুষী বুদ্ধি, মানুষী বিচার, মানুষী জ্ঞান দিয়ে এই শ্রেণীবিভাগ নির্ণয় করা যায় না ; এক জাগ্রত আত্মাই আর এক জাগ্রত আত্মাকে চিনতে পারে, আর তখন শ্রেষ্ঠত্বের বোধ পুরোপুরি দূর হয়ে যায়।

সত্যকার প্রজ্ঞা আসেই না যতক্ষণ না অহংবোধ বিলুপ্ত হয়, আর অহংবোধ বিলুপ্ত হয় কেবল তখনই যখন তুমি পরমপ্রভুর কাছে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিতে প্রস্তুত কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির বা কোনরকম লাভের প্রত্যাশা না করে—যখন তুমি তা কর কারণ তাছাড়া অন্য কিছু করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।* ১৭-১০-৫৮

---

* Pensées et Aphorismes থেকে অনুবাদ। অনুবাদক : শতদল

চম্পকলালের স্মৃতিচারণ

একসময়ে মা কোন এক শিষ্যের সম্বন্ধে খুবই সতর্ক ছিলেন ; তার নাম X দেওয়া যাক। মা সব সময়েই তার চিঠি, প্রয়োজন ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু তার প্রচুর চাহিদা ছিল, যাকে বলা যেতে পারে মানসিক বিকার। একদিন মা আমাকে একটি চিঠি X-এর কাছে পৌঁছে দিতে বললেন এবং ফরাসীতে বললেন যার অর্থ এক্সুনি। আমি মাকে বললাম তুমি যা বলছ তাই হবে এবং আর বললাম :

মা, তুমি ওর বিষয়ে এতটা বিবেচক, সে কিন্তু তা নয়।

মা তা আমি জানি।

চ : আমি জানি না, হয়তো একদিন আসবে যখন তুমি যা তার জন্যে করছো সে তার মূল্য বুঝতে পারবে।

মা সেটা যখন ঘটবে, তখন আমিই তাকে ছেড়ে দেব।

দেখতে পারছো ? X-এর মধ্যে সত্যকে জাগরূক করবার জন্য মায়ের পদ্ধতি। একবার সত্য তার মধ্যে জাগলে, তখন আর মায়ের তার জন্যে সতর্ক থাকার প্রয়োজন হবে না।

যা কিছু সুন্দর তা মায়ের চোখ কোনদিনই এড়ায় নি এবং সুন্দরের প্রশংসা করতেও কোনদিনই ভুল করেন নি। একটি বলাটের কাগজ বা মোড়কের কাগজ তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না ; আর যদি তা আকর্ষণীয় হয়, তাহলে তো তাঁর অভিমত প্রকাশ করবেনই।

তোমরা জানো অলব্লেসের বোন, শিলু সাধারণতঃ যাই কিছু আনতো সুন্দর কাগজে মুড়ে আনতো ও সুন্দরভাবে তা সাজিয়ে দিতো। সেগুলো যদিও তার বাতিকের দোকানে যা বিক্রীর জন্যে রাখতো তার নমুনা মাত্র। মা সেগুলি দেখে কি যে খুশি হতেন তা বলার নয় ; প্রায়ই দেখা যেতো যে জিনিসটি মোড়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি আনন্দ প্রকাশ করতেন যে কাগজটি দিয়ে সেটি মোড়া হয়েছে তা দেখে।

আমি মায়ের পাশে সব সময়েই দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দ উপভোগ করতাম। আমার মুখের ভাবপ্রকাশ দেখে, মা শিলুকে বললেন : আমারই মত চম্পকলালও ঐ মোড়কের কাগজটাই বেশি ভালবাসে।

এখার্ট ও তার স্ত্রী, দুজনেই জার্মান, সুন্দরভাবে কাগজে মুড়ে জিনিসপত্র আনতো এবং মায়ের খুশিমুখ দেখে আনন্দে মন ভরে যায়।

মা কিছুই দৃষ্টি থেকে এড়াতে দেবেন না। এমনকি সামান্য চিঠির ব্যাপারেও তাই। তিনি লক্ষ্য করতেন কিভাবে অক্ষরগুলি লেখা হয়েছে, হাতের লেখা, নামের সই ইত্যাদি। অভিমত প্রকাশ করতেন তিনি : "মানুষটি খুব পরিষ্কার সুশৃঙ্খল।" আমার চিঠিটি খেয়ে চেয়ে বলতেন, "চিঠিটা দেখি, চিঠিটা দেখি" এবং সেটি নিবিষ্টভাবে দেখে বলতেন : কর্কশ—অহঙ্কারে স্ফীত ; অস্থিরমন ; বিশৃঙ্খল স্বভাব ইত্যাদি।

এমন কি তিনি চিঠির কাগজের মধ্যের অক্ষরগুলি, লাইনের ধারা (উঁচু বা নিচু)

এবং নাম সইয়ের শিষ্টতা এবং আরও কত কি এইভাবে অর্থপূর্ণ ভাব ভঙ্গীতে চিঠির উপর নানারূপ মন্তব্য করতেন।

মৌলানা আজাদের প্রবন্ধ পড়ে একটি লাইন আমার ভাল লেগেছিল :

"আমি পথটি জানি, কিন্তু আমি কি করতে পারি যদি ডাকাতরা পথে সব চুরি করে নেয় ?"

এটি মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম : যে কাগজটিতে ঐ লাইনটি কপি করে যার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম তারই পিছনে মা লিখে দিলেন, "সেই ডাকাতগুলিকে ধরবার জন্যে ভগবানকে ডাকো।"

তোমাদের মনে আছে যখন পণ্ডিতজীর ('রামেশ্বরম'এর) সংস্কৃত লেখা ধ্যানের সময় মাইকের মারফতে পড়া হতো। সেই সময়ে একদিন মা আমাকে বললেন :

সত্যকর্মা বলে তুমি নাকি চমৎকারভাবে চণ্ডীপাঠ করো। আমি একদিন শুনতে চাই। যদি সত্যই সুন্দর হয়, তাহলে তা রেকর্ড করবো এবং প্লে গ্রাউণ্ডে ধ্যানের সময় সেটি চালানো হবে।

এমনটি আমি কোনদিনই আশা করিনি। আমি আবৃত্তি করতে শুরু করলাম এবং এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দ্রুত—যে ভাবে আমি অভ্যস্ত—সে ভাবেই পড়ে চললাম।

মা বললেন, "না" এবং কিভাবে পাঠ করতে হয় সে-বিষয় নির্দেশ দিতে আরম্ভ করলেন। সেই সময়ে তাঁর যে ভাবভঙ্গী তা সত্যই দেখার মতো। তিনি সত্যই আবৃত্তি করছিলেন না, কার্যত যেন উচ্চারণও করছিলেন না, কিন্তু ঠোঁটদু'টি এমনভাবে নড়ছিল মনে হয় যেন তিনি কথা কইছেন। তিনি আমাকে দেখালেন কি ভাবে ধীরে উচ্চারণ করতে হবে, প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার করে এবং পৃথকভাবে, শান্ত হয়ে।

তারপর তিনি আরও বললেন : সকালে তুমি এভাবে পড়বে। এভাবে পড়লে অনেক সাহায্য পাবে।

এভাবে আমি পড়তে লাগলাম এবং বাস্তবিকই এতে আমার অনেক উপকার হয়েছে।

মাধব : "তুমি এত দ্রুত পড় কেন ?"

চ : এ ছাড়া আমি অন্যরকম জানতাম না। ছেলেবেলা থেকেই আমি সকলকেই এইভাবে পাঠ করতে শুনে এসেছি।*

---

* অনুবাদক—নিত্যানন্দ বসু

ঊর্ধ্বায়ন

শতদল

ছায়াময় শব ঘিরে ঝরেছে আশ্লিষা,
তনুরেখা আঁকিয়াছে কুসুমরেখায়;
এখনো দেখায় যেন মরণসজ্জায়
সে-তামস দেহ কার কে বলিবে তাহা?

ধীরে আরো ঝরে পড়ে অগণিত ফুল,
ঢেকে যায় শুভ্রতায় ঘন অন্ধকার;
সহস্রশিখায় জ্বলে তীব্র অভীপ্সায়
পুষ্পিত ঊর্ধ্বাভিসার—ছায়া মায়া, ভুল।

দুটি কবিতা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

নিত্য জ্যোতি

অটুট লাবণ্য ফুল
যখন তুলিতে
ফুলের স্বভাবে শিল্পী।

হৃদয়ে সৌগন্ধ্য তার
অনুকূল তখন বাতাসে
খুলে যায় রুদ্ধ বাতায়ন।

সেই সব বিরল প্রহর
বহু অপেক্ষার শেষে
ধন্য করে জীবন রচনা।

মুহূর্তে শাশ্বত তারা
সঙ্গোপন মাধুর্যের ধারা
নামে নিত্য জ্যোতির নির্ঝরে।

অমল বাগানে

অমল বাগানে এই রাতের বিজনে
একা জেগে আছি স্তব্ধতায়
সময়ের ব্যস্ত ধ্বনি কখন নীরব
চরাচর মগ্ন ঘুমে, না কি জাগরণে?

নিজেরে এখন দেখা
স্বচ্ছ স্থির গভীর অতলে।

একান্ত মাটির কাছে
অন্তরঙ্গ মাটির মায়ায়
প্রদীপ্ত ফুলের মত
এ বুকের দলগুলি খোলে।

জেগে থাকা আকাশের তারা
কাছে আনে দূরের ইশারা
আপনারে খুঁজে পেতে
অমল বাগানে ফিরে আসা।

দুটি সনেট

জ্যোতির্ময়ী

১

হিরণ্ময় মধ্যাহ্নের ভাস্বর তপন
অনাদি-উদ্ভূত পক্ষ অনন্তে প্রক্ষালি'
অপূর্বের স্বপ্নালোকে রঞ্জিল গগন।
স্বর্ণ-দীপ্র বর্ণদ্যুতি দিগন্তে সঞ্চালি'

এ-মর্ত্যে আকর্ষি' আনে মৃত্যুঞ্জয় পাখী,
ছন্দে গন্ধে পূর্ণ তার মর্মের মঞ্জুষা
মণি-গর্ভা, উদয়-পর্বতে সৃষ্টি-সাকী
অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে ডাকে অভিনব উষা।

আনন্দ-আবর্ত ওঠে যুগ-প্রবর্তনে:
মন্থিত সিন্ধুর শুচি-শুভ্র মুক্তারাশি
নিস্পন্দিত বক্ষে জপি' দীপ্ত শুভক্ষণে
স্রোতস্বলা নক্ষত্রসব উঠিল উদ্ভাসি।

আনন্দের চিত্রবহা বিচিত্র জীবন
অলক্ষ্য প্রসূন-বীজ করিল বপন

২

কোথা তব রুদ্র বহ্নি, প্রলয় অনল?
আলো তার বহ্নিশিখা; আজি অন্ধকার
বিমথিত হোক—হোক প্রাণ আলোক-বিহ্বল,
অলঙ্ঘ্য আহ্বান আনো দুর্গম পন্থার।

নিয়ে চলো দীপ্ত পথে বন্ধন উদ্ভাসি',
মহান অম্বর সাথী, মুক্তপক্ষ দাও;
হে প্রিয় বিদ্যুৎপ্রভ! থেকোনা উদাসী,
দুস্তর স্বপনী করো তুমি যারে চাও।

যে অমৃত-বসুধির ক্ষণিক সিঞ্চনে
মৃত্যুহীন সত্তা লভে মৃত্তিকা-সন্তান,
মূর্ত করো স্পর্শ তার এ-মর্ত্য জীবনে—
ক্ষুদ্রেরে প্রদান করো বৃহত্তম প্রাণ।

বিদ্যুতে বিদ্বিত হও হে সিন্ধু সুদূর,
মর্মে মোর বিত্ত রাখো অজ্ঞাত বন্ধুর।

একটি অপরাজিতার কাহিনী

ভাস্কর গুপ্ত

আকাশছোঁওয়া হিমানী পাহাড়, আর নীলজলের ঝিরঝিরে নদী শীর্ণা। এরই মধ্যে ছিল এক বন। মস্ত বড় সেই বন এপাশে ওপাশে বিশাল, বিস্তৃত। সেই বনে ছোট গাছ ছিল না একটিও। তাতে ভীড় করেছিল নাম না জানা কত উঁচু উঁচু গাছ। (মাথা উঁচু করে তারা তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে, পাল্লা দিত সবার আগে সূর্যের আলোকে ধরে ফেলবার জন্য। তাদের জীবনে ছিল না দুঃখের কোনো চিহ্ন। যখন আকাশের বুক থেকে অঝোরে নেমে আসত বৃষ্টির ধারা—তারা তাদের সবুজ পাতা মেলে ধরত, স্নান করত সেই জলে। আবার, পূর্ণিমার রাতে, যখন দুধ-শাদা জ্যোৎস্নায় ভেসে যেত পৃথিবী গাছের দল সারা গায়ে আনন্দে মেখে নিত সেই চাঁদের কণা। বসন্তে, যখন দখিনা বাতাস বইত, আকাশের গায়ে যখন ঘন নীল রঙের ওড়না, পৃথিবী যখন লাল পলাশের রঙে রঙ্গীন, তখন সেই বনে ডেকে উঠত দোয়েল, কোয়েল, পাপিয়া—বসে যেত আনন্দের মেলা। এমনই ছিল সেই বন।

একদিন, সে এক রোদচালা দুপুর। গাছগুলি তাদের পাতায় মেখে নিচ্ছে সূর্যের কিরণ। নিঃঝুম, নিস্তব্ধ ঘুমন্ত চারিপাশ। এমন সময়, গাছালির মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ যে, সুদীর্ঘ তার নাম, শুনতে পেল তারই পায়ের কাছে নিতান্ত কচি গলায় কেউ ডাকছে তাকে। অবাক হল সে, বিরক্তও কিছুটা। অনেক উঁচুতে তার মাথা—সেখান থেকে অনেক কষ্টে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। বুঝতে পারল না কিছুই। শুধুই শুনতে পেল তার পায়ের কাছ থেকে উঠে আসা তীক্ষ্ণ, তীব্র এক আর্তি।

'হে সুদীর্ঘ! তুলে ধর আমাকে। বাঁচাও আমাকে এই অন্ধকার থেকে।'

'কে হে তুমি? তোমাকে যে দেখাই যাচ্ছে না। কত ছোট তুমি, তোমাকে আমি বাঁচাব কেমন করে?'

'আমি অপরাজিতা,' বলে উঠল সে, 'তোমার পায়ের কাছে আমার জন্ম হয়েছে সবে গতকাল। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি না যে। তোমার বিশাল দেহকে আশ্রয় করে আমাকে উঠতে দাও—আমাকে পেতে দাও সূর্যের অফুরান আলোর একটি কণা।'

'সাহায্য!' অসীম তাচ্ছিল্যে মাথা ঝাঁকাল সুদীর্ঘ। 'আমাকে কে সাহায্য করেছিল উঠে দাঁড়াতে? সূর্যের আলো পেতে কার সাহায্য দরকার হয়েছিল আমার? ও তোমার জন্যে নয়, বুঝলে হে। যাও যাও বিরক্ত কোরো না আমাকে।' চুপ করল সে, যেন চিরদিনের জন্য।

বেচারি অপরাজিতা। তার কচি সবুজ পাতা দুটি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে অনেকবার সে চেষ্টা করল সূর্যের আলো পাবার। কিন্তু হায়—কেমন করে সে পাবে সেই আলো? সুদীর্ঘর মাথার উপর তার ঘন পাতার জালে আটকে গেছে আলো। তার পায়ের কাছে জমাট অন্ধকার।

'হায় কেন জন্ম হল আমার?" ভাবল অপরাজিতা, 'শুধু এক বিফলা জীবন বয়ে

বয়ে শেষে মৃত্যুকে বরণ করা—এই কি হবে আমার ভবিতব্য ? একটি সুন্দর ফুল ফোটাতে পারার সার্থকতা কি কোনোদিন আসবে না আমার জীবনে ?' অপার দুঃখের অশ্রুকণা শিশির হয়ে ঝরে পড়ল তার পাতার থেকে। শিশির ঝরার টুপটাপ শব্দে জেগে উঠল ঘাসের বনে ঘুমিয়ে থাকা প্রজাপতি চিত্রপক্ষ। উড়ে এসে বসল সে অপরাজিতার পাশেই একটি ঘাসের ডগায়। গুনগুন করে বলল সে, 'ওমা। তুমি কাঁদছ ? এখানে কাঁদে না কেউ। জানো না বুঝি তা ?'

'হায় বন্ধু ! তুমি তো জানো না আমার দুঃখের কথা। সুদীর্ঘ বলেছে আমাকে সে সাহায্য করবে না উপরে উঠতে, সূর্যের আলো পেতে। বল, তাহলে এই অন্ধকারেই কি পড়ে থাকব আমি চিরকাল ? সোনালী আলোর স্পর্শ লাভের সৌভাগ্য কোনওদিনই কি হবে না আমার ?'

সুন্দর তার ডানাদুটি কাঁপিয়ে ঝিরঝির করে হেসে উঠল প্রজাপতি, 'হবে না কেন ? সুদীর্ঘ ছাড়া আরও তো কত গাছ আছে বনে। ঐ তো আছে ঋজুরেখা—যাও না ওর কাছে। ভারি নরম মন ওর। ও নিশ্চয় সাহায্য করবে তোমাকে।' রঙ্গিন পাখায় নাচের ছন্দ তুলে উড়ে গেল চিত্রপক্ষ।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অপরাজিতা। কত দূরে আছে ঋজুরেখা ? ঐ তো দেখা যায় তাকে। মাটির উপর দিয়ে বুকে হেঁটে অপরাজিতাকে পৌঁছতে হবে ওর কাছে। 'দেরী হবে, হয়ত দেরী হবে আমার আলোর স্পর্শ পেতে। তবু, ওরই কাছে যাব আমি—ঐ ঋজুরেখার কাছে। ওরই সাহায্যে পেতে চেষ্টা করব সূর্যের আলোর স্পর্শ।' মনে মনে ভাবল অপরাজিতা। প্রার্থনা জানাল সে ভগবানের কাছে, 'ভগবান—শুরু হ'ক আমার পথচলা নিরন্তর—ঐ আলোর স্পর্শের জন্য শুধু। শান্ত কর আমাকে—শুধু সোনালী আলোর ঐ রূপ ছাড়া অন্য কিছুতে যেন আকৃষ্ট হয় না আমার মন।' প্রণত হল সে, আর সেই মুহূর্ত থেকে সে এগিয়ে চলল ঋজুরেখার দিকে।

কেটে গেল কত দিন, কত রাত। একটুও না থেমে অবিশ্রান্ত চলেছে সে। ঋজুরেখা এখনও তার থেকে অনেক দূরে। সেদিন বৈশাখী দুপুর—প্রচণ্ড উত্তপ্ত বাতাসে দগ্ধ হচ্ছিল পৃথিবী। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বুঝি কিছুটা পরিশ্রান্ত হয়েছিল অপরাজিতা—হয়েছিল হয়ত বা কিছুটা নিস্তব্ধ। সেই তন্দ্রার মধ্যে সে শুনতে পেল তিনটি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। যেন বর্ষাকালের পরিপূর্ণ নদীর কুলুকুলু। 'দেখ দেখ—বেচারি লতাটি। কতদূর থেকে আসছে ও ? কোথায় বা যাবে ? কেনই বা এত পরিশ্রমে পথ চলছে ও ?'

'কে ভাই তোমরা ? কোথায় আছো ? আমি যে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না।'। প্রশ্ন করল অপরাজিতা।

'উপর দিকে তাকাও। আমরা পরভোজী। এই মহান বৃক্ষ সুপর্ণর শাখাপ্রশাখা আমরা।' উত্তর দিল তারা। কিন্তু কোথায় চলেছো তুমি—ওগো অপরাজিতা ? একি ভীষণ কষ্টকর পথচলা।' বলল তাদের মধ্যে বড়টি—নাম যার সুপূর্ণা।

'চলেছি অনেকদূরে। আমি নিজেই জানিনা এখনও কতদূর আমাকে যেতে হবে।'

'তবে কেন পথ চলেছ তুমি যখন নিজেই জানো না নিজের গন্তব্য ?" প্রশ্ন করল সুদর্শনা মানে বেজোটি।

'আলোর জন্য পথচলা আমার। সোনালী আলোর স্পর্শ পেতে—একটি কণা আলো চাই আমার—একটি কণাও অন্ততঃ।'

'আলো। কি আশ্চর্য কথা।' বলে উঠল পরিতৃপ্তা—ছোটটি, 'এই যে আমরা—আছি মহান সুপর্ণর আশ্রয়ে, খাদ্যও পাচ্ছি তার থেকেই, আলোর প্রয়োজন তো হয় না আমাদের কখনও।'

'হায়। তোমরা কি দেখনি আলোর রঙ? শোনো নি তার ভাষা? আমি যে গতজন্মের স্বপ্নে দেখেছি তাকে, গভীর ঘুমের মধ্যে রেখেছে সে তার আহ্বান। জন্ম আমার ফুল ফোটানোর জন্য। আলো ছাড়া কেমন করে তা সম্ভব, বল? কেমন করে হয়ে উঠব পরিপূর্ণ?'

'ফুল। ফুল ফুটিয়ে লাভটা কি বল? ফুল তুলে নিয়ে যাবে নীর্ণা নদীর পরপারের বালীরা। নয়ত দূর বনের মৌমাছি গুঞ্জন—সে আসবে তার দলবল নিয়ে ফুলের মধু খেতে। তার থেকে এই ভাল। দেখ আমাদের—নিশ্চিন্ত আশ্রয়, নিয়মিত খাদ্য আর সুন্দর পোষাক। কি সুখে কেটে যাচ্ছে দিন। তুমিও এস না আমাদের সঙ্গী হবে।' সমস্বরে আমন্ত্রণ জানাল তারা।

'নিশ্চিন্ত সুখে আমার প্রয়োজন নেই বন্ধু। আমাকে যে ডাক দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলন—সেই আমার একমাত্র লক্ষ্য। আমি চাই আনন্দ—তার সাথে মিলনের আনন্দটুকু শুধু। অন্য কিছুতে আমার তৃপ্তি নেই। বিদায় বন্ধুরা।' এগিয়ে চলল সে। তার দুই চোখে তখন দূরের আভাষ। সেই দিকে চেয়ে বুঝিবা একটু আনমনা হল তারা—সুপর্ণা সুদর্শনা আর পরিতৃপ্তা। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা আবার ফিরে গেল তাদের অভ্যস্ত, নিশ্চিন্ত গতানুগতিক জীবনধারায়।

এমনি করেই এগিয়ে চলল সে। ধীর, অনলস, অটল। পথশ্রমে যদি কিছু ক্লান্ত হয় তবে স্মরণ করে তার আরাধ্যকে। নতুন উদ্যমে আবার শুরু হয় তার পথচলা। এমনি ভাবে কেটে যায় দিন, দিনের পরে রাত—পার হয়ে গেছে অনেক দিন। এ কয়দিনে লতাটি হয়ে উঠেছে বেশ পুষ্ট। তার ডালে ডালে দেখা দিয়েছে অনেক কচি পাতা। এ কয়দিন সে ছিল পথের ধারে ঘাস পাতার আড়ালে। এখন সে লম্বা হয়ে গেছে খানিকটা, তাই পড়েছে এসে পথের ঠিক উপরেই। এমন দিনের অলস দুপুরবেলা কোথা থেকে ছুটে এল বনের হরিণ ক্ষিপ্রগতি: পথের উপর সতেজ লতাটিকে দেখে লুব্ধ হল সে। সোল্লাসে বলে উঠল, 'আহা। এমন তাজা খাদ্য চোখের সামনে অনেকদিন দেখি নি।' মুখ নামাল সে অপরাজিতার পাতাগুলির দিকে। আর সেই মুহূর্তে অপরাজিতা, সে স্মরণ করল তার আরাধ্যকে—বলল, 'ওগো দেবতা, ওগো সূর্য—এই যে আমার পথচলা, এ তো শুধু তোমারই করুণার একটি কণাকে ধারণ করতে। তাকে দিয়েই সার্থক করে তুলতে আমার জীবনকে। সে সফলতা আসবে কিনা জানি না, তবু এমনভাবে পথের মাঝে ক্ষিপ্রগতির ভোজ্য হয়ে যেতে আমি রাজি নই। আমাকে তুমি শক্তি দাও, যাতে তাকে আমি প্রতিহত করতে পারি। আর ক্ষিপ্রগতিকে সে বলল শান্তভাবে, 'আমি তোমার ভোজ্য নই বন্ধু। আমি ব্রতধারিণী—ব্রত উদ্‌যাপনে চলেছি আমি। চলেছি পরম সার্থকতার সন্ধানে। তুমি আমার পাতাগুলিকে খেতে চাও ক্ষিপ্রগতি, বন্ধু আমার?' মুখ তুলে তাকাল

হরিণটি। একি আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শুনছে সে। এমনটি তো সে শোনেনি কোনোদিন। যাকেই সে ভোজন করতে গেছে সেই তাকে আঘাত করেছে ভালপালা দিয়ে নয়ত কাঁটা দিয়ে। আর তা না হ'লে তার পায়ের কাছে পড়ে করেছে আকুল ক্রন্দন। এমন শান্তভাবে তাকে উপেক্ষা বুঝি করেনি কেউ কোনওদিন। স্তব্ধ হল সেই প্রগলভ বুঝি বা ক্ষণকালের জন্য—তারপর মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে গেল নিজের পথে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উপরে তাকাল অপরাজিতা। বহুদূরে নীল আকাশে দেখা যায় সূর্যকে। কিন্তু কেমন করে, কতদিনেই বা পারবে নিজের মধ্যে তার আলোকে ধারণ করতে? ধীর পায়ে আবার সে অগ্রসর হল ঋজুরেখার দিকে।

অটল পরিশ্রমে সে এগিয়ে চলেছে, কেটে যায় দিন...

সেদিন আকাশ জুড়ে বেষ করল। বহুদূর থেকে লক্ষ লক্ষ অশ্বের গতিবেগ নিয়ে ছুটে এল দুরন্ত ঝড়। দশদিক ঢেকে গেল অন্ধকারে। হিমানী পাহাড়ের মাথায় জমা বরফ পেঁজা তুলোর মত ছড়িয়ে পড়ল সারা বনে। শীর্ণা নদীর জল জমে বরফ হয়ে গেল মুহূর্তেই।

সেই দুর্যোগ কেটে যখন সূর্য উঠল আবার—ঝলমলিয়ে হেসে উঠল চারিদিক। গাছের পাতায় জমা বরফগুলি জল হয়ে ঝরে পড়ল নীচে। শীর্ণা নদীর জমে যাওয়া ধারাটি নতুন রূপ পেয়ে আবার চলল ছুটে—ঢেউয়ের সঙ্গে পাথরের নূপুর বাজিয়ে। কিন্তু হায়। বরফগলা জলে মাটি হয়ে গেছে পিছল আর ভীষণ কর্দমাক্ত। সেই কাদামাটির নীচে ঢাকা পড়ে গেছে আমাদের অপরাজিতা। কাদার উপর একটুখানি জেগে আছে তার মাথাটি। করুণভাবে তাকিয়ে আছে সে অনেক দূরের দিকে। যেখানে পাতার ফাঁক দিয়ে গলে পড়েছে এক কণা রোদ্দুর। ভাবছে সে, 'হায় সূর্য। তোমার আলো তো শুধু তাদের জন্যে নয়, যারা বড়। সে তো আমার জন্যেও। সে তো থেমে যায় না কোনো নির্দিষ্ট উচ্চতায়। তোমার আলো তো সর্বব্যাপী। সে তো পৌঁছয় পৃথিবীর নিম্নতম প্রান্ত পর্যন্ত। তবে? তবে আমি কেন বঞ্চিত থাকব তোমার আলো থেকে?' ভাবছিল সে এমনি সব কথা। এমন সময় কোথা থেকে এল রজতশুভ্র, বনের দুরন্ত খরগোশটি। দেখল সে অপরাজিতার দুর্দশা। ঠোঁট বাড়িয়ে ধরল তার ডগাটি, ধীরে ধীরে টেনে বার করে আনল তাকে, কাদার ভিতর থেকে। কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরল অপরাজিতার চোখ থেকে। 'বন্ধু আমার। কি করে তোমাকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা?'

'তোমার চোখের জলেই তো জানিয়েছে সব। তোমার ভালবাসা।' লাল চোখে খিলিক মারল রজতশুভ্র—দ্রুত চঞ্চল পায়ে হারিয়ে গেল বনের ভিতর। সেই দিকে চেয়ে ভালবাসায় ভরি হল অপরাজিতার বুক। এবার সে তার মুখ তুলে তাকাল ঋজুরেখার দিকে। ঐ তো ঋজুরেখা। সেদিনের ঝড়ে উড়ে গেছে তার মাথার উপরে জমাটবাঁধা ঘন পাতার আড়ালটুকু। সেই ফাঁক দিয়ে সোনালী সিঁড়ির মত নেমে এসেছে সূর্যের কিরণ।

কোথা থেকে উড়ে এল চিত্রপক্ষ। 'ঐ দেখ, বেশি দূরে তো নয়। ঐ যে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে রোদ্দুর। নাই বা তুমি উঠে দাঁড়ালে—ঐ আলো মেখে নাও—তাতেই তুমি হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ।'

'তাই হ'ক।' ভাবল অপরাজিতা। এবং চলল সে সেই আলোর দিকেই...

কেটে গেল কতদিন, কত মাস, বছর। চলল তার অবিরাম পথ চলা সেই আলোর দিকে। অবশেষে, বসন্তের এক নির্মল সকালে সে পৌঁছে গেল সেই আলোর কাছে। প্রখর আলোর স্পর্শে শিউরে উঠল তার সারা শরীর। অনুভব করল সে কি এক বেদনা যেন তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। 'প্রিয়তম, প্রিয়তম' অস্ফুটে বলল সে। তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হল সে। এ কি অদ্ভুত রূপান্তর ঘটেছে তার! তার ডালে ডালে ফুটে উঠেছে ঘন নীল ফুল। কি অপূর্ব রূপ তার! সারা বন হয়ে উঠেছে আলোয় আলো। ছুটে এল চিত্রপক্ষ, ক্ষিপ্রগতি, রজতশুভ্র—ছুটে এল দূর বনের মৌমাছি, গুঞ্জন। আরও এল দোয়েল, কোয়েল, পাপিয়া। কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে, অপরাজিতা।' বলল তারা।

'তোমাদের জন্য, তোমাদের জন্যই তো।' লাজুক হাসি হাসল অপরাজিতা। তার নীল ফুলের পাপড়ি মেলে সূর্যের দিকে তাকাল সে। আর তখন, অনেক উঁচু গাছের পাতা থেকে তার বুকে ভালবাসার শিশির ঝরে পড়ল টুপটাপ...টুপটাপ...

সিদ্ধ

পীয়ের কর্নেই

চতুর্থ অঙ্ক

শিমেনের গৃহ

প্রথম দৃশ্য

শিমেন, এলভির

শিমেন। মিথ্যা খবর নয় তো? এলভির, তুমি ঠিক জানো?

এলভির। আবার যদি বলি সকলে কেমন তার জয়ধ্বনি করছে,
আকাশ বিদীর্ণ করছে তার কীর্তিগাথা গেয়ে
বিস্মিত হয়েছে তার যৌবনাস্যে
আপনি বিশ্বাসই করবেন না।
তার সামনে ম্যুরেরা নিমেষে পর্যুদস্ত হল;
আক্রমণ যেমন চকিত পলায়নও তেমনি ত্বরিত—
এবং নিরাপদ বিজয়;
নবীন নেতার খর আক্রমণের সম্মুখে কিছুই দাঁড়াতে পারল না।

শিমেন। আর রোদ্রিগের বাহু ঘটিয়েছে এই ভোজবাজি?

এলভির। তার বীরত্বের চিহ্নস্বরূপ তারই হাতে বন্দী
ও পরাজিত দু'টি রাজা।

শিমেন। এ আশ্চর্য ঘটনা সত্যি তুমি কী ক'রে জানলে?

এলভির। লোকেরা তার জয়গানে আকাশ মুখরিত করে তুলছে—
তাকে বলছে তাদের ত্রাতা তাদের দেবদূত,
তাদের শান্তির সুচরিতা ও রক্ষক।

শিমেন। রাজা, তিনি কী ভাবছেন এসব বীরত্ব ব্যাপারে?

এলভির। রোদ্রিগ এখনো রাজসমীপে আসে নি;
তবে রাজমুকুট পরিহিত দু'জন বন্দী ও শৃঙ্খলিত রাজাকে

দিয়েগ এনেছেন মহারাজের কাছে,
এই অনুরোধ সহ যে অস্ত্রীকে দেখে
পুরস্কারস্বরূপ তার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

শিমেন। রোদ্রিগ কি আহত?

এলভির। তা তো কিছুই শুনিনি।
আপনাকে রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। সাহসে ভর করুন আবার।

শিমেন। আমার দুর্বল হৃদয়ের হারানো ক্রোধ আবার তুলে নেব।
তার ভাবনায় নিজেকে ভুলব না কি।
তার প্রশংসায় আমারও রসনা তৎপর হবে।
তাতে মুক সম্মান এবং নিরস কর্তব্য সায় দেবে?
স্তব্ধ হও প্রেম আমার, রাগ ফুঁসে উঠুক।
দু'জন পরাজিত রাজা, তাতে কী।
পিতা আমার নিহত।
এই শোকের পোশাক—আমার দুর্দশার চিহ্ন—
হল তার বিস্ময়কর বীরত্বের প্রথম প্রতীক।
অন্যরা তার কীর্তিকে বলতে পারে উদারোচিত;
এখানে প্রত্যেকটি জিনিস তার অপরাধের প্রমান।
এই যে কালোর প্রাচুর্য জড়িয়ে আছে আমাকে
এই অতিকায় ঘোমটা, এই ক্রেপবসনের ভার—
আমার বিদ্বেষকে আরো উস্কে দিচ্ছে,
যদিও বারবারই তার পরাজয়;
অথচ আমার প্রেম আমার সম্মানকে জয় করতে পারছে না।

এলভির। শান্ত করুন নিজেকে;
রাজকুমারী আসছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজকুমারী, শিমেন, লেওনোরা, এলভির

রাজকুমারী। আমি তোমার দুঃখে বৃথা সান্ত্বনা দিতে আসিনি;
বরং এসেছি তোমার অশ্রুতে আমার অশ্রু মিশিয়ে দিতে।

শিবেন। রাজকুমারী, উভয়ের আনন্দের ভাগ নিতে পারেন আপনি ;
দৈবদত্ত এই সুখ আস্বাদ করা আপনার ভাগ্য
আমার, শুধু আমারই জন্য কান্না।
তার বীরত্বে জনতার নিরাপত্তা অর্জিত যখন
তখন আজ আমাকে একটু চোখের জল ফেলতে দিন।
সে নগর রক্ষা করেছে এবং রাজাকে সেবা করেছে
তার প্রবল বাহু শুধু আমাকেই দেয় দুঃখ।

রাজকুমারী। শিবেন, একথা সত্যি, সে অসাধ্য সাধন করেছে।

শিবেন। এই দুঃসংবাদ আমি আগেই জেনেছি ;
চারদিকে শুনতে পাই তার প্রশংসা,
যুদ্ধে মহৎ, প্রেমের ক্ষেত্রে দুর্ভাগা।

রাজকুমারী। এই উদার স্তুতিতে কষ্ট হবে কেন তোমার ?
এই তরুণ মল্লযোদ্ধা তোমাকে দিয়েছে আনন্দ ;
তোমার হৃদয়ে বাস তার, তোমার শাসনে তার জীবন ;
তার স্তুতি তোমারই স্তুতি।

শিবেন। অপরে করে করুক তার জয়গান, আমি করব না ;
তার প্রশংসায় আমার আত্মার নির্যাতন ;
তার বর্ধিষ্ণু যশে গভীরতর হয় আমার যন্ত্রণা ;
যত বেড়ে ওঠে সে তত বড় আমার ক্ষতি।
হায়, প্রেমাকুল হৃদয়ের কি দুরবস্থা।
তার মহত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে আমার কামনা,
কিন্তু আমার নিয়তির কঠোর নিয়ন্তা যে কর্তব্য
তা প্রেমের বিরাগে মৃত্যুতে তাকে অনুসরণ করবে।

রাজকুমারী। কিন্তু গতকাল রাজসভায় তোমার কর্তব্যের দাবি
উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল,
তা তোমার পিতৃভক্তির এতই যোগ্য ;
প্রেমের উপর তোমার জয় এত মহৎ ;
কিন্তু এখন—শুনবে এখন বিশ্বস্ত এক বন্ধুর উপদেশ ?

শিবেন। আপনার কথা না শুনলে আমাকে নীচ করা হবে।

রাজকুমারী। আজ তোমার কর্তব্যের মুখশ্রী আলাদা ;
রোদ্রিগ আজ সারা দেশের সহায়সম্বল,
দেশবাসীর প্রমূর্ত আশা ও ভালোবাসা।
মুরেরা তাকে একান্ত ত্রাসের চক্ষে দেখে,
তারই উপর পরম নিশ্চিন্তে নির্ভর ক'রে আমাদের প্রিয় কাস্তিল।
মহারাজা স্বয়ং এখন অস্বীকার করতে পারবেন না
যে তোমার পিতার আত্মা এই যুবকের মধ্যে জাগ্রত ;
তার মৃত্যুতে তুমি চাও সকলের সর্বনাশ।
তোমার দেশ ছিল তোমার পিতার কাছে সর্বাগ্রে কাম্য,
তুমিও তা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্যের হাতে দিতে পার না।
নিজের প্রতিহিংসাব্রত অনুসরণ ক'রে
তুমি কি দেশটাকে একটা মারাত্মক দুর্যোগে ডোবাবে ?
তোমার প্রেমিকের পক্ষে ওকালতি করছি না,
থাকুক তোমার হৃদয় পিতৃভক্তি আঁকড়ে,
বিবাহের কথা আর না ভেবে দাও তাকে দূরে সরিয়ে,
কিন্তু আমাদের জন্য, তোমার রাজা ও স্বদেশের জন্য
তার জীবন রক্ষা কর।

শিমেন। দয়ার দান আমি তো দিতে পারি না ;
যে কর্তব্য চালায় আমাকে তাকে আমি থামাতে পারি না ;
যদিও হৃদয়ে আমার প্রেমের আবেদন এসে পৌঁছায়,
যদিও তার প্রশংসা ও স্তুতিতে রাজকুমার ও জনতা সোচ্চার,
যদিও সকল বীররা তার চতুর্দিকে—
তার জয়ের মুকুটের উপরে থাকবে
আমার দাবির মরণচিহ্নশাখা।

রাজকুমারী। শিমেন আমার, দ্বিধা না করা মহৎ,
যদিও পিতার হয়ে এই প্রতিশোধ
আমাদের হৃদয়ে আঘাত হানা ;
কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির উপরে সমষ্টির স্বার্থপালন মহত্তর মহত্ত্ব।
বিশ্বাস করো, তোমার অন্তর থেকে তাকে নির্বাসিত করে
তুমি দেবে করুণতম দুঃখ।
তোমার দেশের দাবি স্বীকৃত হয় এমন কাজ করো।
তোমার রাজার সাগ্রহ ঔদার্যকেও সন্দেহ ক'রো না।

শিমেন। তিনি শুনুন বা না-শুনুন, আমি ন্যায়বিচারের দাবি জানাব।

রাজকুমারী। ভালো করে ভেবে দেখ, এখন কোন পথ নেবে তুমি।
বিদায়। নির্জনতা তোমার সদ্বুদ্ধির সহায় হোক।

সিফেন। পিতা আমার মৃত। অন্য পছন্দ কী থাকতে পারে আমার?

রাজবাড়ি
তৃতীয় দৃশ্য

ডন ফেরনান্দ, সিয়েগ, ডন আরিয়াস, ডন রোদ্রিগ, ডন সাঞ্চো

ডন ফেরনান্দ। বিখ্যাত পূর্বপুরুষদের বীর অবতংস,
কাস্তিলের চির আশা ও গৌরব,
অতুলনীয় সাহসী বংশের পুত্র,
প্রাচীনের শ্রেষ্ঠের সঙ্গে এখনই সমান তোমার মর্যাদা,
তোমাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে আমি অক্ষম—
তুমি যা জিতে এনেছ তার মূল্য রাজা কখনো দিতে পারবে না।
বর্বর শত্রুদের হাত থেকে আমাদের দেশের মুক্তি,
তোমারই বাহুবলে রাজদণ্ড আমারই হাতে।
আমাদের লোকদের আক্রমণে সতর্ক ক'রে অস্ত্র ধারণের আগেই
মূররা বিতাড়িত—এরকম কীর্তির উপযুক্ত পুরস্কার
রাজা কল্পনায়ও আনতে পারে না।
তোমার হাতে বন্দী দু'জন রাজা আমার সম্মুখে তোমারই বীরত্বের প্রমাণ।
তারা তোমাকে বলে 'সিদ'—রাজা, মহামহিম, দলপতি।
তোমার এ-উপাধিতে আমারই হিংসা হয়,
ওদের দেশে সর্বোচ্চ শিরোপা;
কিন্তু না, সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তুমিই হবে 'সিদ'।
এখন থেকেই 'সিদ' তুমি।
এই মহৎ নামের কাছে যেন নত হয় যত শত্রু।
প্রাণাদা আত্মসমর্পণ করে।
তোলেদো যেন নাম শুনেই কম্পিতকলেবর হয়।
আমার প্রজাদের কাছে তা চিরনির্দেশক হয়ে থাকবে
কত ঋণী আমরা তোমার কাছে।

ডন রোদ্রিগ। না, মহারাজ, আপনি অতিস্তুতি করছেন আমার,
রাজ সমক্ষে লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে,

তাঁর অকৃপণ প্রশংসার অনুপযুক্ত আমি।
এরক্ত আমার শিরায়, যে বাতাস আমি নিঃশ্বাসে নেই
তা আমি পেয়েছি আমার দেশের কাছে।
এসব হারানে এবং মৃত্যুলাভ হলেও
আমার কর্ম হ'তো শুধু কর্তব্যপালন।

ডন কেরনান্দ। শুধু কর্তব্যপালনই রাজসেবার সবটুকু নয়;
তার গৌরব এক দ্রুত ও সমুচ্চ সাহস
যা জয় পরাজয় বিচার না ক'রে
চলে জয় ও যশের পথে।
গ্রহণ করো কৃতজ্ঞ রাজার প্রশংসা,
এবং বলো তোমার কীর্তিকাহিনী।

ডন রোড্রিগ। মহারাজ এই হঠাৎ বিপদের কুক্ষণে
আমার পিতৃগৃহের একদল অনুচর আমার নেতৃত্ব চেয়ে বসল।
বিব্রত অন্তর আমার তখন দুঃখে মুহ্যমান—
আপনার নির্দেশ ছাড়া তো দলের নেতা হতে পারি না,
অথচ আপনার সাক্ষাৎও এক মারাত্মক ব্যাপার,
মহারাজ, ক্ষমা করবেন যে দুঃসাহসে ব্রতী হয়েছিলাম।
আপনার সেবায় বেছে নিয়েছিলাম আত্মদান
যখন আমার অনুগতরা সশস্ত্র অপেক্ষা করছিল আমারই জন্য।

ডন কেরনান্দ। রাজ্যরক্ষাই তোমার আত্মরক্ষার দায়,
তোমার অতুগ্র প্রতিহিংসা আমি ক্ষমা করলাম।
এরপর শিমেনের নালিশ বর্ণনীয়;
তার কথা শুনি তাকে শুধু সান্ত্বনা দেবার জন্য;
বলে যাও।

ডন রোড্রিগ। নেতা হয়ে সামনে দাঁড়ালাম আমি,
দুর্ধর্ষ দলের সারিটি ধীরে ধীরে এগুতে লাগলো;
জমতে ছিল পাঁচশ' জন,
দেখতে দেখতে তা হয়ে উঠল সবর্ম সাহসী তিন হাজার।
ভীতরা তা দেখে সাহস ফিরে পেল।
নদীমুখে পড়ে-থাকা নৌকার মধ্যে সৈন্যদের দুই-তৃতীয়াংশ লুকিয়ে রাখলাম;
প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামে উৎসুক বর্ষিষ্ণু বাকি দল থাকল আমার সঙ্গে।

গুঁড়ি মেরে চললাম আমরা মৃত্যুর মতো নিঃশব্দে—
সুন্দর রাত্রি কেটে গেল অনিদ্রার রুদ্ধশ্বাসে।
আমার আদেশে প্রহরী ছিল পর্যন্ত লুকিয়ে
তাতে সুন্দর কাজ হল আমার পরিকল্পনার ;
আর এমন ভাণ করলাম যে সব আপনার আদেশ মতোই করছি
এবং তাদেরও সেই আদেশই দিচ্ছি।
তখন বান ডাকল তারার ম্লান আলোয় ;
সেই ঢেউয়ের মাথায় ভেসে তিরিশটি যুদ্ধ-তরণী এল বন্দরমুখে।
তারা ঢুকে পড়ল ; সব নিস্তব্ধ ; কোনো প্রহরী নেই,
জাহাজ ঘাটায় জনপ্রাণী নেই, প্রাকারের উপর কাকপক্ষী নেই।
আমাদের চোরাঘাত সফল,
তাদের আক্রমণ একান্ত অভাবিত মনে করে
নির্ভয়ে তারা নোঙর ফেলে নেমে পড়ল ;
কোনো সন্দেহ না ক'রে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর কোলে।
প্রতিটি গুপ্তস্থান থেকে বের হলাম আমরা—
আমাদের সেই রণহুঙ্কার আকাশ ছুঁয়ে উঠল।
তখন সব জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ল আমাদের সশস্ত্র সেনারা ;
ওদের অর্ধেক দল তীরে উঠে আতংকগ্রস্ত,
দেখল আরম্ভের আগেই যুদ্ধে তারা পরাজিত।
তারা এসেছিল লুটতরাজের মতলবে,
নামতে হল রীতিমতো যুদ্ধে।
আমরা চেপে ধরলাম ওদের জলেস্থলে ;
আমাদের মাটিতে ওদের রক্তের নদী বয়ে গেল,
চরম বিশৃঙ্খলায় কোনো বাধাও তারা দিতে পারল না।
কিন্তু অচিরে তাদের নেতারা চিৎকারে তাদের ফিরিয়ে আনল,
ত্রাস তাদের কেটে গেল, দল ব্যূহবদ্ধ হল,
বিনা যুদ্ধে মৃত্যু যে লাঞ্ছনা,
তরবারি খুলে সাহসভরে বাধা দিতে এল তারা।
সমুদ্রতটে, তরীমেলায়, বন্দরের ভিতর, শুধু মৃত্যুর নৃত্য,
যমরাজ তার নটপূর্ব।
তাদের রক্ত আর আমাদের রক্ত মিশে এক প্রবাহ।
কত যে বীরত্বকীর্তি—তা কেউ জানবে না ;
অন্ধকার-পর্দার আড়ালে প্রতিজন যেন একাকী যোদ্ধা ;
কেউ জানে না জয় কোন দিকে।
আমি উৎসাহ দেই আমার লোকদের—
এখানে লোকবল বাড়াই, ওখানে অদল-বদল করি,

প্রভাতের আগে জানি নি জয়লক্ষ্মী কার দিকে।
দিন এসে স্পষ্ট করে দিল জয় আমাদের, পরাজয় ওদের।
মৃত্যুভয়ে সাহস ওদের উবে গেল;
আমাদের নতুন এক দলকে আসতে দেখে
নোঙর তুলে জাহাজে ছুটল তারা, চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে।
রাজারা মৃত বা আহত কিনা দেখার জন্য দাঁড়ালও না:
যে বানের ডাকে ভেসে এসেছিল
তারই স্রোত ভাটায় মহাহট্টগোলে
আমাদের তীর ছেড়ে পালিয়ে গেল ওরা।
রাজা কয়েকজন ও অন্যরা প্রত্যাবর্তন কিম্বা সাহায্যের আশা নেই দেখে
ভীষণ রুখে দাঁড়াল;
প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিয়ে
যখন সব থামল তখন প্রায় সকলেই মৃত।
আমি আত্মসমর্পণ দাবি করলাম,
ওরা কর্ণপাত করেনা তাতে,
তারপর শেষ অনুচরটি মারা পড়তে আর উপায় রইল না।
রাজা দু'জন তখন দলপতির সাক্ষাৎ প্রার্থী;
আমি আত্মপরিচয় দিলে তারা আমার দয়া চায়;
আমি তাদের সোজা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।
এইভাবে যুদ্ধ ক্ষান্ত হল, যোদ্ধাও যখন প্রায় শেষ।
মহারাজ, আপনারই জন্য এইভাবে—

চতুর্থ দৃশ্য

ডন ফেরনান্দ, ডন দিয়েগ, ডন আরিয়াস, ডন আলোনসো, ডন সাঞ্চো

ডন আলোনসো। শিমেন আসছে মহারাজ, আপনার কাছে
ন্যায়বিচারের দাবি নিয়ে।

ডন ফেরনান্দ। কি দুঃসংবাদ। অসময়ে এ কর্তব্য।
যাও, তোমাকে ওর সামনে পড়তে দিতে চাই না;
কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে এখান থেকে যেতে বলছি তোমাকে;
তার আগে তোমার রাজার সাদর আলিঙ্গন নাও।

ডন দিয়েগ। শিমেন ওকে তার অভিসন্ধি থেকে বাঁচাবে।

দন কেয়রনাল্দ। শুনি সে এখনো ওকে ভালোবাসে ;
পরীক্ষা করব তার হৃদয় ;
শোকের ভাণ কর সবাই—

পঞ্চম দৃশ্য

দন কেয়রনাল্দ, দন দিয়েগ, দন আরিয়াস, দন সাঞ্চো, দন আলোনসো, শিবেন, এলভির

দন কেয়রনাল্দ। শিবেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে ;
রোদ্রিগের হাতে দলিত হয়েছে শত্রুরা।
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, তিনি এই সার্থকতা দিয়েছেন তোমাকে।
(দিয়েগের প্রতি) দেখুন আমার কথায় কেমন ওর মুখের রং বদলে গেল।

দন দিয়েগ। দেখুন ও মূর্চ্ছা গেছে,
গভীর প্রেমের অমোঘ চিহ্ন ;
এই দুঃখ তার মনোভাবের গুপ্তকথাটি বলে দেয়।
আর সন্দেহ করতে পারবেন না
তার প্রেমের অনির্বাণ শিখাকে।

শিবেন। বলুন তো, রোদ্রিগ কি মৃত ?

দন কেয়রনাল্দ। না না, সে বহালতবিয়তে,
আর তোমার প্রতি তার প্রেম এখনো অটুট।
তার জন্য উদ্বিগ্ন দুঃখভোগ সরিয়ে দাও।

শিবেন। মহারাজ, আনন্দে যেমন দুঃখেও তেমনি মূর্চ্ছা আসতে পারে ;
সুখের আকস্মিকতায় দুর্বলতা দেখা দেয় ;
হঠাৎ আনন্দ সব স্নায়ু ছেয়ে ফেলে।

দন কেয়রনাল্দ। আমার শ্যেনদৃষ্টি তুমি এড়াতে পারবে না ;
শিবেন, তোমার দুঃখ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

শিবেন। আমার দুঃখের সঙ্গে এই বেদনা তাহলে জুড়ে দিন ;
আমার মূর্চ্ছা শুধু আমার হতাশাকেই দেখিয়েছে ;
আমার ন্যায্য ক্রোধই এর মূলে।

তার মৃত্যু তাকে আমার যুক্তিযুক্ত প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিত।
রণক্ষেত্রে আঘাতে মৃত্যু হলে
আমার অটল ইচ্ছার কী গতি হবে?
এমন গৌরবজনক পরিণতি আমাকে বিদ্রূপ করছে।
আমি চাই তার মৃত্যু—সম্মানের আঘাতে নয়,
গৌরবের দীপ্তিতে তার প্রমাণ চাই না,
অপমানে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবনান্ত—
তাকে দিন খুনীর মৃত্যু, দেশপ্রেমিকের নয়,
দেশের জন্য তা নয়, দিন কলঙ্কিতের মৃত্যু।
তার বিজয়ে আমার নিখাদ উল্লাস
রাজ্য হল নিষ্কণ্টক—
আর আমিও পেলাম আমাদের বংশের আরো যোগ্যতর শিকার।
এমন তরুণ হঠকারী নয় যার দুর্বৃত্তি স্বয়ংনিন্দিত;
মহাবীর, নেতার নেতা, জয়মাল্যে ভূষিত যোদ্ধা
এমন জন যার পতনে সার্থক আমার উদ্দেশ্য।
কিন্তু হায়। আশা আমার যুক্তিকে ছাড়িয়ে যায়।
লোকনিন্দিত আমার অশ্রুর শক্তি কী?
আপনার রাজ্যের স্বাধীনতা তার নিজেরই;
আপনার শক্তির ছত্রচ্ছায়ায় বসে সে তার দুরভিসন্ধি জানায়।
আমার দুর্বলতাকে তার কোনো ভয় নেই,
আমার উপর, শত্রুদের উপর বিজয় তার।
ন্যায়বিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ তারই জয়—
তাতে এই বিজয়ীর নূতন আর এক পুরস্কারলাভ।
সে ও তার বন্দীরা শুনেছে আমার কণ্ঠে তার প্রশংসা—
জয়ের রথ থেকে সে ডাকছে আমাকে অনুসরণ করতে।

ডন ফেরনান্দ। জননী, তোমার কথাগুলি দারুণ অশান্ত;
ন্যায়বিচারের নিক্তি একচুলও হেললে চলবে না।
তোমার পিতা প্রথম আক্রমণ করেন তা তো জানো।
ন্যায়বিচারকে দেখতে হয় ক্ষমারও স্থান আছে।
না, অত তাড়াতাড়ি তোমার রাজার আবেদনে আপত্তি ক'রো না;
পরামর্শ করো নিজের হৃদয়ের সঙ্গে;
সেখানে রোদ্রিগ এখনো বাস করছে।
গোপনে রাখলেও প্রেম তোমার মহৎ সামগ্রী,
এবং তোমার রাজার কাছ থেকে এই ঔদার্য সমর্থন করবে।

সিবেন। আমার জন্য! আমার শত্রু। আমার ক্রোধের লক্ষ্য।
আমার যত দুঃখের গোড়া। আমার পিতৃহন্তা।
আমার ন্যায়সঙ্গত বিজয়কে মহাতাচ্ছিল্য করা হল—
আমার চোখের জলের যেমন সুবিচার করলেন না,
তখন, মহারাজ আমাকে অস্ত্রের আশ্রয় নিতে দিন;
ওই রকমেই সে আমাকে বিধ্বস্ত করেছিল,
আর এই রকমেই আমাকে বদলাই নিতে হবে।
আপনার সব বীরাগ্রগণ্যদের মধ্যে তারই মাথা আমি চাই,
যে তা এনে দেবে সে-ই গ্রহণ করবে আমার এই পাণি।
মহারাজ, ঘোষণা করুন দ্বন্দ্বযুদ্ধ—
যে রোদ্রিগকে পরাজিত করবে তাকেই বিবাহ করব আমি।

দন ফেরনান্দ। পুরানো প্রথা আর চালু করব না।
তার জন্যে রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে।
অন্যায়ের প্রতিবিধানের ছুতো করে প্রায়ই সরানো হয়েছে শ্রেষ্ঠদের,
আর কুলাঙ্গাররা নিষ্কৃতি পেয়েছে।
আমাদের রাজ্যের কাছে যে-জীবন দামী
তাকে ভাগ্যের খামখেয়ালিপনার হাতে দেওয়া যায় না;
অস্ত্রপরীক্ষার সে দায়িত্ব থেকে রোদ্রিগ মুক্ত।
হঠাৎ রাগে যে অপরাধই সে করে থাকুক
দ্রুত পলায়িত মুরররা তা তাদের সঙ্গে দূরে নিয়ে গেছে।

দন দিয়েগ। সে কি মহারাজ। যে আইন আপনার রাজসভা
এতদিন সসম্মানে মেনে এসেছে
আজ শুধু তারই জন্য তাকে বদলাতে হবে?
লোকেরা কি ভাববে, হিংসুকরা কি বলবে,
আপনার আশ্রয়ে যদি সে কাপুরুষের মতো পালায়,
যদি রণক্ষেত্রে প্রতিকার না চায়
যেখানে সাহসী খোঁজে মহান মৃত্যু?
এই প্রশ্রয় তার সুনাম নষ্ট করবে।
না, জয়ের অমৃতধারা আকণ্ঠ তাকে পান করতে দিন।
সাহসভরে সেই অহঙ্কারী কাউন্টের সে মোকাবিলা করেছিল,
আবার সে তা পারবে।

দন ফেরনান্দ। আপনি যখন বলছেন, তবে তাই হোক;
রোদ্রিগের হাতে পরাজিত মূরের জায়গা হাজার জন যোদ্ধা নিতে পারে;

আর যে পুরস্কার আছে
তাতে যে কোনো যোদ্ধাই শত্রু হতে এগিয়ে আসবে।
সকলের সঙ্গে তাকে লড়তে বলা সমূহ অন্যায় হবে।
একবার মাত্র সে নামবে।
যাকে খুশি বেছে নাও, শিমেন, সাবধানে বেছে নাও;
তোমার রাজা আর কোনো আরজি শুনতে রাজি নয়।

ডন দিয়েগ। কেউ যেন উপেক্ষিত না হয়—
যারা তার বাহুবলের শৌর্যের কাছে কম্পিত তারাও যেন না হয়।
আজ তার অজিত বীরকীর্তি সবচেয়ে সাহসীকেও ভীতিগ্রস্ত করে।
কে সাহসে এগিয়ে আসবে
এমন দুর্দান্ত ও উৎগ্রীব যোদ্ধার সম্মুখীন হতে?

ডন সাঞ্চো। ঘোষণা করুন মুক্তাঙ্গন। আমি প্রবেশ করছি।
অবিবেচক হতে পারি, তাহলেও এই বীরের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব আমি।
দেবী আমার আনুগত্যে সম্মতি দিন;
আমি নিঃসন্দেহে লাভ করব আপনার প্রতিশ্রুতির সাফল্য।

ডন ফেরনান্দ। শিমেন, এই রণবিদকে তুমি স্বীকৃতি দিচ্ছ?

শিমেন। মহারাজ, প্রতিশ্রুতি দিলাম।

ডন ফেরনান্দ। তাহলে আগামী কাল।

ডন দিয়েগ। না, মহারাজ, আর বিলম্বে কাজ কী?
সাহসীরা সর্বদাই প্রস্তুত।
এখনই হয়ে যাক।

ডন ফেরনান্দ। এক যুদ্ধ থেকে এসে পরমুহূর্তে আর এক যুদ্ধে?

ডন দিয়েগ। আপনার কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে
দম নেবার সময় পেয়েছিল সে।

ডন ফেরনান্দ। দু'এক ঘন্টা বিশ্রামের সময় দিলাম আমি।
পাছে এই দ্বন্দ্ব মনে হয় আমারই নির্দেশ,
আর এই রক্তাক্ত অসি-চালনা আমার কত অপছন্দ

তা দেখাতে এই আমি রাজসভা নিয়ে এখনই দূরে সরে যাব।
(আরিয়াসের প্রতি)
তুমি থাকবে এই দুই বোদ্ধার মধ্যে বিচারক।
লড়াই শেষে বিজয়ীকে এনো আমার কাছে।
সে যে-ই হোক, পুরস্কার কিন্তু একই।
স্বহস্তে দান করব সিমেনকে,
পারিশ্রমিক হিসেবে সে পাবে এই রমনীয় বিন্যাস।

সিমেন। মহারাজ, এ কি কঠিন আইনে বাঁধছেন আমাকে?

দন ফেরনান্দ। তুমি মৃদু আপত্তি তুলছ,
কিন্তু তোমার উদ্বেল প্রেমার্দ্র হৃদয়
রোদ্রিগ জয়ী হলে সানন্দে গ্রহণ করবে তাকে।
এই কোমল আদেশের বিরুদ্ধে নালিশ বন্ধ কর,
বিজয়ী তোমার স্বামিত্ব পাবেই।*

(ক্রমশঃ)

---

* অনুবাদক—সমীরকান্ত গুপ্ত

রমেন সেনগুপ্তের

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত

প্রণতি

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য : ৩·০০ টাকা

সমীরকান্ত গুপ্তের

কাব্যলোকে

বাংলা কাব্যের মনোজ্ঞ আলোচনা
প্রাচীন থেকে আধুনিক পৌঁছানোর চিত্তাকর্ষক প্রকৃতি-বিশ্লেষণ

মূল্য : ৮·০০

স ম গ্র

র চ না ব লী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

চার খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মনোরম বাঁধাই, সুশোভন সংস্করণ

অমলেশ ভট্টাচার্যের

নিঃসঙ্গ আকাশ

নিঃসঙ্গ আকাশের মতোই উদার উন্মুক্ত চেতনার সুরে
রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone : 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta-25

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

২৪শে এপ্রিল, ১৯৮০

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৮০)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

উষাহরণ কাব্য	শ্রীঅরবিন্দ	৫
একটি পত্র	...	১৭
শ্রীঅরবিন্দের অপ্রকাশিত মূল বাংলা সাবিত্রী		১৮
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২১
বায়ের আলাপ	...	২৫
ফুলের নিহিত অর্থ	শ্রীমা	৩৪
চাঁদ ডুবে যায় (কবিতা)	শতদল	৪৩
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	...	৪৫
মন চল নিজ নিকেতনে	চক্রপাণি চাকলাদার	৪৮
সিন্ধু (নাটক)	পিয়ের কর্ণেই	৫০
সমালোচনা	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার	৬২

বার্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০	,,	২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathmondir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Ponicherry-2

Faith and Sincerity
are the twin agents of success

Blessings

উষাহরণ কাব্য

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম কাণ্ডে

কোকিল নাম প্রথম সর্গ

গাও পুনঃ হে কোকিল যে গান গাহিয়া
আসীন পুষ্পিত বৃক্ষে পাখি-রূপে বিধি
ত্রিদিবে বিরোধ-দাহ, মহাযুদ্ধ মর্ত্ত্যে
ঘটাইলে কুহরিয়া ফুলের আড়ালে
করিল যে বেলা স্নান দৈত্যবালা উষা
কুসুম-শয়ন ত্যজি দিব্য বাণপুরে।
উঠিয়া অনূঢ়া বালা হেরিল বাহিরে
প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত কোকনদ সরে,
হেরিল অরুণ শোভা, খেলিছে বিচপী
তরুলীলা, দেখাইছে লুকাইছে হাসি'
সূর্য্যের তরুণ আলো। সমীরণ ধীরি
গুঞ্জরিছে পুষ্পদলে শিশির লভিয়া,
মধু কুহরিছে পিক। মধুময় স্বরে
কুহরিলে, দৈত্যবালা, সখীগণে ডাকি।
"উঠ, চারুনেত্রা, প্রিয় সখি, ওই হের
সুন্দর পৃথিবী উঠি নাহিছে শিশিরে।
নীরব পূর্ব্বাহ্ণ নিদ্রা। আয় ইচ্ছা করে
যাই নাহি দ্রুত জলে যেথা শৈবলিনী
অযুত-তরঙ্গ-স্বরা
তীর ফুলদল বহি নির্ম্মল সলিলে
ছুটে চারু উপবন চুম্বনে শীতলি।"
শুনিয়া সে প্রিয় বাণী নাগরাজবালা
যেন কোকিলের কুহু সুদূর নিকুঞ্জে
আইল অলসগতি। এখনো রহিল
বিশাল নয়নে নিদ্রা যেন পুষ্পে রেণু
কুমারী রুচিরাননা চারুনেত্রা চারু
নাগরাজকন্যা। তারে প্রথম বয়সে
উর্দ্ধদুর্গ নাগপুর ভস্মসাৎ করি
যেন জয়ধ্বজা রথে বাণ মহাবাহু

আনিল সদর্পে। পূর্ণ যৌবনে রূপসী
উষার চরণ সেবে দাসী নাগবালা।
বিংশতি কুমারী আসে উষার স্বজনী,
ভগিনী আইল সঙ্গে চন্দ্রলেখা চারু,
মন্দগতি, রাজকন্যা কিন্তু দাসীগর্ভে।
ছিল নদীকূলে বন, রচেছে শ্রমিয়া
বিখ্যাত দানব শিল্পী পাণ্ডবের সভা
যার খ্যাতি যে ইন্দ্রপ্রস্থে।

দারুণ যদিও দুঃখ এস মাতা সহি।
সহিল শঙ্কর দক্ষনন্দিনী বিহনে
প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে ক্ষিপ্ত-মনে বহি।"
কিন্তু রতি পুষ্পমাতা রহিল অভাগী
নীরব নিরশ্রু দীন ভস্ম ধরি কোলে।
আইল মধুর বাণী ছিন্ন বীণা করে।
"এস দীপ্তিময় ভবে, ফিরে এস রতি।
শুষ্ক পদ্ম, মৃত পাখি তোমার বিহনে।
মানব-হৃদয় মরে। প্রাণ কাঁদে, বাছা,
তমঃপূর্ণ মেঘগীতি দিনরাত শুনি,
মাধুরী-রহিত ভাষা, কানের অসহ্য
ছন্দ। অবিচারে দুঃখ দিয়াছে বিধাতা,
সহি এস, মহাদেবী, বিশ্বহিত ভাব।
নিজদুঃখ বিশ্বসুখে পরিণত কর
কবিগণ, মানব যাহারা। সমুজ্জ্বল
কবিতা বিস্ময়ে হেরি ধন্য বলে লোকে।
জানে না অবোধ প্রজা হৃদয়ের রক্তে
উজ্জ্বল কবিতা। যার নিঃস্বার্থ আরামে
বিশ্ব-সুখ-আশা বৃদ্ধি, দুঃখই মহিমা
সে জনের, বাছা। এস, পুষ্পমাতা, এস,
কাব্যপ্রাণ জাগাইয়া নির্বাপ দুঃখাগ্নি।"
কিন্তু রতি পুষ্পমাতা রহিল অভাগী
নীরব নিরশ্রু দীন ভস্ম ধরি কোলে।
আইল নারদমুনি জগতের স্নেহী।
"এস আলোময় ভবে, ফিরে এস, রতি।
শুষ্ক নদী, শুষ্ক তরু। নিষ্প্রানন্দ এবে
পত্রময় কূহরিত আম্রবন, শীতল

তরুচ্ছায়া, মরু-সলিলা আম্রক-নদী।
দিশাহারা ঋষিগণ মরুভূমি ভবে।
অসহ্য বিরহ-জ্বালা এস যাতা সহি।
মহামতি ঋষিগণ তব সুখ-আশে
নব প্রাণ দিবে সৃজি নূতন কন্দর্পে।"
কিন্তু রতি পুষ্পমাত্র রহিল অভাগী
নীরব নিরশ্রু দীন ভস্ম ধরি কোলে।
চাহিল বৈকুণ্ঠবাসী ধরাপানে বিষ্ণু।
মুমূর্ষু সুন্দর ধরা টলিছিল শূন্যে
উচ্চরব চারিধারে। যেন ধূম্ররাশি
তমঃ ঘনীভূত ভবে। ভীম ছায়ারূপী
উঠিছে কৃতান্ত বাড়ি' ভীত খণ্ডতলে
মহাতনু প্রকাশিয়া নীরব ভীষণ,
নামিল অনাদি বিষ্ণু হিমস্তব্ধ দেশে।
ঘোষিল অনন্ত শূন্য দেবের স্মরণে,
হিমাচল পদস্পর্শ টলিল নির্ঘোষি।
যোগমগ্ন ব্যোমকেশে সম্বোধিল হরি।
"শিব, একচারী যোগী, নির্জন পর্ব্বতে
আসীন নিঃশ্বাসে সৃজ, নিঃশ্বাসে সংহর
অগণন বিশ্বধ্যানে, সৃষ্টিধ্বংসকারী।
মুহূর্ত্তের প্রাণীহিত ভাব না মহত্বে
অন্ধ। হের, মহাদেব, নয়ন উন্মীলি।
যমাধীন প্রাণী যথা বধিলে মদনে
জগতের মধুপ্রাণ, হবে অবিলম্বে
নিশ্চল এ ব্রহ্মরথ সারথি-বিহনে।
তার তব সৃষ্টি, শম্ভু, বাঁচাও মন্মথে।
নাশে পুনর্জন্ম এই অচল নিয়মে
রহে পুরাতন সৃষ্টি চিরকাল নব
অনন্ত-যৌবনধারী। স্থিরতা নিয়মে।
অস্থির প্রপঞ্চ মধ্যে বিনা লক্ষ্যে ভ্রমি
নিয়ম ধরি* ক্ষুদ্র প্রাণীজাতি।"
শিব একচারী যোগী উত্তর করিল
"জানি ,আমি, দয়াসিন্ধু, অচল নিয়মে
অনন্ত যৌবনে নব পুরাতন সৃষ্টি।

---

* বিকল্প : নিয়মই আছে ধরি

জানি আমি বদ্ধমূল নশ্বর মানবে
অনন্ত পরব্রহ্মের এ মহতী লীলা।
কামবদ্ধ পৃথিবীর। মধুলুব্ধ নরে
কামে কাম জিনি লভে নিষ্কামতা শেষে।
জানি মধুপ্রাণ এই বিশ্বের কন্দর্প।
নিজদোষে, নারায়ণ, বহিল কূলেষু
অসময়ে তীব্র হানি অনুচিত লক্ষ্যে।
তথাপি বাঁচিবে পুনঃ। অসুর, রাক্ষস
নিষ্ঠুর অশাম্য ক্রোধ দীর্ঘকাল পুষে
প্রাণে। বৈর-নির্য্যাতনে, শত্রুপরিতাপে
সীমা আর্য্য-অমর্ষের। কহিনু মদনে,
বিষ্ণু। অবতরি তুমি যশস্বী দ্বাপরে
জন্মাইও লক্ষ্মীগর্ভে আবার কুলেশে।
ততদিন মুক্ত রবি অদৃশ্য অনঙ্গ
বিস্তারিবে পুনঃ জগে মধুর মিলন,
বিবাহের মধুকৃতি পুনঃ মর্ত্যধামে।"
কহিল মহাত্মা। বিশ্বে কাঁপাইল উক্তি।
গেল দয়াসিন্ধু বিষ্ণু অনাদি তিমিরে,
কুপিত বসন্ত মাতা ধূলায় আসীনা
যেথা একাকিনী যোনী অন্ধকার দেশে।
কুন্তলে বুলায়ে হাত উঠাইল বিষ্ণু।
মুক্ত হল অশ্রুরোধ স্পর্শে, কণ্ঠ মুক্ত
করুণ। কাঁদিল রতি পিতার চরণে।
"কেন আসিয়াছ, তাত। বৃথা কি আইনে
সেথা নিতে পুনঃ মোরে, অভাগী অপ্রিয়া
আলোনয় ঘৃণ্য ভবে। যাব না এ জন্মে।
মরিছে কি বিশ্বতাপে দেবেরা। মরুক,
কৃতঘ্ন নির্দ্দয় তারা; স্বদোষে, ভুলিয়া
কি উচিত দেবতার। যাইব না কভু
উদ্ধার করিতে। আমারেও কি করিল
উদ্ধার উহারা? যাব কি প্রবোধে? কোথা
শুভকর্ম্ম-প্রতিফল, কোথা ন্যায্য রীতি,
কোথা এবে দৃঢ় বিধি অজের অটল?
অবিচার অসাধ্যে সেথায় বিরাজে।
সমাধীন প্রাণী যথা বধিল প্রাণেশে
শিব ধ্বংসকারী। দেব-বন তুষিবারে

মরিল করুণরূপে। করে না তাহায়া
উদ্ধার, হেরে না ফিরে একবার চাহি।
নিজ প্রাণ লয়ে গেল কাপুরুষ যত
করুণ শরীর ফেলি। অকালে মরিল
একাকী অবিলাপিত দূরে। হায়! হিমে।
আমিও পুরাণ দেবী, কন্যা তব, পিতা,
তথাপি বিধবা।" এই অর্থে পুষ্পমাতা
বিলাপিল মুক্তকণ্ঠে পাদযুগ ধরি।
নারায়ণ দয়াসিন্ধু উত্তর করিল:
"বাছা, অকারণে কষ্ট দিয়াছে বিধাতা।
তুমি সুখপ্রাণা দেবী, দুঃখ দেয় তোরে
কৃতঘ্ন জগৎ। লেগেছে কোমল প্রাণে
কঠিন আঘাত, দেবী। কুপিত বসিলি
জগৎ ঘৃণিয়া দুঃখে, কে নিন্দিবে তোরে।
বৎস, শ্রেষ্ঠতরে* ক্ষমা, দেবচিহ্ন ক্ষমা।
ক্ষমা-কান্তি নয়নে দেখায় বলবান
দেবসম মর্ত্ত্যে ক্ষমি উদ্ধত দুর্ব্বলে।
অভিমানী মন দম, বসন্তের মাতা।
দ্বিগুণে মধুর সুখ গত দুঃখ স্মরি,
সে সুখের অংশে প্রাণ জুড়াও। হইবে
কন্দর্প-মিলন পুনঃ প্রত্যক্ষ কন্দর্পে।
এস দীপ্তিময় তবে, ফিরে এস, রতি।
বসন্তে জাগাও পুনঃ নির্ব্বসন্ত জগে।"
ফিরিল জননী ভবে। সফল হইল
যুগসম্পূরণে উক্তি পরযুগ-শেষে।
জন্মিল রুক্মিণী-গর্ভে সাক্ষাৎ মদন
কৃষ্ণের ঔরসে যোদ্ধা প্রদ্যুম্ন। জন্মিল
অনিরুদ্ধ রতিগর্ভে বালক সুধন্বী
মধুর মিলন-সুখে কৃষ্ণপৌত্র যোদ্ধা।"

এই অর্থে ভগিনীর সুচারু চরণে
সুপ্তা, মধুময় ধ্যানে সমুজ্জ্বল আঁখি
উর্ব্বশী গাইল। তার হৃদয় জুড়িল।
ভাসাল ভাবের পুরে পুরাণ কাহিনী।

---

* পাঠান্তর: শ্রেষ্ঠ তবে

কৃষ্ণ-কেশভার-সেবা করপদ্ম ভুলি
নিকর্ম্ম। রহিল ভূমে। হেনকালে অগ্নি
স্বর্গলিপি-বহ আনে সুগন্ধ প্রসারি।
উঠিল সত্বরে দেবী ত্রস্তা। কেশজাল
বন্ধচ্যুত পড়ে কাঁধে, শিথিল বসন
শুভ্রকুচযুগে যেন অঙ্গুলি জ্যোৎস্নার
বহুল চম্পকে। সন্তান হঠাৎ যদি ডাকে
জ্ঞান কি আকুল-চিত্তার জননীর প্রাণে।
"আয় নাবি মোরা দৈত্যনগরে, সহজা।
শৈলবালা, প্রিয় হাতের অক্ষর চিনি,
ডাকিতেছে মোরে। প্রাণ অস্থির শঙ্কায়
কি দুঃখে কি ভয়ে মোরে ডাকিল নন্দিনী।
উদ্ধত দৈত্যেরা সদা স্বেচ্ছাপ্রিয় গর্ব্বে,
অত্যাচারী দৈত্যরাজা বাণ মহাবাহু।"
নামিল আকাশ-পথে দেবীদ্বয়। নভে
জ্বলিল রাতুল আভা বিদ্যুৎ-আকৃতি,
অপ্সরার চারু-অঙ্গ ভাসিল অম্বরে।
নবকুল ফুটাইল রাঙা-পদ স্পর্শে
উল্লাসে ধরণী। রম্য শোণিত-নগরে
অকস্মাৎ আলোকিত সে আঁধার কক্ষ
অপার্থিব রূপে। নিল নন্দিনীরে কোলে
চিত্রলেখা। দিব্য হাসি অমর বদনে
পয়োধরে কুলগাল চাপিল জননী।
মাতার পবিত্র স্তনে দুগ্ধধারা বহি
তিতিল কপোল। সুরভি কুন্তল চুমি
কহিল সমুদ্রকন্যা। "কেন, শৈলবালা,
ডাকিলি আমায়। সুখে ভরা আমার
প্রতিদিন দেখি দিব্য চক্ষু খুলে। আজি
হঠাৎ কি দুঃখ তোর, কি অভাব প্রাণে,
শৈলবালা ? কি ন্যূনতা জননীর স্নেহে
রৈল যে অপূর্ণ আশা কন্যার হৃদয়ে।"
মাতৃকণ্ঠ বাঁধি বালা শ্বেতভুজপাশে
মনোহর শির তুলি মাতৃস্তন হতে
কহিল সুস্মিতা। "সেই অতীতের কথা
বলি আজি। বস ঘাটে। বাল্যকালে, মাতঃ
শুইনু যেমতি কোলে, আজিও শুইব।

'চাই পারিজাত-পুষ্প, স্বর্গের সলিল
স্নানে, দেহ মোরে, মাতা, জীবন্ত পুত্তলী,'
এইরূপে পীড়ি তোমা শতবার দিনে
চাইনু অদেয় যত। আজিও চাহিব।
বল হেথা। নাহি দিলে দেখিব প্রভাব,
অপ্সরার গর্ব্ব। বিনা মাতে উর্ব্বশীর
দিব না উঠিতে তোরে। তুমিও হেথায়
বসিও, উর্ব্বশী মাতঃ, সোনার পালঙ্কে।"
কহিল সস্নেহে দেবী, "জান, কুহকিনী,
তব আজ্ঞাবহ দাসী মাতা। এক আশা
অপূর্ণ রইলে প্রাণপুত্তলী-হৃদয়ে
নিষিদ্ধ অমরা-ভূমি মাতৃচরণের,
লুপ্ত পারিজাত মালা অভিশপ্ত শিরে।"

আরম্ভিল শৈলবালা। "বাল্যকালে আমি
তব স্বর্গসম ক্রোড়ে আশ্রিতা পাইনু
চিত্রসিদ্ধি। সহজে পাইনু, শিশু যথা
মাতৃদুগ্ধ স্তনে। আসে আপনি প্রতিভা,
শিশুর নয়ন খুলে, শিশুর অঙ্গুলি
ধরি যত দৃশ্য জগে আঁকার মোহিনী।
স্বয়ং অল্পই পারে বহুল-আয়াসী
মানব, নিস্তেজ গুণ বদ্ধ অনুরোধে।
বিমুক্ত দেবের স্পর্শে কি না পারে প্রাণী।
অধীন হইল মোর যত রম্য মূর্ত্তি
মাধুরী রচিয়া ব্রহ্মা সৃজিলা সুক্ষণে।
স্মরিলে অঙ্গুলিপথে দাঁড়াত আসিয়া
পূর্ণ মূর্ত্ত চিত্রপটে। স্বচ্ছতোয়া নদী,
হংসবালা নাচি স্রোতে, বহিত সম্মুখে।
ক্ষণপ্রভা মেঘকোলে হাসিত সহসা
মোর ক্ষুদ্র গৃহে। মহীয়সী গিরিবালা
দাঁড়াত কল্পনা দ্বারে, নীরব তপস্বী
আসি যেন আশ্রমের দ্বারে—উচ্চশির,
হিমশুভ্র জটাজুট পলিত মস্তকে।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি মন সদা মানবের। উচ্চে
উঠিলে অতৃপ্ত যদিন না উচ্চতরে
আরোহণ। কোলে তব কাঁদিনু পড়িয়া।

"অতৃপ্ত হৃদয়, মাতা, তৃষ্ণাতুর নিতি
পিঞ্জরে যেমতি পাখি বাহিরে হেরিয়া
স্বাধীন সঙ্গীরা ভ্রমে সূর্য্যের আলোকে
কাঁদে ইতস্ততঃ উড়ি। জুড়াও এখনি
প্রাণ মম, মাতা।" সস্নেহে তুলিয়া মোরে
কহিলে ঈষৎ হাসি'। "চারু শৈলবালা,
চিত্রলেখা নামে ডাকে অবতার ভাবি
লোকে, প্রসারিছে কীর্ত্তি। নহে পরিতৃপ্ত
মানব-হৃদয় তব বুকে। জানি মন,
শৈলবালা। অসীম সিন্ধুর ওই পারে
ছুটি মানবের মন আশুসরে সদা।
পৃথিবীর সীমা ত্যজি অনন্তে উদ্ভলি
তারা সম ভ্রমে দিঙ্মণ্ডল মাপিয়া
উড়ি মহাবল পক্ষে। শেষে বাহিরায়
নূর্ত্ত জগতের ধারে যেথা থামে দৃষ্টি,
যেথা ভীম অন্ধকার বিঁধিয়া বিঁধিয়া
মূর্চ্ছিত মনের চক্ষু অবশ তিমিরে।
পৃথিবীর অন্ধকার সেথা হয় দীপ্তি,—
পারহীন লক্ষ্যহীন তলহীন সিন্ধু।
তবে নহে ভীত নর। নিজ তেজে জ্বলি
চলিল অজের আত্মা অসীম আঁধারে।
স্বর্গ সাহস-বিদ্যা-দীক্ষা নিষিদ্ধ মানবে,
বাছা। নহে নিষিদ্ধ সাহস নর-প্রাণে।
সিন্ধু-স্বর্গ-ভূমি আছে অগম্য সমুদ্রে,
অদ্ভুত দেবতা নিত্য সে দারুণ স্থলে
নিবাসী মুদিত সদা। মাথার উপর
ঘোষে অবিশ্রান্ত নাদে ধাবমান সিন্ধু,
কোটি তরঙ্গের ভারে চেপেছে জলধি।
সেথা ক্রুদ্ধ মহোর্ম্মির ভীম কোলাহলে
হরষি নিবাসে একা ভীষণ সমুদ্রে।
উগ্রচণ্ডা জলদেবী সিন্ধুতলে* ধরি
কুবের ঐশ্বর্য্যদর্পে গহ্বরে রহিয়া
সেই ভয়ঙ্কর গর্ভে সন্তান কিনুরে
জন্মাইল পুরাতন যুগে মহাবলী।

* বিকল্প : মহাবলে

ছিল না তখন মাতা শ্যামলা পৃথিবী,
ছিল না নীলিমা নভে। ধাবিত চৌদিকে
অসীম জলধি ঘোষি নিরাকার শূন্যে।
সপ্তসিন্ধু সপ্তদ্বীপে ত্রিদিবে পাতালে
না আছে যাহা না জানে কিন্নর শলভী।
কিন্তু শতবিদ্যা মধ্যে ভালবাসে একা
চিত্রবিদ্যা। জগতের যত রম্য মূর্ত্তি
নিসর্গ-মাধুরী জিনি মনের মাধুর্য্যে
কল্পনা আরোপি সত্যে প্রতিভা-ক্রীড়ায়
রঙ্গে। তার বর বিনা নাই চিত্রে সিদ্ধি,
তার বরলাভে হয় মর্ত্ত্য ইন্দ্রপুরী।
উগ্র অনারাধ্য কিন্তু নুক্কার সে তুমি,
উচ্ছলে অগম্য নাদে ভয়ঙ্কর সিন্ধু
শত-ফেনা তুলি নভে। গহন সমুদ্রে
ভয়পূর্ণ সেই পথ অস্পৃশ্য দুর্ব্বল
মানব চরণে। স্থলে ধরিয়া, নন্দিনী,
অমরের হস্তসিদ্ধি চাহিবে আলেখ্যে,
ভুলিবে না শত স্তুতিজালে অন্যদানে
মুক্তি-মূল্য তার। যখন মধ্যাহ্নে
নীলিমায় মিলাইয়া অবিরাম ঊর্ম্মি
বায়ুহীন নিদ্রা লভে বিশাল সাগরে,
সুস্পষ্ট উজ্জ্বল দেবদর্পে উঠিয়া
অতল সমুদ্র হতে আসীন একাকী
মহাসিন্ধু পানে চাহে সুরম্য সিংহলে।
প্রস্তরে তরঙ্গলীলা চড়ে পড়ে, ডাকি
উঠিছে, পড়িবে ডাকি। সুগম্ভীর নাদে
মহৎ সমুদ্র বহে,—দেবতার গতি,
পদধ্বনি ঘোষাইয়া শিলাতে শিলাতে।
সেথা বসি চিত্র রঙ্গে, অন্তে মহাবেগী
সৌন্দর্য্য ছড়ায়ে ভোবে অতল সলিলে।
গাঁথিয়া মৃণালরজ্জু গঙ্গাতেজ পুনি—
নাই অন্য সূত্রজালে বাঁধিবার শক্তি
বলবান দেবে—সিন্ধুশিলা-অন্তরালে,
মৃগয়ার যথা রীতি উত্তর পর্ব্বতে
সিন্ধুসিংহ-পথ যবে বসেছে রুধিয়া
শূলধর হিমানীর দেশে, উচ্ছ্বসিয়া

মহারোলে উঠে সিংহ, হঠাৎ সবেগে
শূল ফেলি বিঁধে তারে—লুকাও আড়ালে
পাশপাণি। উঠি যবে কিন্নর শলভী
জলধি ত্যজিয়া জল*-ফোয়ারা যেমতি
শৈলে, পাশ অস্ত্র ফেলে, আঁটিল বন্ধন
স্পৃহনীয় প্রতি-অঙ্গে পাকাও, নন্দিনী,
অভিভূত গন্ধতেজে দিবে মহামতি
সর্ব্বস্ব বিদ্যার। দিব্য বলাইয়া শেষে
ছাড়। সাবধান, বালা, বাক্যচ্ছলে ভুলি
বিপদে যেন না পড় কিন্নরের বশে।
দাসী তার রবে হৃতা অতল সমুদ্রে।
অশেষ শঠতা জানে কিন্নর শলভী।"
শিহরিল মহতী আশা হৃদয় উথলি
এ কথায়। মন্ত্রগীতি শুনিনু অম্বরে।
আপনি না বুঝিলাম মধুর গুঞ্জরি
কেন সুখস্বপ্নসম আসিয়াই যায়
অস্পষ্ট কল্পনা ভাসি প্রাণের তিমিরে।
স্বর্গের দুকূলে দেহ আচ্ছাদিয়া মোরে
সনাতন গঙ্গাতীরে আনিলে, জননী।
গাঁথিনু মৃণাল-তন্তু মনোবল পূরি
মাতৃ-শিষ্যাতীরে। সূক্ষ্ম অতিশয় রজ্জু,
দেবের অদৃশ্য যার অমর নয়নে
ভেদ্য তলহীন সিন্ধু যেন ক্ষুদ্র নদী।
শৈলে এ কৌশল পাতি সমুদ্রের তীরে
আড়ালে লুকায়ে দেহ রহিনু বসিয়া
শিহরি আশায় ভরে। যে বেলা পড়িল
অনন্ত সাগরে শ্রান্ত অবিরাম ঊর্ম্মি,
উজ্জ্বল সহসা জল-ফোয়ারা যেমতি
নিদ্রিত জলধি ত্যজি কিন্নর উঠিল
প্রকাশি সৌন্দর্য্যরশ্মি যেন তারা নভে
খসিয়া আলোকটানে আকাশ উজ্জ্বলি।
সৌন্দর্য্য হেরিয়া প্রীতি উথলিল মনে।
প্রজাপতি প্রীয়ে অগণন-বর্ণ-কান্তি
উড়ন্ত কুসুম যথা ধাঁধায় নয়ন

---

* বিকল্প : দীপ্ত

বালক আকৃষ্ট লোভে ধরিতে তাহারে
যায় ধেয়ে সেই ভাবে ধাইল হৃদয়
সে কান্তির পানে। লোভ দমিলাম লোভে।
বসেছে কিন্নর সিন্ধুশিলায়। বিলীন
দৃশ্যে সে বহৎ বুদ্ধি, অলধির নাদে
বিলীন। হেরিনু তার বিশাল দীপিত
অপার্থিব আঁখি অসহনীয় মাধুর্য্যে
পূর্ণ। শিহরিনু ভয়ে, শিহরিনু প্রেমে।
হৃদয়ে ভরিল আসি সাহস দেবতা।
হঠাৎ আনন্দে হাসি কৌশল-গর্ব্বিণী
মন্ত্রপূর্ণ গন্ধাতেজে মহাজাল-রাশি
ফেলিয়া সুচারু অঙ্গে হর্ষে প্রেমে মাতি
পাকাইনু বারবার। ভীত, হাসি' ক্রোধে
টানিল দুর্দ্দাম্য হস্তে উদ্ধার-উদ্যোগী
ধনু। জোরে যদি টানে বলীয়ান বৃথা,
আরও জড়ানু ভয়ে অনংখ্য বন্ধনে।
অবশেষে মধুহাসী কিন্নর পরাস্ত
কহিল, "কে তুই ধন্য, মহামতি বালা,
কোথা হতে বা যশস্বী সাহস শিখিলি
অবলা রমণী হয়ে? কোন জন্মভূমি
গর্ব্বিতা বীর্য্যপীড়িতা প্রসবি সুক্ষণে
এই রূপ জন্মাইল, এ উদার বুদ্ধি।
উচ্চলোভী তব মন জানি, আর্য্যবালা।
অদেয় স্বর্গের বিদ্যা, তবে দিনু তোরে।
পালায় সর্ব্ব নিষেধ সাহস-দর্শনে।
শূন্য শেখর। যায় স্বর্গে সেই পথে।
সাহসে সভয়ে ভক্ত বাঞ্ছিত চরণ,
সাহসে নির্ব্বাণ জ্ঞানী। বিক্রয়-নিয়মে
চিত্রবিদ্যা দিব তোরে, পণ্য যেইরূপ
তত মূল্যে। তুমি মূল্য, স্পৃহনীয় বালা।
এই সুললিত শির, যৌবনের মদ্যে
ভরা দুই পয়োধর, এই শুভ্র দেহ
যেন বহ্নি যন্ত্রে, এই রাতুল চরণ
চাহি, শৈলবালা। ওহে পূর্ণ কর বাঞ্ছা
মহাসুখ লয়ে তোরে তুষ্টি, স্পৃহনীয়া
ললিতা রূপসী বালা, তুষ্টি লয়ে তোরে

প্রেমস্বর্গভোগ কোলে প্রেমঘন-পতি।
দে তুই দুর্লভ প্রেম, চিত্রবিদ্যা দিব।"
গজাতেজে অভিনয় যাতনা ভুগিল
কিন্নর, ছাড়ে না তবে পাঠ্য শঠহৃদি।
বাক্যচ্ছলে ভুলি, অন্ধ কামনার সাধে
অবোধ। খুলিনু রন্ধ্রু আদেশ বিস্মরি।
তৎক্ষণাৎ ধরে উঠি অনিবার্য্য ভুজে
হর্ষে ঘোরে সিন্ধুবাসী কিন্নর হরিল
অতল সবুজে ডুবি। কম্পমান সঙ্গে*

---

* শ্রীঅরবিন্দের এই বাংলা মহাকাব্যটি বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়েছে। আমরা কোন পরিবর্তনের চেষ্টা না করে তার আরম্ভটি এখানে ছাপলাম। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত শ্রীননমোহন ঘোষের একখানি সমালোচনা-পত্রও প্রকাশিত হল। পত্রটি লেখা হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদায় এই লেখাটিতে মগ্ন ছিলেন।

একটি পত্র

Extract from a letter written by Manmohan Ghosh (Sri Aurobindo's brother) to Rabindra Nath Tagore, dated Oct. 24th, 1894. C/o Rajnarayan Bose, Deoghar. Published in Visva-Bharati News, Dec. '68, pp. 153-54.

"Aurobindo is anxious to know what you think of his book of verses* but I have explained to him how busy you are just now, and that you will write later when you have a little more leisure to do justice to his book. I myself think that he is possessed of considerable powers of language and a real literary gift,—but he is lacking in stuff and matter, perhaps in warmth of temperament. But those pieces on Parnell† consisting of fine philosophic reflection, show, I think, that he might do great things. Unfortunately he has directed (or rather misdirected) all his energies to writing Bengali poetry. He is at present engaged on an epic (inspired I believe by Michael Madhusudan) on the subject of Usha and Aniruddha."

(অরবিন্দ জানতে উৎসুক তার কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আপনার কী মত, কিন্তু তাকে বুঝিয়ে বলেছি আপনি আপাতত কতখানি ব্যস্ত, এবং পরে আরও একটু অবসর পেলে তার বইটির উপর সুবিচার করতে পেরে পত্র দেবেন। আমি নিজে মনে করি ভাষার উপর তার অগাধ অধিকার এবং সত্যকার সাহিত্য-প্রতিভা আছে,—তবে অভাব বিষয়বস্তুর, হয়ত স্বভাবে ভাবুকতার উত্তাপের। তবে পার্নেলের ওপর ওই কবিতা ক'টি, মনে হয়, ইঙ্গিত বহন করছে যে ভবিষ্যতে মহৎ কিছু সে করতে পারে। দুঃখের বিষয় সে তার সমস্ত উদ্যম প্রয়োগ (কিংবা অপপ্রয়োগ) করছে বাংলা কবিতা লেখায়। বর্তমানে সে উষা ও অনিরুদ্ধের বিষয় নিয়ে এক মহাকাব্য রচনায় ব্যাপৃত (মনে হয় মাইকেল মধুসূদনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে)।

---

* *Songs to Myrtilla.* First published in Bombay for private circulation : 1894. (Sri Aurobindo: *Collected Poems.* The Centenary Library: Vol. 5, Pp. 1 et seq.)

† Charles Stewart Parnell 1891, and Hic Jacet, Glasnevin Cemetry. (*Collected Poems.* The Centenary Library: Vol. 5, Pp. 15 and 11 respectively.)

শ্রীঅরবিন্দের অপ্রকাশিত মূল বাংলা "সাবিত্রী"

নীরব অরণ্যরাজী, একাকিনী নিশা
বিশাল নিস্তব্ধ প্রাণে শুনিছে নিমগ্ন
অজানা নিভৃত স্বর, অস্ফুট নিঃশ্বাস
অপার্থিব পদধ্বনি, যা বাজে না কভু
সুখলোভী দিবসের ধনার্থী* হৃদয়ে।
বিচরে না ভীমবপু নিশাচর প্রাণী.
জ্বলে না আঁধারে ক্রূর চক্ষু। সুপ্ত তৃণে
নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা শায়িত শার্দুল
পরিতৃপ্ত হিংস্র প্রাণ ভরা রক্তমাংসে।
গভীর সমাধিমগ্ন রজনীর চিত্ত
স্পন্দহীন চিন্তাহীন অনন্ত তিমিরে।
হঠাৎ চমকি দেখে গভীরনয়না
স্বপ্নে যেন জাগরণ অস্পষ্ট আভাস
সুপ্ত চেতনার জড় অচেতন রূপে
লুক্কান নিধির দীপ্তি অন্ধকার ঘরে
জাগিছে বসনপ্রান্তে চির-আচ্ছাদিত
সুস্মিতা ভগিনী উষা। শুয়েছিল ঢাকি
কৃষ্ণকায়া ভগিনীর অঞ্চলে নয়ন
অন্ধকারে ভীত যেন বালিকা মায়ের
অঞ্চলে লুকায়ে অঙ্গ ঘুমায় নিঃশঙ্কে।
ঈষৎ তনু-হিল্লোলে নড়িল এখন
কুসুম নিচয় শুভ্র ছন্দের সঙ্কেত।

---

* অনিশ্চিত পাঠ

অসিত অবগুণ্ঠন ফেলিল চঞ্চলা
অলস অঙ্গুলি ধীরে জাগি অল্পে অল্পে।
রূপসী চিরযৌবনা আনন্দিনী দেবী
গগন উদ্ঘাটী দীপ্তি অমর আঁখির
উন্মেষি উঠিল হাসি আহ্লাদিত বিশ্বে।
চিত্তহারী স্বর্ণহাসি ভাসিল গগন
আনন্দলহরী যেন সোনার তরঙ্গে
বুলায়ে আলোকস্পর্শ হৃদয়ে নয়নে
শুভ্র*-বক্ষ-আভা স্বচ্ছে পবিত্র বিলাসে।
আবরণে অনাবৃত শ্বেত তনুকান্তি
সুসূক্ষ্ম আলোকবস্ত্র বিদরে প্লাবিয়া
নগ্নাঙ্গ রূপচ্ছটায় দেবত্ব প্রকাশি'।
মধুর যামিনী উষা রাতুল অঙ্গুলি
বুলাইল জগতের পাণ্ডুর কপোলে।
চরণবিক্ষেপ তার পতিতে উদ্যত
ধরাধাম দেখি দেবী চাহিয়া পিছনে
সূর্য্যের আশায় ফিরি, চিন্তাশীল গতি
বাহিরিল অমরের সনাতন কর্ম্মে।
চারিদিকে খুলি আঁখি জীবন-হরষে
শুনিছে সহস্র কণ্ঠে প্রভাত-নিক্কণ
আনন্দিত বিশ্ব প্রাণ। জাগিল সাবিত্রী
সুখহীন জাগরণে। কাঁপি দিবাস্পর্শে
আতঙ্ক জাগিল সঙ্গে। বুকে হাত থুই
জানে নাই কেন সেথা পুরাতন
চিরসাথী যেন দুঃখ যে ক্ষতস্থানের
কি অস্ফুট যন্ত্রণায়। স্মৃতি ধারপাল
আসিল তখন খুলি নিদ্রাবৃত প্রাণ
সুপ্ত শতদল সম বিমর্ষ প্রভাতে।
হেরিল অন্তরে শ্বেত প্রস্তর মূরতি
রিক্ত দেবালয়ে মৌনী নির্দ্দয় দেবতা
অপেক্ষা করিছে দুঃখ নীরব হৃদয়ে
দৈনিক নিবেদ্য অশ্রু। বিশ্রান্ত সুন্দর
বিশাল নয়ন তুলি সুস্মিত উষার

---

* অনিশ্চিত পাঠ

নয়নে চাহিল। এই আলোকিত বিশ্ব
বোঝা যেন বুকে তার, দুঃখ তার ঘেরি
শত্রু যেন এ আনন্দ। আনিল প্রভাত
প্রাণেশের মৃত্যুদিন এ স্বর্ণ-ভরঙ্গে।

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—১৭শ সূক্ত

১। সমিধ্যমানঃ প্রথমানু ধর্মা সমক্তুভিরজ্যতে বিশ্ববারঃ।
শোচিকেশো ঘৃতনির্ণিক্‌পাবকঃ সুযজ্ঞো অগ্নির্যজথায় দেবান্ ॥১॥

সম্-ইধ্যমানঃ—সমিধ্যমানঃ—সমিদ্ধ হয়ে
প্রথমা—প্রথম সব
অনু—অনুসারে
ধর্ম—ধর্ম সব
সম্ (+অজ্যতে)—সংযুক্ত হয়
অক্তুভিঃ—রশ্মিদের সঙ্গে
(সম্+) অজ্যতে—সংযুক্ত হয়
বিশ্ববারঃ—বিশ্বের বরেণ্যবস্তু তার মধ্যে
শোচিঃ-কেশঃ—জ্যোতির কেশর তাঁর
ঘৃতনির্ণিক—তাঁর বসন তপ্ততেজ
পাবকঃ—তিনি পাবক, শুদ্ধিকর্তা
সু-যজ্ঞ—সুষ্ঠু তাঁর যজ্ঞক্রিয়া
অগ্নিঃ—অগ্নিদেব
যজথায়—যজ্ঞসাধনের জন্য
দেবান্—দেবতাদের উদ্দেশ্যে

অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছেন আদি ধর্মসকলের অনুসারে তিনি মিলিত হয়েছেন কিরণমালার সঙ্গে, তাঁর মধ্যে রয়েছে যাবতীয় কাম্যবস্তু, জ্যোতির কেশর তাঁর বসন তাঁর তপ্ততেজ, শুদ্ধিদাতা তিনি, সম্যক যজ্ঞসাধক, অগ্নিদেব যজ্ঞ করেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে ॥১॥

২। যথাযজো হোত্রমগ্নে পৃথিব্যা যথা দিবো জাতবেদশ্চিকিদ্বান্।
এবানেন হবিষা যক্ষি দেবান্মনুষ্বদ্যজ্ঞং প্র তিরেমমদ্য ॥২॥

যথা—যেমন
অযজঃ—যজ্ঞ করেছ
হোত্রম্—হোতা হয়ে
অগ্নে—হে অগ্নি
পৃথিব্যাঃ—পৃথিবীর (জন্য)
যথা—যেমন

দিবঃ—স্বর্গের জন্য
জাতবেদঃ—জন্মজ্ঞানী
চিকিত্বান্—জ্ঞানলাভ করেছ
এব—তেমন, সেই রকম
অনেন—এই
হবিষা—আহুতিদানে
যক্ষি—যজ্ঞসাধন কর
দেবান্—দেবতাদের উদ্দেশ্যে
মনুষ্বৎ—মানুষকে নিয়ে
যজ্ঞম্—যজ্ঞকে
প্র+তির—ওপারে নিয়ে চল
ইমম্—এই
অদ্য—আজ

হে অগ্নি, হোতারূপে পৃথিবীর জন্য তুমি যেমন যজ্ঞ করেছ, যেমন স্বর্গের জন্যও করেছ, হে জন্মজ্ঞানী, জ্ঞান তুমি লাভ করেছ, সেইরকম এই আহুতি দিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞসাধন কর, মানুষকে নিয়ে এই যজ্ঞকে পারান্তরে নিয়ে চল ॥৩॥

৩। ত্রীণ্যায়ূংষি তব জাতবেদস্তিস্র আজানীরুষসস্তে অগ্নে।
তাভির্দেবানামবো যক্ষি বিদ্বানথা ভব যজমানায় শং যোঃ ॥৩॥

ত্রীণি—তিনটি
আয়ূংষি—আয়ু, জীবনধারা
তব—তোমার
জাতবেদঃ—জন্মজ্ঞানী, যা কিছু জন্মেছে তাদের জানে যে
তিস্রঃ—তিনটি
আজানীঃ—জন্মস্থান, তোমাকে জন্ম দিয়েছে যারা, জন্মদাত্রী
উষসঃ—উষা
তে—তোমার
অগ্নে—হে অগ্নি
তাভিঃ—এদের সহায়ে
দেবানাম্—দেবতাদের
অবঃ—অভয় (উদ্দেশ্যে)
যক্ষি—যজ্ঞ কর
বিদ্বান্—জ্ঞানী তুমি
অথ—তাই, সুতরাং
ভব—হয়ে ওঠ
যজমানায়—যজ্ঞকারকের জন্য, যাজকের জন্য

শম্—শান্তি
যোঃ—প্রবেগ, গতিধারা

তিনটি হল জীবনধারা, তিনটি ঊষা যারা জন্মদাত্রী তোমার, হে অগ্নি ; তাদের সহায়ে তুমি যজ্ঞ করে নিয়ে এস দেবতাদের অভয়, জ্ঞানী তুমি, তাই যজ্ঞকর্তার জন্য হয়ে ওঠ শান্তি আর গতিবেগ ॥৩॥

৪। অগ্নিং সুদীতিং সুদৃশং গৃণন্তো নমস্যামস্ত্বেড্যং জাতবেদঃ।
ত্বাং দূতমরতিং হব্যবাহং দেবা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্ ॥৪॥

অগ্নিম্—অগ্নিকে
সুদীতিম্—পূর্ণজ্যোতি
সু-দৃশম্—পূর্ণদৃষ্টি
গৃণন্তঃ—স্তোতারা, স্তোতৃবর্গ
নমস্যামঃ—আমরা তোমাকে প্রণতি করি
ত্বা—তোমাকে
ঈড্যম্—পূজনীয়, পূজার্হ
জাতবেদঃ—হে জাতবেদ, হে জন্মজ্ঞানী
ত্বাম্—তোমাকে
দূতম্—দূত
অরতিম্—পথিক, পথযাত্রী
হব্য-বাহম্—আহুতিবহ
দেবাঃ—দেবতারা
অকৃণ্বন্—করেছে
অমৃতস্য—অমৃতত্বের
নাভিম্—নাভিকেন্দ্র

পূর্ণজ্যোতি, পূর্ণদৃষ্টি বরণীয় অগ্নিকে আমরা স্তুতি করি, আমাদের প্রণতি জানাই তোমাকে, হে জন্মজ্ঞানী ; দেবতারা তোমাকেই করেছে তাদের দূত, পথযাত্রী, আহুতি-বাহক, আর অমৃতত্বের নাভিকেন্দ্র ॥৪॥

৫। যজ্ঞহোতা পূর্বো অগ্নে যজীয়ান্বিতা চ সত্তা স্বধয়া চ শংভূঃ।
তস্যানু ধর্ম প্র যজা চিকিদ্বোঽথা নো ধা অধ্বরং দেববীতৌ ॥৫॥

যঃ—যে
ত্বৎ—তোমাকে
হোতা—হোতা
পূর্বঃ—তোমার পূর্বে
অগ্নে—হে অগ্নি
যজীয়ান্—সমর্থ যজ্ঞকারী

দ্বিতা—যে দ্বিরূপ, দ্বৈত
চ—আর
সত্তা—সত্তা
স্বধয়া—আপন ধর্মে, স্বধর্মে
শম্-ভুঃ—আনন্দস্রষ্টা
তস্য—তার
অনু—অনুসারে
ধর্ম—ধর্ম
প্র + যজ—যজ্ঞ করে চল
চিকিত্বঃ—জ্ঞানময় তুমি, চেতনাময় তুমি
অথ—সুতরাং
নঃ—আমাদের
ধাঃ—প্রতিষ্ঠিত কর
অধ্বরম্—যজ্ঞযাত্রা
দেব-ধীতৌ—দেবতাদের আগমনে

হে অগ্নি, যজ্ঞসমর্থ যে আহুতা ছিল তোমার পূর্বে দ্বৈত তার সত্তা, আপন স্বধর্মে আনন্দস্রষ্টা সে, তার ধর্ম অনুসরণ করে যজ্ঞ করে যাও তুমি, চিন্ময় তুমি, আমাদের এই যজ্ঞযাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত কর দেবতাদের আগমনী অনুষ্ঠানে ॥৫॥

মায়ের আলাপ

(Les Bases du Yoga pp. 95-112, ed. Ashram)

২ মার্চ ১৯৫৫

প্রশ্ন : মা, "খাঁটি মনোভাব" এবং "সত্যিকারের চেতনা" কি, যে অবস্থায় আমাদের খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা উচিত ?

শ্রীমা : ও হল উৎসর্গের মনোভাব...

অন্য আর একটা তুমি কি বললে ?

প্রশ্ন : সত্যিকারের চেতনা।

শ্রীমা ইঁ্যা, ওই একই জিনিস। চেতনা একমাত্র ভগবানের দিকে একমুখী হয়ে থাকবে। কেবল দিব্য-উপলব্ধি ছাড়া অন্য কিছুই চাইবে না। আর সঠিক মনোভাব হল ভগবানের কাছে আত্ম-উৎসর্গের মনোভাব। সে কেবল চাইবে আমূল পরিবর্তন, দিব্য রূপান্তর, অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ ও হল এমন বস্তু, যা, তার হৃদয়-আকাঙ্ক্ষা (aspiration) যদি পূর্ণ হয়, তার দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত কোন লাভের চেষ্টা করে না।

এমনটা সর্বদাই ঘটে যে, মানুষের অন্তরে যেই একটা আকুতির ভাব জাগল, হয়ত সেটা খুবই অকপট, খুবই স্বতঃস্ফূর্ত, তৎক্ষণাৎ তার মনটি এবং তার প্রাণটি সেখানে হাজির হবেই। দুর্বৃত্তরা যে ভাবে দরজার পাশে ওৎ পেতে অপেক্ষা করে, ঠিক সেই ভাবে তারা থাকে, আর তখন ঊর্ধ্বের কোন শক্তি যদি তার আশ্পৃহায় সাড়া দেয় অমনি সঙ্গে সঙ্গে এরা নিজেদের সুযোগ সুবিধার জন্যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই সে রকম অবস্থায় অত্যন্ত বিচক্ষণ ভাবে, বিশেষ করে সাবধান হওয়া দরকার। খুবই সাবধান হওয়া দরকার। কারণ তোমার আশ্পৃহা হয়ত খুবই অকপট, তোমার ডাক হয়ত খুবই স্বতঃস্ফূর্ত, খুবই ঐকান্তিক এবং একেবারে বিশুদ্ধ, কিন্তু যেই তোমার ডাকে সাড়া পাও, ওই দুর্বৃত্তটি সেখানে অপেক্ষায় থাকে। দিব্যবস্তু যা কিছুই আসে তা তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দখল করতে চেষ্টা করে। যা ঊর্ধ্ব থেকে আসে তা যতি অপূর্ব বস্তু, কিন্তু এরা তাকে তৎক্ষণাৎ বিকৃত করে ফেলে, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগায়, নিজেদের যত কামনা বাসনা আর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে লেগে যায়, এবং এইভাবে সব কিছু পণ্ড করে ফেলে। আর তার দরুণ তারা যে কেবল সব কিছুই নষ্ট করে দেয় তাই নয়, উপলব্ধির অবস্থাটি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। তাই যদি বিশেষ ভাবে সতর্ক না হও, তাহলে ওইখানেই শেষ, চোরাবালিতে পা ঢুকে যাবে, এগুতে আর পারবে না। তবে তোমার উপর যদি ভগবানের বিশেষ করুণা থাকে, তাহলে যেই তিনি অমনটা দেখতে পান, তৎক্ষণাৎ তোমাকে একটি প্রচণ্ড আঘাত দেবেন, যাতে তুমি যথার্থ সত্য সম্বন্ধে অবহিত হও, নিজের সত্যিকারের বোধশক্তি ফিরে পাও। আঘাতটি তোমার মাথায়, পেটে, হৃৎকেন্দ্রে বা দেহের যে কোন অংশে একটি মোক্ষম আঘাত দেবে, যাতে আচম্বকা তুমি বলে উঠবে, "নাঃ এভাবে আর চলবে না।"

যাক, আর কোন প্রশ্ন ?

প্রশ্ন : মা, "ঘুম ক্রমে ক্রমে যৌগিক-নিদ্রায় পরিণত হবে", এটা কি ?

শ্রীমা আঃ। যৌগিক-নিদ্রা মানে, অসাড়ে অচেতন ভাবের ঘুম নয়।

ও হল এমন এক রকমের নিদ্রা—যদি তাকে নিদ্রাই বল—যা সচেতন অবস্থায় নিদ্রা। দেহটি তখন সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় থাকে। স্নায়ু পেশী প্রভৃতি সব কিছু একেবারে শিথিল থাকবে, একটুও আড়ষ্ট না হয়ে দেহটিকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করবে। কিন্তু ভিতরকার সত্তাটি তখন থাকবে খুবই সচেতন। এতখানি সচেতন যে সে তোমার প্রাণটিকে এবং তোমার মনটিকে বিশ্রামের অবস্থায় রাখবে। এইভাবে সব কিছুই তখন বেশ শান্তিপূর্ণ, প্রশান্ত, অচঞ্চল অবস্থায় থাকবে। তোমার চেতনাটি তখন সম্পূর্ণ মুক্ত। সে যদি তখন বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করে ত বিশ্রাম করবে, নইলে যদি কাজ করা দরকার মনে করে ত তাই করবে। যেটাই করুক, সে তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যেটা খুশি, যেমন ভাবে খুশি করতে পারে, যে রাজ্যে খুশি যেতে পারে। কিন্তু যে অংশগুলো বাহ্যসত্তার এলাকাভুক্ত, অর্থাৎ মন প্রাণ এবং দেহ, তখন সম্পূর্ণ নিদ্রামগ্ন, এবং এমন এক রকমের স্থির অচঞ্চল অবস্থায় থাকে, যার দরুণ বিশ্রামের জন্যে আর যত বেশী সময়ের দরকার হয় না। দেহটিকে এই রকম বিশ্রামের অবস্থায় রাখতে পারলে ঘুমের সময়কে অনেকখানি কমিয়ে ফেলতে পারা যায়। তবে সেজন্যে রীতিমতো অভ্যাস করতে হবে এবং খুবই সচেতন ভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, খুবই সচেতন ভাবে এবং লেগে পড়ে থেকে করা চাই। এমন অবস্থা রাতারাতি আয়ত্ত করা যায় না। এর জন্যে হয়ত কয়েক বছর ধরে নিয়ম সংযম মেনে চলতে হতে পারে...তবে একবার যদি আয়ত্ত করতে পার, তার মানেই তুমি ঘুমকে নিজের মুঠোর মধ্যে আনতে পেরেছ। আর তখন থেকে তুমি অনায়াসে...(যেমন ধর, অনেকে আছে যারা শুতে যাবার সময় বেশ সুন্দর চেতনার অবস্থায় থাকে, কিন্তু পরের দিন সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, আগের দিন যা কিছু লাভ করেছিল সবই তখন হারিয়ে ফেলেছে। এর কারণ তাদের ঘুম মোটেই সচেতন নয়। তারা ঘুমের মধ্যে প্রাণজগতে বা মনের রাজ্যে অথবা সূক্ষ্মদেহের রাজ্যে বিচরণ করতে বেরিয়ে চলে যায় এবং যত অবাঞ্ছিত জায়গায় গিয়ে পড়ে, নয়ত বা সম্পূর্ণ অসাড় অচেতন অবস্থার মধ্যে ডুবে যায়। আর একবার সেখানে গেলে, যা কিছু লাভ করেছিল সে সবই হারিয়ে ফেলে...) তাই নিদ্রাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারা অত্যন্ত দরকার। কিন্তু তাই বলে ব্যাপারটা বড় সহজলভ্য নয়। জীবনে যে সব কাজ করা সবচেয়ে কঠিন, এ হল সে সবের একটি, কিন্তু অত্যন্ত উপকারী। কেবল যে খুব ভাল করে জানে তেমন কারুর নির্দেশ মেনে চলা চাই, তা না হলে কোন লাভ হবে না। কারণ কি পদ্ধতিতে চলতে হবে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তা না জানলে অনেক রকম বোকামী করার সম্ভাবনা থাকে।

সে যাই হোক, নির্ঝঞ্ঝাটে তোমরা যেটি করতে পার তা হচ্ছে, ঘুমোবার আগে খানিকটা অন্তর্মুখী হবে, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যত টানটান আড়ষ্ট ভাবগুলোকে আলগা করে দেবে। চেষ্টা করবে যাতে দেহটি বিছানার উপর নরম একটুকরো কাপড়ের মতন আলতোভাবে পড়ে থাকে, যেন কোন রকম কোঁচকানো দোমড়ানো ভাবে না থাকে। নিজেকে সম্পূর্ণ ঢিলে করে দেবে, ওই যে বললাম, দেহটি যেন একটুকরো নরম কাপড়ের মতো হয়ে ওঠে। এরপর প্রাণটিকে শান্ত করবে, যতদূর পার শান্ত করবে, যতখানি স্থির

নিশ্চল শান্তিপূর্ণ করতে পার তা করবে। তারপর মনটিকেও চেষ্টা করবে এই ভাবে, দেখবে সে যেন কোন ভাবনা চিন্তার কাজ না করে। মস্তিষ্কের উপর যদি সম্ভব হয়, বিরাট শান্তি স্থির নীরবতা এবং শক্তিকে স্থাপন করবে, নানা রকম ভাব বা ধারণা নিয়ে জাল বুনবে না, কোন রকম চেষ্টা করবে না, একেবারে কোন কিচ্ছু না। মস্তিষ্কের সকল গতিবৃত্তিকে আলগা করে দেবে, কিন্তু যতদূর সম্ভব গভীর শান্তি এবং নীরবতার মাঝে তা করতে হবে।

একবার এই গুলিকে ভাল করে অভ্যাস করতে পারলে, তখন নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে খানিকটা প্রার্থনা বা অন্তরের আকূতি জানাতে পার, প্রার্থনা করতে পার যাতে চেতনা লাভ হয়, শান্তি লাভ হয়, যাতে তোমার ঘুমের মধ্যে সকল বিরোধী শক্তির আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে পার, যাতে শান্তভাবে অতীপ্সাপরায়ণ হয়ে একনিবিষ্ট থাকতে পার, তোমার ঘুমন্ত অবস্থায় দিব্যকরুণা যাতে তোমার উপর দৃষ্টি রাখেন, এই সব প্রার্থনা করতে করতে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। এই হল সব চেয়ে ভাল অবস্থায় ঘুমবার উপায়। এর পরে যা ঘটে সেটা তোমার অন্তরের যত আবেগের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যা যা বললাম সেগুলি যদি নিয়মিত ভাবে লেগে পড়ে থেকে রাতের পর রাত করে চলতে পার, তাহলে কিছুকাল পরে এর ফল ফলতে আরম্ভ করবে।

সাধারণত মানুষ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েই যত শীঘ্র পারে ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করে, ব্যস, তার বেশী আর কিছুই নয়। কি ভাবে ঘুমবার চেষ্টা করতে হবে সে সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। কিন্তু আমি তোমাদের এই মাত্র যা বললাম তা যদি রোজ নিয়মিত ভাবে করে চলতে পার, ফল নিশ্চয়ই পাবে। অন্তত রাত্রে ঘুমের মধ্যে যে আক্রমণগুলো হয়, সে সবের হাত অনায়াসে এড়াতে পারবে। প্রায়ই লোকে বেশ ভালভাবে ঘুমতে যায়, কিন্তু ঘুম থেকে জেগে ওঠে অসুস্থ হয়ে। সত্যিই এ একেবারেই শোচনীয় ব্যাপার। এর মানেই হল, মানুষটা রাত্রে একেবারে নড়ার মতন ঘুমতে ঘুমতে সেই অবস্থায় কোথাও হয়ত সংক্রমিত হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন : মানুষ যে সব স্বপ্ন দেখে সেগুলো মনে রাখা দরকার, নয় কি?

শ্রীমা : তেমন খুব নয়। তবে কেউ যদি ঘুমকে ভাল করে আয়ত্তের মধ্যে আনতে চায় তাহলে ওটা কাজে লাগে। কিন্তু তার জন্যেও, কি ভাবে মনে রাখতে হয় তা জানা চাই। স্বপ্নকে মনে রাখার সময় হল ভোর বেলা। আর এতক্ষণ ধরে যে বিষয়ে আমি বলছি সেটার সময় রাত্রিবেলা। সকালে যখন ঘুম ভাঙে, তখন যেন তাড়াহুড়ো কোর না, অর্থাৎ ঘুম ভাঙা মাত্রই যেন বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে যেও না। কিছুটা সময় নেবে, আর খুব সাবধান হবে। ঘুমবার আগে মনে মনে একটি সংকল্প করে শোবে, আর ঘুম ভাঙার সময় খুব সাবধান থাকবে, যেন আচমকা ঠেলে উঠে পড়ো না। কারণ তা যদি কর, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমার স্বপ্নের স্মৃতি হারিয়ে যাবে। বালিশের উপর মাথাটি যেন একেবারে স্থির হয়ে থাকে, একটুও নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে শুয়ে থাকবে, যতক্ষণ না যে চেতনাটি অন্তর্ধান করেছে তাকে আবার খুব শান্তভাবে ফিরিয়ে আনতে পারছ, ঠিক যে ভাবে কেউ একটা জিনিসকে খুব সন্তর্পণে, কোনরকম হ্যাঁচকাটান না দিয়ে, কোন রকম তাড়াহুড়ো না করে বেশ মনঃসংযোগ করে সাবধানে টেনে নিয়ে আসে, সেইভাবে। এরপর যে চেতনাটি

চলে গিয়েছিল সেটি যে পরিমাণে আবার ফিরে তোমার মধ্যে এসে প্রবেশ করে ততক্ষণ যদি সমানে শান্ত নিশ্চল অবস্থায় থাকতে পার এবং নানা রকম আজেবাজে চিন্তা না কর, তাহলে প্রথম স্বপ্নের ছাপটা ফিরে আসবে। তারপর আসবে তার স্মৃতিটা, কখন কখন আসবে স্মৃতির টুকরো টুকরো অংশগুলো। কিন্তু যদি সারাক্ষণ একই ভাবে, নড়াচড়া না করে শুধু গ্রহণ করতে পারার অবস্থায় থাকতে পার, তাহলে সেটি ক্রমে ক্রমে সচেতন স্মৃতিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু এমনটা যাতে হয় তার জন্যে সময় লাগবে। যদি তাড়াতাড়ি করবার এতটুকু ভাব থাকে তাহলেই সব মাটি, তখন আর কিছুই করতে পারবে না। এমন কি ঘুম ভাঙার সময় মনে মনে একটিবার ভাববে না পর্যন্ত, "কটা বাজল?" তাহলেই গেল, ওটি যদি করেছ সব অন্তর্ধান করবে।

প্রশ্ন : কিন্তু না, নড়াচড়া না করলে যে আবার ঘুমিয়ে পড়ব! (সকলের হাস্য)

শ্রীমা : তেমনটা হতে পারে দুটো কারণে : হয় তোমার ঘুম যথেষ্ট হয় নি, তাই আবার ঘুমনো দরকার, আর নয়ত তুমি একটু বেশী রকমের তামসিক প্রকৃতির মানুষ, তাই অচেতনার মধ্যে থাকতে ভালবাস।

যাক, তাহলে এই শেষ, আর কোন জিজ্ঞাস্য নেই ত?

প্রশ্ন : মা, অন্তরের প্রচেষ্টা প্রায়ই বাইরে কাজকর্মে বিক্ষিপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীমা অর্থাৎ যখন বাইরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাক, তখন একাগ্রতা রাখার কথা বলছ? ...সেটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার হওয়া উচিত নয়। সত্যিই তা হওয়া উচিত নয়। আমার কাছে ত অন্তরের চেতনার তীব্রতাকে বজায় না রাখাটাই শক্ত ব্যাপার, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াটাই অসম্ভব বলে বোধহয়। একবার যদি নিজের মধ্যে সেটাকে ধরতে পেরে থাক,, তা হলে কি করে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পার? যদি একবার সেটা পেয়ে থাক, যদি এই চেতনা আর চৈত্যপুরুষের সঙ্গে অন্তরের এই ঐক্য তোমার জীবনের বাস্তব সত্য হয়ে উঠে থাকে, এই চেতনা, অন্তরের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই শিক্ষা—যা সর্বক্ষণ প্রজ্বলন্ত রয়েছে, তার সঙ্গে সংযোগ কি করে ছিন্ন করতে পার? যা কিছুই তুমি কর না কেন, এ কখন নিভে যেতে পারে না, এ হল চির-অনির্বাণ।

আমার ত মনে হয়, একবার এই অবস্থা লাভ করার পর এর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে গেলে, একটা দরজাই বন্ধ করে দিতে হবে, স্বেচ্ছায়, এই ভাবে বড়াস করে তার মুখের উপর বন্ধ করে দিয়ে বলতে হবে, "আমি আর ও সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।" কিন্তু সত্যিই যদি কারুর আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, যে এই দিব্য-সংযোগ বজায় থাকুক তাহলে আমার ত মনে হয় না সেটা খুব শক্ত ব্যাপার। বরং আমার মনে হয়, তার দিকে পিঠ ফেরাতে গেলেই সত্যিকারের একটা সংকল্প করতে হবে, যাতে সেটা চলে যায়। তা না হলে, সেটা ত রয়েইছে, সকল বস্তুর সব কিছুর পিছনে, অনুক্ষণ সে সংযোগ রয়েছে। অপরপক্ষে, কেউ যদি অভ্যাস করে থাকে, যখন তাকে কিছু একটা বলতে হবে, একটা কোন কাজ করতে হবে, সামান্য কিছুও যদি হয়, যে কোন বিষয়েই তা হোক, সর্বদা ওইখানে নিবেদন করে ওই বস্তুটির কাছে উৎসর্গ করে, ওই বস্তুটি পিছনে না থাকলে, কোন কিছুই তুমি করতে

পারবে না বলে যদি অনুভব কর, পিছনে থেকে ওটিই তোমাকে বলে, "হ্যাঁ, এইভাবে কর, ও ভাবে নয়। এটা কর, ওটা নয়।" এমনটা না হলে তোমার পক্ষে ত জীবন-ধারণ করাই কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠবে।

অবশ্য এমন লোকও আছে যারা ইচ্ছা করে সজোরে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়, কারণ তা না হলে, তারা বড়ই অস্বস্তি বোধ করে, তারা নিজেদের কামনার বেগকে সংযত করতে বাধ্য হয়, যেটা তারা মোটেই চায় না। তারা চায় অবাধ মুক্তি আর স্বাধীনতা (অবশ্য তাদের মতে যেটা স্বাধীনতা)। স্বভাবতই একবার অমনটা করলে ত বন্ধ হয়ে যাবেই, আর তখন মানুষটা যে কি পরিমাণে বহির্মুখী, দুর্বল ক্ষুব্ধ, অজ্ঞ এবং আহাম্মুক হয়ে দাঁড়ায় তা আর বলবার নয়। অমনটা মানুষ কি করে সহ্য করতে পারে? আমার ত মনে হয়, তৎক্ষণাৎ সে তার সহজাত প্রবৃত্তির বশে এক পা পিছিয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি ভিতরকার দরজাটা খুলে দেবে, আর তার অন্তরতম সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বলবে, "না, না, কিছুতেই না, এমন অবস্থা নয়, এমন ভয়াবহ অজ্ঞানময় অবস্থা আমি চাই না।" সে অবস্থায় তুমি জানই না, কি বলতে হবে, আর কি বলতে হবে না, কি করতে হবে, আর কি করতে হবে না, কোথায় যেতে হবে, আর কোথায় যেতে হবে না, কোন কিছুই না। মানুষ সেখানে প্রগাঢ় অন্ধকারময় অসংলগ্ন অবস্থার মধ্যে ডুবে আছে তেমন অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ। কিন্তু দরজা যখন খোলা থাকে, আর ওই বস্তু পিছনে থাকে, তখন প্রতিমুহূর্তেই সব কিছু বড়ই আরামদায়ক হয়ে ওঠে। যেন এক বিরাট জ্যোতির বিরাট চেতনার গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে আছ, ঠিক এই ভাবে..."আঃ। এইবার ঠিক ঠিক হয়েছে, এই রকমটাই ত বলতে হবে, এই রকমটাই ত করতে হবে, এই কাজটাই ত করতে হবে," ইত্যাদি। তখন মানুষ খুব আরাম বোধ করে, ধীর, স্থির, শান্ত, নিরুদ্বেগ, কোন ঝঞ্ঝাট নেই কোন উৎকণ্ঠা নেই। তখন তার যেটা প্রাণ চায় সেটাই করতে পারে, লোকেরা তাকে ভাল মন্দ যে ভাবেই নিক, তাতে তার কিছুই যায় আসে না, সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু তার নিজের দিক দিয়ে ওটাই ঠিক।

আর মনে রেখো, আমি যে তোমাদের এসব কথা বলছি, তার কারণ, আমি তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরকার দরজা যাতে খুলে যায়, সে জন্যে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছি। আর তোমাদের দিক থেকে যদি একটুখানিও...অতি সামান্য একটুও অন্তরের দিকে একাগ্রতার ভাব বজায় রেখে চল, তাহলে তোমাদের আর সুদীর্ঘকাল ধরে ওই বন্ধ দরজার সামনে বসে বসে কষ্ট পেতে হবে না, ভাবতে হবে না, দরজা খুলছে না, চাবিও তোমাদের কাছে নেই, কি করে খুলতে হয় তাও জানা নেই। কোন কোন সময় ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সেই দরজার কপাল ঠেকিয়ে বসে কাটাতে হয়। কখন বা দিনের পর দিন, কখন বা মাসের পর মাস, কখন আবার বছরের পর বছর কেটে যায়, অথচ তখনও জান না কি করে খুলতে হবে।

তোমাদের বেলায়, বাছাধনরা ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়।

দরজা তোমদের জন্যে খোলাই রয়েছে, কেবল সেই দিকে চোখ খুলে দেখতে হবে, তার দিকে পিঠ ফেরালে চলবে না।

যাক, এই শেষ তাহলে?

প্রশ্ন না, "নিম্ন প্রাণের ভুল" এটা কি ?

শ্রীমা ওর মানে আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় ?

যত রকমের বাসনা কামনা, আবেগ উত্তেজনা, অহঙ্কারময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞান-প্রসূত কাজকর্ম, বেওলো উদ্ভট প্রচণ্ড, এক কথায় মানুষ প্রতিদিন বেশীর ভাগ এই সবই ত করছে। এই হল নিম্নপ্রাণের ভুল। তার সব কিছুই চাই নিজের জন্যে। সমগ্র জীবনেরওপরই হতে চায় সর্বময় কর্তা, সব কিছু সে-ই শাসন করতে চায়, আবার মন যখন এসে তার দুষ্কর্মে সহযোগিতা করে, এক-শ'র মধ্যে সাড়ে-নিরেনব্বুই বারই তেমনটা ঘটে থাকে—মন তখন বলে, "একেই ত বলে সত্যিকারের জীবন ! এ হল নিজের মতন করে বেঁচে থাকার অধিকার"—অর্থাৎ একটি অজ্ঞ এবং মূঢ় পশুর জীবন যাপন করার অধিকার।

প্রশ্ন : ঘুম জিনিসটা সত্যিই কি ? ও কি শুধু দেহের বিশ্রামের জন্যেই দরকার, না-কি অন্য কিছু ?

শ্রীমা ঘুম খুবই কার্যকরী উপায় হতে পারে, যদি কেউ একাগ্রতা অর্জন করতে এবং অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করতে উৎসাহী হয়। স্কুলে গিয়ে মানুষ যেমন লেখাপড়া শেখে তেমনি ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করে কি ভাবে পাঠ নিতে হয় তা জানলে, ভিতরকার সত্তা বাহ্য দেহ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে স্বয়ং সচেতন হতে পারবে এবং তার নিজস্ব জীবনের কর্তা হতে পারবে। সত্তার মধ্যে এমন অনেক অংশ আছে যাদের নিজস্ব জীবন পুরোপুরি স্বাধীন ভাবে যাপন করবার জন্যে বাহ্য সত্তার অর্থাৎ এই দেহটির, ওই ভাবে নিদ্রার মধ্যে স্থির নিশ্চল এবং অর্ধসচেতন অবস্থায় থাকা দরকার।

কিন্তু লোকেরা তা জানে না। তারা ঘুমতে হয় তাই ঘুমায়, ঠিক যেমন তারা এক রকম সহজাত প্রবৃত্তির বশে, অর্ধসচেতন আবেগ উত্তেজনার প্রভাবে খায়দায় বেঁচে বর্তে থাকে। কোনদিন তাদের মনে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জাগে না। তুমি এখন প্রশ্নটা করলে, "মানুষ ঘুমোয় কেন ?" কিন্তু জগতে ত কোটি কোটি মানুষ রয়েছে, তারা রোজ ঘুমোচ্ছে, কিন্তু কোন দিন তাদের মনে ত এ প্রশ্নটা জাগে না, মানুষ ঘুমোয় কেন। তাদের ঘুম পায় তাই ঘুমোয়, খিদে পায় তাই খায়, সহজাত প্রবৃত্তি তাদের তাড়না দেয় তাই তারা দুষ্কর্ম করে, কখন ভেবে দেখে না, বিচার বিবেচনা করে না। কিন্তু যারা জানে, তাদের কাছে ঘুম হল একটা শিক্ষা-কেন্দ্র। জাগ্রত অবস্থায় মানুষ দিনের স্কুলে যা কিছু শেখে, তাছাড়া অন্য আরো সব জিনিস শেখার জন্যে ঘুম হল একটি উৎকৃষ্ট স্কুল।

এ হল আর এক রকমের স্কুল, আর এক রকমের ফললাভ করবার জন্যে। কিন্তু সত্যিসত্যিই এটা স্কুল। জীবনে মানুষ যদি সবচেয়ে বেশী উন্নতি লাভ করতে চায়, তাহলে সে যে ভাবে তার দিনগুলিকে কাজে লাগায় সেইভাবে তাকে তার রাতগুলিকেও কাজে লাগাতে শিখতে হবে। তবে সাধারণত লোকেরা জানেই না, কি ভাবে তা করতে হয়। তাই তারা না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে চেষ্টা করে, আর তার ফলে যেটা লাভ করে তা হল, দেহের এবং প্রাণের সাম্য অবস্থা হারিয়ে ফেলে এবং কোন কোন সময় তাদের মনের পর্যন্ত বিকার ঘটে।

কিন্তু মানুষের এই স্থূল দেহটির এবং তার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্পূর্ণ বিশ্রামের

দরকার। তবে সে বিশ্রাম মানে, অচেতনার মধ্যে নেমে যাওয়া নয়—এটিই হচ্ছে একটি প্রাথমিক শর্ত। তাছাড়া প্রাণটিকেও শান্তভাবে বিশ্রামের অবস্থায় রাখা চাই। এইভাবে যদি তোমার এই তিনটি অংশকেই বিশ্রাম করাতে পার, তাহলে ভিতরকার সত্তা, যার সঙ্গে বাহ্যজীবনের প্রায় কোন সম্বন্ধই নেই—কারণ অন্তরের জীবনের অভিব্যক্তির পক্ষে বাহ্যজীবনটা বড় বেশী কলকোলাহলময় এবং অতিমাত্রায় অচেতন—তাই বাহ্যসত্তা নিদ্রামগ্ন থাকলে ভিতরকার সত্তা নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে জেগে উঠতে পারবে এবং সক্রিয় হয়ে নিচের অংশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এবং তাদের সঙ্গে একটি সচেতন সংযোগসূত্র গড়ে তুলতে পারবে। ঘুমের আসল কারণই হল এই, যদিও প্রয়োজনের দিক দিয়ে দেখলে, জীবনের বর্তমান অবস্থার দরুণ, কাজকর্মের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর কাজকর্ম এইভাবে একটার পর একটা হওয়া চাই।

দেহের বিশ্রাম অবশ্যই চাই। কিন্তু যে কথা আগে বললাম, খুব কম লোকেই ঠিক-মতো ঘুমোতে জানে। তারা এমন এমন অবস্থায় ঘুমোয় যে যখন জেগে ওঠে, তখন মোটেই ভাল করে বিশ্রাম হয়েছে বলে বোধহয় না বরং বোধ হয় যেন খুবই অশান্তিতে ঘুমিয়েছিল। সুখনিদ্রা লাভ করা হয় একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার এবং তা শিক্ষা সাপেক্ষ।

প্রশ্ন : মা, আমাদের দেহের সঞ্চয় কিসের উপর নির্ভর করে?

শ্রীমা দেহের সঞ্চয়? অর্থাৎ তুমি কি জানতে চাইছ? জীবনীশক্তি সঞ্চয়ের কথা?

প্রশ্ন : আজ্ঞে হাঁ!

শ্রীমা : সেটা নির্ভর করে বিশ্ব-প্রাণশক্তিকে গ্রহণ করতে পারার সামর্থ্যের উপর। কারণ যথার্থ খাদ্যবস্তুর ভিতর থেকেও মানুষ এই প্রাণশক্তিকেই সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু তা হল নিচের দিক থেকে সংগ্রহ করা। তবে সঞ্চয় করে রাখতে হলে প্রথমে শিখতে হবে কি ভাবে বিশ্ব-প্রাণশক্তিকে অবিরতধারে গ্রহণ করতে পারা যায়, আর তারপর সত্তার মধ্যে বেশ খানিকটা সাম্য অবস্থা গড়ে ওঠা চাই যাতে করে, তোমার সঞ্চয় যতটা তার চেয়ে বেশী খরচ যেন না হয়।

যেটা পাওয়া গেল, আর যেটা খরচ করা হল তার মধ্যে একটা অনুপাত বজায় রাখা চাই। সে জন্য সত্তার মাঝে এক রকমের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। তবে কেউ কেউ আছে যাদের মধ্যে প্রায় সহজ প্রবৃত্তিজাত এমন একটা ক্ষমতা আছে, যেটার দ্বারা তারা প্রাণশক্তিদের আকর্ষণ করতে পারে অথবা আত্মসাৎ করতে পারে—আমি অবশ্য বিশ্ব-প্রাণশক্তিদের কথাই বলছি,—আর এই ভাবে তারা যে পরিমাণে খরচ করে, সেই পরিমানে তা পূরণও করে নেয়। তেমন লোকেরা অন্যদের চেয়ে ঢের বেশী সরবরাহ করতে পারে। এমনও কেউ কেউ আছে, যারা বিশেষ কোন কোন অবস্থায়, যেমন ঘুমের মধ্যে বা একভাবে বিশ্রাম কোরে অথবা দেহকে এলিয়ে দিয়ে গ্রন্থীমুক্ত করে শক্তি সংগ্রহ করতে পারে। তারপরে আবার সেগুলোকে তথাকথিত কাজেকর্মে খরচ করে ফেলে পরে আবার যেন "ব্যাটারী চার্জ" করার মতন তাদের ধারকযন্ত্রকে পূর্ণ করে তোলে। অবশ্য এ পদ্ধতিটি বিশেষ অনুকূল নয়।

অনেকে আবার আছে যারা একেবারেই শক্তিকে গ্রহণ করতে জানেনা। তারা কেবল দেহের মধ্যেই যে জীবনী শক্তি ঘনীভূত রয়েছে তার দ্বারাই জীবনধারণ করে—কারণ প্রতিটি দেহ-কোষের মধ্যেই শক্তি পুঞ্জীভূত রয়েছে—সেইটির উপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকে। কিন্তু তারা যদি শক্তিকে পুনঃ সঞ্চয় করতে না জানে তাহলে কিছুকাল পরে সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যখন তারা দেহের মধ্যে সঞ্চিত সমস্ত শক্তিই নিঃশেষ করে ফেলেছে, তখন হয় তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে নয়ত আর কখন ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। তাই ওভাবে পাওয়া শক্তি বেশী দিন টেঁকে না। একটা মানুষের সাধারণ গড়পড়তা জীবনকাল পর্যন্তই তা টেঁকে। তাছাড়া আবার কিছুকাল পরে তারা আর আগের মতন ব্যয়বহুল করতে পারে না, কাজেই আগে যতটা কাজ করত ততটাই পারে না, আর চেয়ে বড় কথা, উন্নতির পথে এগুনো বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু যারা সজ্ঞাত প্রবৃত্তির দ্বারা সঞ্চয় করতে জানে, অথবা যারা বিশ্ব প্রাণশক্তিদের গ্রহণ এবং ধারণ করতে শিখেছে তারা সুদীর্ঘকাল টিঁকে থাকতে পারে। খরচ তাদের খুবই সামান্য হয়, বিশেষ করে যদি তারা তা করতে জানে এবং বুদ্ধিমানের মতো সঠিক পদ্ধতি অনুসারে খরচ করে, তাহলে বেশ খানিকটা পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

যে জানে, তার কাছে কখন কখন দুতিন মিনিটই যথেষ্ট। কয়েকদিন ধরে যতটা শক্তি খরচ করেছে সবটাই সে ওইটুকু সময়ের মধ্যে উসুল করে নিতে পারে। কেবল জানা নিয়ে কথা, কি ভাবে করতে হয়!

কিন্তু যারা নিজের মধ্যেই নিজেকে গুটিকে রাখে, গণ্ডীর বাইরে যায় না তারা এটা করতে পারে না। অনুক্ষণ অনন্ত বিস্তৃত বিশাল চেতনার মাঝে বাস করতে হবে। জানি না কথাটা বুঝতে পারলে কি না। ওর মানে, এমন একটা অবস্থা যা একই সঙ্গে অতি-শয় শান্ত নিথরভাবে সর্বত্র বিস্তারিত রয়েছে, ঠিক যেমন বন্যার জলপ্রবাহ যখন তার পরি-পূর্ণতার অবস্থায় পৌঁছেছে তখন ঠিক এই রকম শান্ত ভাবে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয়, অনেকটা সেই রকম। তোমার প্রাণটি যেন সেই রকম হয়ে ওঠে—তাহলে তুমি বিশ্ব-শক্তিদের দিকে নিজেকে অবারিতদ্বার হয়ে খুলে রাখতে পারবে। কিন্তু ধর, তোমার যদি আবার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে প্রাণশক্তিগুলোকে নিয়ে আদানপ্রদান করার অবাঞ্ছনীয় অভ্যাস থাকে, তাহলেই সব মাটি, তোমার গ্রহণসামর্থ্যকে তুমি একেবারেই হারিয়ে ফেলবে। তখন তোমার সঙ্গে যদি কারুর যোগাযোগ না থাকে, তাহলে তুমি কিছুই লাভ করতে পারবে না। তারপর যদি আবার অন্যদের মধ্যে দিয়ে শক্তি সংগ্রহ কর, তাহলে স্বভাবতই সেই সঙ্গে তাদের বাধাবিঘ্নগুলোও তোমার মধ্যে চলে আসবে। হয়ত কখন কখন তার গুণগুলোও পাবে, কিন্তু তেমনটা কমই ঘটে থাকে। প্রাণের আদানপ্রদান হল এমন এক বস্তু, যার দ্বারা উর্ধ্বের উপলব্ধি এবং গ্রহণ সামর্থ্য সব চেয়ে বেশী বন্ধ হয়ে যায়।

কেউ কেউ আছে যাদের অন্যদের সঙ্গে যদি অল্পবিস্তর সামাজিক সম্পর্ক না থাকে যেমন ধর, বন্ধুদের খাতির, গল্পগুজবের আড্ডা, ইত্যাদি...আবার তার চেয়েও বেশীদূর তাহলে তারা সরাসরি কোন শক্তি লাভ করে না, যেমন ওই ভাবে প্রাণের আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই কিছু শক্তি পায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আবার সর্বদাই সেটা পাঁচমিশেলী এবং ঘোলো হয়ে পড়ে। কারণ ওইভাবে তারা যে শক্তিগুলোকে লাভ করে, সেগুলো আগেই

অর্ধেকটা জীর্ণ হয়ে গেছে, অন্তত তাদের প্রথমিক বিশুদ্ধতা আর বজায় থাকে না। তার ফলে নিজের গ্রহণসামর্থ্যও বিকৃত হয়ে যায়।

কিন্তু যার চেতনাতে এই রকমের সামর্থ্য থাকে, যেমন তুমি হয়ত কোথাও বেড়াতে বেরিয়েছ। এমন জায়গায় গিয়ে পড়েছ, যেটা সমুদ্রের মতন বিশাল বিস্তীর্ণ অথবা দিগন্তব্যাপী বিরাট সমতল ভূমি অথবা একটা পর্বত শিখর—এমন একটা জায়গা যেখানে তোমার সামনে দিগ্বলয় বেশ সুদূরপ্রসারী তখন যদি তোমার মধ্যে ওই রকম একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের উদয় হয়, যার ফলে হঠাৎ তুমিও দিগন্তবিস্তারের মতন বিশাল ব্যাপক হয়ে ওঠ। তোমার মধ্যে তখন অনন্তের অপরিমেয়তার একটা অনুভূতি হয়, আর তখন যত তুমি বিশালতা অনুভব করতে থাক ততই ধীর, স্থির শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠ...

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এই রকম সংযোগ একবার যদি লাভ করতে পার, তাই যথেষ্ট।

উপায় এমন আরো অনেক আছে, কিন্তু এটাই সব চেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত। তেমনি আবার...যখন খুব সুন্দর একটা কিছু দেখ, তখন তোমার মধ্যে ওই একই ভাবের উদয় হতে পারে। অন্তর একরকম আনন্দে ভরে ওঠে, আর তখন বিশ্বশক্তিদের দিকে তিতরটা খুলে যায়। তখন একাধারে তোমাকে বিশাল করে ভরিয়ে তোলে। এমন অনেক উপায় আছে। কিন্তু সাধারণত মানুষ সেগুলোকে ব্যবহার করে না। স্বভাবতই যদি একটু অন্তর্মুখী হও, যদি অন্তরে ব্যাকুলভাবে উর্ধ্বের জীবনের জন্যে আকাঙ্ক্ষা কর, আর যদি সেই উর্ধ্বের শক্তিদের আবাহন কর তাহলে তোমার শক্তিগুলো অন্য সব কিছুর চেয়ে শীঘ্র পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে। এমন আরো অসংখ্য উপায় আছে।

যাক, আজ তাহলে এই শেষ, কি বল। রাত হল।

এস তবে, যাদুধনরা।

ফুলের নিহিত বাণী

শ্রীমা

যখন তুমি ফুলের কোন অর্থ দাও, তখন তোমার মনের প্রতিচ্ছায়া সেই অর্থের উপর পড়ে। ফুল উত্তর দিতে পারে, প্রতিচ্ছায়ার স্পর্শে স্পন্দিত হতে পারে, অর্থও গ্রহণ করতে পারে কিন্তু ফুলের মানসিক চেতনার সমতুল্য কিছু নেই। উদ্ভিদ জগতে মানসিক চেতনার সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। প্রাণিক জগতে এ কিন্তু অন্য ধরনের : মানসিক জীবন আকার ধারণ করতে শুরু করে এবং এদের কাছে এর অর্থ ভিন্ন। কিন্তু ফুলের মধ্যে এ যেন একটি ছোট্ট শিশুর নড়াচড়ার মত—এ স্পর্শানুভূতি নয়, অনুভূতিও নয়, কিন্তু যেন দুইয়ের সম্মিলিত ভাব ; এ যেন একটা স্বতঃস্ফূর্ত গতি, একটি অসাধারণ স্পন্দন। তুমি যদি এদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পার, যদি অনুভবও করতে পার, তা হলে তোমার মনের মধ্যে একটি ছাপ পড়বে যাকে তুমি তোমার চিন্তাধারায় বিধৃত করতে পার। এইভাবেই আমি ফুল ও গাছপালার অর্থ নির্দেশ করি। তাদের স্পন্দনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই, যে গুণ ধরে তারা তা বুঝে নিই। একটু একটু করে কখনও মোটামুটি ধারণা করতে করতে হঠাৎ এবং আবার কখনও অনেক সময় নেয়, এদের স্পন্দনের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ ঘটে যায়, যে স্পন্দনগুলি প্রাণাবেগময় প্রকৃতির এবং মানস চিন্তার স্তরের বলা যায়। সৌমনস্য যদি যথেষ্ট থাকে, তা হলে উদ্ভিদের অর্থ সরাসরি বোধগম্য হয়।

কোন কোন দেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে কিছু গাছ আছে যা পূজায়, পুষ্পাঞ্জলিতে ও ভক্তিতে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন গাছ আবার বিশেষ ব্যাপারে কাজে লাগে। আমি প্রায়শঃ দেখেছি এই যে একাত্মভাব তা গাছের স্বভাবের খুবই অনুকূল, কারণ এ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অজ্ঞাতসারে। কিন্তু আমি যে অর্থ তাদের দিয়েছি তা পূজাপার্বণে ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিকই ফুলের মধ্যে সেই স্পন্দন অনুস্যূত হয়েই আছে—তা আসে কি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার থেকেই, না তা আগত বহুদূর থেকে বা কোনো গভীর ভাব-উৎস থেকে বা চৈত্যিক প্রাণের প্রারম্ভ থেকেই ? তা বলা খুবই শক্ত।

ফুলের সৌন্দর্যবোধ

যেই মাত্র জৈব জীবনের শুরু হল, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণজ বস্তু এসে গেল এবং সেই প্রাণজ বস্তুই এনে দেয় ফুলের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ। আমরা যেমনটি জানি হয়তো সেই ধরণের আত্মকেন্দ্রীভূত নয়, কিন্তু একটা বোধশক্তি যা জৈব প্রাণীদের মধ্যে আছে এবং তারা সব সময়েই সেটি বোধগম্যের মধ্যে আনবার চেষ্টা করে। আমি লক্ষ করেছি উদ্ভিদ জীবনে চৈত্যিক স্পন্দনের একটা প্রথম লক্ষণ এবং সত্য সত্যই ফুলের প্রস্ফুটনই হল চৈত্য সত্তার উপস্থিতির বিশেষ লক্ষণ। চৈত্য পুরুষ শুধু মানুষের মধ্যেই ব্যষ্টিরূপ নেয়, কিন্তু তার অস্তিত্ব আগে থেকেই, তা এসেছে...শুধু সে রকম ব্যষ্টিরূপ গ্রহণ নেই, এখানে এটি আরও তরল ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে বরং প্রতিভাত হয় একটি শক্তি বা এই চেতনারূপে। যেমন ধর,

একটি গোলাপ ফুল—এর আকৃতির অনবদ্য পূর্ণতা, এর রং ও গন্ধ আশ্পৃহাকে প্রকাশ করে এবং এ হল চৈত্যিক দান। একটি গোলাপ সূর্যালোকের প্রথম স্পর্শে সকালে যখন ফোটে তা যেন একটা অপরূপ আত্মনিবেদনের আশ্পৃহা।

উদ্ভিদ জগৎ

তোমরা কি কখনও দেখেছো অরণ্য আর তার অগণিত গাছপালা নিয়ে আলোকের সন্ধানে কি যুদ্ধই না করছে—নিজেদের বেঁকিয়ে চুরিয়ে শত সহস্রভাবে সূর্যের দিকে এগিয়ে যাবার কি অকুণ্ঠ প্রচেষ্টা। একেই ছোট্ট কথায় বলা যেতে পারে—দেহে আশ্পৃহার অনুভূতি—একটা অন্তরের সাড়া, একটা গতি, আলোর দিকে একটা প্রবেগ। মানুষের চেয়ে গাছেরই মধ্যে এই এ-জিনিস বেশি করে রয়েছে। তাদের সারা জীবনটাই হল আলোর পূজা। অবশ্য আলোই হল ভগবানের বাস্তব প্রতীক এবং কতকগুলি জাগতিক অবস্থার পরিবেশে সূর্যই হল পরাচেতনার প্রতীক। গাছপালা তাদের নিজস্ব সহজ অন্ধ-ভাবে পরিষ্কার এই চেতনাকে অনুভব করে। তাদের আশ্পৃহা তীব্র, যদি তা ধরতে পারার কৌশলটি জেনে থাকো তবে বুঝতে।

গাছের মধ্যে ভালবাসার গতিবিধি

ভালবাসার গতিবিধি মানুষের মধ্যেই কেবল নিবদ্ধ নয় এবং আমার মনে হয় মানুষের জগতে তা যতটা বিকৃত অন্যান্য জগতে তার চেয়ে অনেক কম। সূর্য যখন অস্তমিত হয় এবং সব যখন নীরব হয়, কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে ব'স এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দাও। তখন তুমি অনুভব করবে যে যেন মর্ত্য থেকে উঠছে—গাছের নীচের শিকড়েরও তলা থেকে এবং তাদের প্রতি শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে উঠছে উর্ধ্বতম শাখা প্রশাখা পর্যন্ত একটি তীব্র প্রেম ও আকিঞ্চনের অভীপ্সা—এমন কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা যা আনে আলো, যা প্রয়াত আলোর জন্য জাগায় তৃপ্তি এবং যে আলো তারা চায় আবার ফিরে পেতে। এটা এমন একটা তীব্র ও পবিত্র আকুলতা যে তাকে যদি অনুভব করতে গাছের গতিবিধির মধ্যে তবে দেখতে তোমার সত্তাও উঠে চলবে এখানে এখনো অপ্রকাশ শান্তি জ্যোতি ও প্রেমের জন্য অনন্ত প্রার্থনায়।

ফুলের সঙ্গে একাত্মতা

একটা বিপুল একাগ্রতা আমাকে অধিকার করল, আমি দেখতে পেলাম একটি চেরী ফুলের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে গিয়েছি। তারপর এই ফুলটির ভিতর দিয়ে যাবতীয় চেরী-ফুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলাম। তারপর চেতনার আরো গভীরে নেবে গিয়ে, একটা নীলাভ শক্তির স্রোতে চলে, আমি হয়ে উঠলাম একেবারে চেরীগাছটিই, আকাশের দিকে আমার বাহুরই মত শাখা সব পুষ্পার্ঘভার নিয়ে প্রসারিত। ঠিক সেই সময় আমি স্পষ্ট এই কথাগুলি শুনতে পেলাম :

"তুমি চেরী-গাছের আত্মার সঙ্গে নিজেকে এক করে দিয়েছ, তাই তুমি অবিকার

করতে পেরেছ যে ভগবান নিজেই উর্ধ্বে আকাশের দিকে চেয়ে ফুলদের এই প্রার্থনার অর্ঘদান করছেন।"

কথাগুলি শুনি যখন তখনি লিখে রাখলাম, পর মুহূর্তে সব মুছে গেল। এখন কিন্তু চেরীর রক্ত আমার ধমনীতে বয়ে চলেছে, আর সেই সঙ্গে রয়েছে একটা অতুলনীয় শক্তি ও শান্তি। মানুষের দেহ আর গাছের দেহে কি প্রভেদ? কোনই প্রভেদ নাই—বস্তুত যে-চেতনা উভয়কে অনুপ্রাণিত করে তা এক অভিন্ন।

তখন চেরী গাছটি আমার কানে কানে বললে—

চেরী গাছের ফুল হল "বাসন্তী" রোগের ওষুধ।

প্রশ্ন ও উত্তর

আমাদের জীবনে ও স্বপ্নে ফুলের অবদান

প্রশ্ন : আমাদের জীবনে ও যোগে ফুল কিভাবে সাহায্য করে?

উত্তর : ফুল নীরবতার মাধুর্য শেখায় এবং ফলত সেই আত্মদান যা প্রতিদানে কিছুই দাবি করে না।

প্রশ্ন : আমাদের স্বপ্নে ফুল ও ফুল বাগানের তাৎপর্য কি? কখনো স্বপ্নে এমন ফুল দেখা যার অস্তিত্বই নেই।

উত্তর : নিঃসন্দেহভাবে এগুলি সূক্ষ্ম শরীর লোকে। কিন্তু এও সম্ভব যে সেই ফুলগুলি বস্তুত পৃথিবীর কোন জায়গায় আছে যার খোঁজ তুমি জান না।

প্রশ্ন : না, না, ঠিক এই জিনিসটি আমি জানতে চাইনি; আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তা হল—এই ফুলগুলি কিসের প্রতীক?

উত্তর : বেশীর ভাগ সময়ে এই প্রতীকগুলি ব্যক্তিগত এবং বিভিন্ন লোকের পক্ষে তাদের তাৎপর্য বিভিন্ন। এও ঘটতে পারে যে কোন একজন একটি বই লিখেছে এবং যারা ঐগুলি পড়ে তারা তা থেকে প্রতীকত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু তখন এটা নিতান্তই মনের প্রশ্ন। উদাহরণ স্বরূপ, তুমি কোন একটি ফুলের সংজ্ঞা দাও—একটি গোলাপ—আমরা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছি গোলাপের। যেহেতু গোলাপের একটি বিশেষ সংজ্ঞা দিই তাই তোমার স্বপ্নে সেই প্রতীকই দেখ। যদি তোমার কোন স্বপ্নের কথা বল তাহলে তার ব্যাখ্যা আমি করতে পারি। লক্ষ করো কোনো ফুল তোমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু বললেই তা তোমার কাছে শেষে প্রতীক হয়ে উঠবে। কিন্তু তা আমরা যা আগেই নির্দিষ্ট করেছি তাও হতে পারে।

প্রশ্ন : ফুলের গভীর প্রভাবের দিকে নিজেদের খুলে ধরার সবচেয়ে ভাল কোন উপায়?

উত্তর : তাদের ভালবাসা। যদি তুমি তাদের সঙ্গে চৈত্যিক সংযোগ করতে পার তাহলে তা হবে নিখুঁত।

প্রশ্ন : কেমন করে একজন ফুলের আত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনা করতে পারে?

উত্তর : যখন কেউ নিজের চৈত্যসত্তার সঙ্গে সচেতনভাবে সংযুক্ত, তখন সেও সমস্ত সৃষ্টির পিছনে যে এক নির্ব্যক্তিক চৈত্যসত্তা আছে তার সম্বন্ধে সচেতন এবং তারপর এরই মধ্য দিয়ে ফুলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে এবং জানতে পারে তার কি ধরনের চৈত্যিক প্রার্থনাকে রূপায়িত করে।

চৈত্যসত্তাকে জানতে ও তার সঙ্গে একত্বভাব আনতে ফুলের প্রতি ভালবাসা হল এক অমূল্য সাহায্য।

ফুল উদ্ভিদ জগতে চৈত্যসত্তারই বিকাশ বলে তার প্রতি ভালবাসার অর্থই হবে চৈত্যিক স্পন্দনের দিকে এবং ফলত, নিজের চৈত্যসত্তার দিকেই আকৃষ্ট হওয়া।

যখন তুমি চৈত্যসত্তার স্পন্দনের প্রতি গ্রহিষ্ণু হবে তখন তা তোমার নিজের সত্তার চৈত্যের সঙ্গে আরো নিবিড়তর সংযোগ এনে দেবে। হয়তো প্রকৃতি ফুলের সৌন্দর্যের মাধ্যমেও মানুষের মধ্যে চৈত্যসত্তার প্রতি আকর্ষণ জাগিয়ে তোলে।

ফুলের চৈত্য-প্রার্থনা

প্রশ্ন : তুমি সৃষ্টির পিছনে "নির্ব্যক্তিক চৈত্যের" কথা বলেছ। তোমার বিবৃত এই 'নির্ব্যক্তিক চৈত্য" সত্তা কী?

উত্তর : "নির্ব্যক্তিক চৈত্য" বলতে আমি অর্থ করেছি একটা চৈত্য-স্তর—যা বিশেষ কোন ব্যক্তিত্বে সীমাবদ্ধ নয়, এই চৈত্যস্তর—সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে যেমন বায়ু—পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যেই আছে।

প্রশ্ন : ফুলে প্রতিফলিত এই চৈত্যিক প্রার্থনার অর্থ কী?

উত্তর : চৈত্যসত্তা যখন ফুলের রূপে গাছের মধ্যে প্রকাশ হয়, তখন তা হল নীরবতর প্রার্থনার রূপে : এই হল ভগবানের দিকে গাছের ঊর্ধ্বগামী প্রবেগ।

প্রশ্ন : "অর্থের প্রতি লোভ", "প্রবৃত্তি," "অহংকার", "বক্‌বক্ করা" ইত্যাদি অর্থ অনেক ফুলের আছে। কেমন করে এরা, চৈত্য-প্রার্থনাকে চিত্রিত করে?

উত্তর : এই ফুলেরা তাদের কু-স্পন্দনকে নিবেদন করে দেয় রূপান্তরিত হবার জন্যে।

গাছের প্রাণ

উদ্ভিদে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তির ক্রিয়াও বেশ বিপুল। এরপর আছে শ্রেণীগত প্রতিভা—যা একটা চেতনাই। এক সক্রিয় চেতনা উদ্ভিদের মধ্যে কর্মরত রয়েছেই।

শ্রেণীগত প্রতিভার মধ্যেই দেখা যায় একটা সূচনা—ভ্রূণকল্প হলেও বাস্তবিক চৈত্যিক প্রভাবের দিকে সাড়া দেবার সূচনা ; যদিও এরা এ সম্বন্ধে সচেতন নয়, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তি হিসাবে বিদ্যমান। যদিও এটা সুনিশ্চিত যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তুমি বাহ্যিকভাবে যে যত্ন নাও তার উপরে যদি তোমার গাছের প্রতি বিশেষ প্রীতি থাকে, যদি তুমি তাদের

খুব নিকটতর ভাবে অনুভব কর, তা হলে গাছও ঠিক সে রকমটাই অনুভব করে। এর প্রস্ফুটন তখন আরও বেশী সুগন্ধময় ও হাসিখুশি, এর বৃদ্ধি যথাসম্ভব নিখুঁত, এবং জীবন দীর্ঘায়ু। ফলত একটা চেতনার উপস্থিতিই সেখানে আছে। যার গাছের প্রাণসত্তা তো নিশ্চয় আছেই।

তুমি কি কল্পনা করতে পার যে গাছেরও অহংকার আছে। তুমি যে গাছকে লালন পালন করেছ, তারই কথা হচ্ছে। ধর তুমি ভাষায় বা অনুভূতি দিয়ে তাদের প্রশংসা করলে, ধর তুমি তাদের তোয়াজ করলে, হ্যাঁ, তারা তাদের মাথাটা উঁচু করে দেয় গর্বে।

প্রশ্ন : মা, গাছের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে কী? এবং তারা মৃত্যুর পর আবার শরীর ধারণ করতে পারে কী?

উত্তর : তা ঘটতে পারে, তবে সেটা দৈবাৎ। অনেক গাছ আছে, বিশেষ করে সে-গাছই যারা দীর্ঘায়ু এবং একটা সচেতন সত্তা, একটা প্রাণিক সত্তার আশ্রয়। সাধারণত প্রাণজ সত্তারাই গাছে আশ্রয় নেয়, কিম্বা প্রায়শঃ তারা বনবাসী প্রাণিক সত্তা, যেমন প্রাণজ স্তরের কোন কোন সত্তা জলেও বাস করে। ঐ ধরণের অনেক পৌরাণিক গল্প আছে, যেগুলোর ভিত্তি বাস্তব ঘটনায়।

গাছ আবাস ও আশ্রয় হিসাবে কাজ করে কিন্তু গাছরা নিজে সেসব সত্তা সৃষ্টি করে না।

সত্তা ও শক্তি

প্রশ্ন : এমন কোন সূক্ষ্ম সত্তা আছে যারা ফুলের সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গভাবে জড়িত?

উত্তর : এটা চিন্তনীয়, এমনকি সম্ভবপর। কোন কোন ছেলের এসব অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে এবং তারা এর বর্ণনাও দিয়েছে।

প্রশ্ন : এই সব প্রাণীদের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করা কি সম্ভব?

উত্তর : হ্যাঁ। তবে প্রশ্ন হল স্বভাব ও ধারণ ক্ষমতার।

প্রশ্ন : এই সব সূক্ষ্ম প্রাণীদের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া—তুমি বলেছিলে সেখানে প্রশ্ন হল স্বভাব ও ক্ষমতার। এটা কি সম্ভব যে এই ক্ষমতাকে বাড়ানো যায় এবং তা কেমন করে করা যায়?

উত্তর : সামর্থ্যকে বাড়াতে পারো নিশ্চয় তবে এর জন্যে কারো প্রয়োজনীয় সময় ও প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে যাবার যদি যথেষ্ট আগ্রহ থাকে। স্বভাবিকভাবেই, নিজস্ব স্বভাব অনুসারে, কারো পক্ষে তা কঠিন বা সহজ। নিজের স্বপ্ন সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এই কাজে অনেকটা সাহায্য করে। একটা নীরব ও স্থির মনঃসন্নিবেশও সাহায্য করে।

প্রশ্ন : পোকামাকড়েরা কি এই শক্তির বিকাশ? উদ্ভিদজগতের দুষ্ট বিরোধীশক্তি কিছু আছে কি?

উত্তর : সে রকম সচেতনভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে উদ্ভিদ জগতের বিরোধী শক্তি আছে বলে মনে হয় না। পোকামাকড় গাছ খেয়ে বাঁচে বলে খানিকটা ক্ষতি করে কিন্তু এইভাবে তারা গাছকে সেবাও করে। দুটি জিনিসই আছে, ভাল ও মন্দ, সচেতন ইচ্ছা ব্যতিরেকে।

গাছ ও ফুলের যত্ন

প্রশ্ন : গাছ ও ফুলের সাথে ভালভাবে কাজ করতে গেলে আমাদের চেতনার কি ভাবে উন্নতি সাধন করতে হবে?

উ : প্রথমেই কি করে নীরব হতে হয় শিখতে হবে, তারপর সবসময় লক্ষ্য কর তোমার চেতনায় কি ঘটছে।

প্রশ্ন : গাছ কেন অসুস্থ হয় এবং কি ভাবে তাদের আমরা সাহায্য করতে পারি?

উত্তর : মানুষ যখন অযথা হস্তক্ষেপ না করে, ফুলের অসুস্থতা ঘটে দৈবাৎ। মানুষেরই কর্ম গাছের জীবন বিপর্যস্ত করেছে। এমনকি পশুর জীবনেও, নিশ্চিত জেনো। গাছের ও পশুর জীবন বিপর্যস্ত করেছে মানুষ এবং মানুষের জীবন বিপর্যস্ত ছত্রভঙ্গ করেছে অতিমানবেরা।

প্রশ্ন : অনেক গাছ আছে যাদের আমরা এখানে জন্মাতে চেষ্টা করি, কিন্তু তারা এখানকার আবহাওয়ার জন্যে কষ্ট পায়। আমরা কেমন করে তাদের এখানে জন্মান ও ফুটিয়ে তোলায় সাহায্য করতে পারি?

উত্তর স্বভাবতই যে গাছ ঠাণ্ডা জলবায়ু পছন্দ করে তারা কাঁচের ঘরেই জন্মাবে। তাছাড়া বনজঙ্গল জন্মিয়ে জলবায়ুর নিয়ন্ত্রণ কাজ হতে পারে।

আবহাওয়ার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির একটা নিশ্চিত ফল আছে, তার বর্ণনা আগে থেকেই দেওয়া দুঃসাধ্য।

নব সৃষ্টি

প্রশ্ন : গাছ ও ফুলের উপর নবসৃষ্টির আলো কিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে?

উত্তর : সমস্ত সৃষ্টিই আরও বেশী সচেতন হয়ে উঠবে; এইভাবে উদ্ভিদ জগৎ তাদের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুপাতে এই উন্নতির যাত্রায় অংশ গ্রহণ করবে।

ফুলের সুগন্ধ

প্রশ্ন : বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ফুলের গন্ধ পোকা-মাকড় আকর্ষিত করবার জন্যে। তুমি এ সম্বন্ধে কি ভাবো?

কোন কোন গাছ আছে যাদের ফুলে অপ্রীতিকর গন্ধ; কারও আছে অপ্রীতিকর গন্ধের পাতা, কিন্তু তাদের ফুল সুগন্ধে ভরা।

উত্তর : মানুষই দেখে ও খুঁজে বার করে প্রত্যেক জিনিসের কারণ—কিন্তু আমার সন্দেহ আছে পরমেশ্বরের এরূপ কোন কাজ আছে কিনা।

প্রশ্ন : ফুলের গন্ধ ও তার তাৎপর্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে কি না ?
উত্তর : নিশ্চয়ই, একটা থাকা উচিত, কিন্তু এ পর্যন্ত ঐ বিষয়ে অনুধাবন করিনি।

প্রশ্ন : তুমি বলেছিলে ফুলের গন্ধ ও তাৎপর্যের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে নিশ্চয়ই। কি উপায়ে এই সম্বন্ধ অনুধাবন শুরু করা যায় ? প্রথম পদক্ষেপ কি ?
উত্তর : অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা। উগ্র ও বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত একটি ফুল নাও। তুমি ফুলের গন্ধটি নিশ্বাসে টেনে নিয়ে দেখবার চেষ্টা কর, কোন চিন্তা বা কি মূর্তি এ জাগায়। যদি কিছু সন্ধান পাও, তাহলে মিলিয়ে দেখো ফুলের যে তাৎপর্য দিয়েছি তার সাথে। এ একটা দীর্ঘ ও চুলচেরা বিচারের কাজ। শতাব্দি অভিজ্ঞতার পর একজন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে।

প্রশ্ন : সুগন্ধ অধ্যয়নের কথা যা বলেছিলে, দেখা যায় যে একটি সুগন্ধ কতকগুলো গন্ধের সমষ্টি। তাহলে এই সহ-গন্ধ পৃথকভাবে অনুধাবন করতে হবে ?
উত্তর : হাঁ নিশ্চয়ই। যদি কেউ এ অধ্যয়ন করতে চায় সে দেখবে এটি ভীষণ জটিলতাপূর্ণ, কারণ ফুলের সঙ্গে ফুলের পার্থক্য নিয়ে শুধু নয়, এমনকি একই রকমের ফুলের নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই ; এর অর্থ হল যে এই অধ্যয়ন কোনদিনই শেষ পর্যায়ে আসবে না এবং কেউই কোন রকম চূড়ান্ত ও অন্তিম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না। তোমরা জান, জলবায়ুর প্রভাব, প্রহরের প্রভাব—দিন ও রাত—বৎসরের বিশেষ সময়ের প্রভাব, ঋতুরও প্রভাব...

প্রশ্ন : অ-গন্ধ ফুলের চেয়েও উগ্র-গন্ধ ফুল কি নিবিড় চৈত্য-প্রার্থনার প্রতীক ?
উত্তর : তাদের স্বভাবই খুব সহৃদয় ও পূর্ণভাবে নিজেদের উৎসর্গ করে।

ফুল নিবেদন

প্রশ্ন : সূক্ষ্ম জগতে ফুলের কি কোন শক্তি আছে ?
উত্তর : হাঁ, তাদের অলক্ষ্য শক্তি আছে, এমনকি তারা বাণী বয়ে নিয়ে যেতে পারে, অবশ্য যদি কেউ জানে তাদের কিভাবে তাতে সে অর্থ ভরে দিতে হয়।

প্রশ্ন : তুমি যে অর্থ ফুলকে দিয়েছ তাছাড়া আর কোন বাণী তারা বহন করতে পারে ?
উত্তর : তা অসম্ভব নয় যদি যে এই বাণীটি পাঠাচ্ছে তার রূপায়িত করে তুলবার প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকে।

প্রশ্ন : এই রূপ দেবার শক্তি কি একান্তভাবে গুপ্তবিদ্যার কিংবা রূপায়ণের মানসিক কিংবা প্রাণিক শক্তিও বাণী চালাচালি করতে পারে ?

উত্তর : রূপায়ণের মানসিক শক্তি অবশ্য বাণী প্রেরণ করতে পারে। কিন্তু এই সব বাণী গ্রহণ করতে, অর্থ বুঝতে হলে যার কাছে এসব পাঠানো হচ্ছে তাকে নিজে হতে হবে মনের ক্ষেত্রে গ্রহিষ্ণু এবং বিশেষ করে সমনস্ক।

প্রশ্ন : আমরা ফুলের অর্ঘ নিবেদন করি, কি মনোভাব নিয়ে তা উৎসর্গ করব? আমরা যদি তার তাৎপর্য নাও জানি তাতে কি কিছু আসে যায়?

উত্তর : এটি পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে যে লোকটি ফুল উৎসর্গ করছে তার উপর তার চেতনার অবস্থার উপর। দুটি প্রশ্নের একই উত্তর দেওয়া যেতে পারে। মানুষের চেতনার স্তরের মান অনুসারে তাদের কর্ম ধারণ করে গভীর তাৎপর্য।

প্রশ্ন : সমাধির উপর যে সব ফুল আছে তাদের বেলায় কি শ্রীঅরবিন্দ তাদের নিজস্ব তাৎপর্য ছাড়া তাদের মাধ্যমে বিশেষ বাণী প্রেরণ করেন।

উত্তর : তা আমার মনে হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন তা। বরং এ হতে পারে যে যদি লোকে কোন অভিপ্রায় বা ছোটখাট প্রার্থনা নিয়ে ফুল উৎসর্গ করে, শ্রীঅরবিন্দ সে বার্তা গ্রহণ করেন এবং উত্তর দেন এবং যদি সে যথেষ্ট পরিমাণে উন্মুখ হয় তবেই কেউ তাঁর উত্তর গ্রহণ করতে পারবে।

শ্রীমা ও ফুল

প্রশ্ন : যখন তুমি বিশেষ কোন ফুল আমাদের দাও, তখন কি আমাদের সেই গুণ ও শক্তি লাভ করার সুযোগ দাও?

উত্তর : সব সময়েই যখনই আমি ফুল দিই তা গ্রহীতার সামর্থ্য অনুপাতে। প্রত্যেকেই পায় তা গ্রহণ-সামর্থ্য অনুসারে। আমি মানুষের চেয়ে বেশী সহজে একটি ফুলকে চেতনার একটা স্তরে পাঠাতে পারি : ফুল অত্যন্ত গ্রহিষ্ণু, যদিও সে জানে না নিজের অভিজ্ঞতা নিজের কাছে কি রকমে গুছিয়ে ধরবে, কারণ তার যে মন নেই। কিন্তু শুদ্ধ-চৈত্যচেতনা এদের কাছে সহজগ্রাহ্য। সেজন্য তোমরা যখন আমাকে ফুল উৎসর্গ কর তাদের অবস্থাটা প্রায় সর্বদাই তোমারই অবস্থার নির্দেশক। এমন লোক আছে যারা কখনও তাজা ফুল আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে না—তাজা ফুল হলেও তাদের হাতে এলে তা নেতিয়ে পড়ে। আবার এমন লোক আছে যারা তাজা ফুল আনে এবং নেতিয়ে পড়া ফুল তাদের হাতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যদি তোমার আশ্রিতা হয় জোরাল তা হলে তোমার ফুল-উৎসর্গও হবে সজীব। এবং যদি তুমি গ্রহিষ্ণু হও তাহলে ফুলের মধ্যে যে বাণী আমি তোমাদের দিই তা গ্রহণ করতে তোমরা সহজেই সক্ষম হবে। আমি যখন সে ফুলগুলি তোমাকে দিই, তখন আমি তোমাকে চেতনার নানা স্তর দান করি; ফুল হল তার মাধ্যম এবং তারা ফলপ্রসূ হবে কিনা তা নির্ভর করে তোমাদের গ্রহণ সামর্থ্যের উপর।

প্রশ্ন : সাধারণত তুমি পুরুষদের লাল গোলাপ, হাল্কা রংয়ের গোলাপ মেয়েদের এবং বিভিন্ন রংয়ের গোলাপ ছোট ছেলেমেয়েদের দাও কেন?

উত্তর : এর কারণ হল লাল গোলাপ শক্তির ভাব দেয় এবং হাল্কা রংয়ের মধুরতার ছাপ দেয়।

আমার কাছে তাদের নিয়ে বলতে হলে নানা কারণ দেখাতে পারি। এবং সত্যি কথা বলতে কি মানুষের চরিত্র অনুসারে ব্যতিক্রমের অবধি নেই।*

---

* Flowers and their Message থেকে। অনুবাদক : নিত্যানন্দ বসু

চাঁদ ডুবে যায়

শতদল

চাঁদ ডুবে যায়।
ভেবেছ কি চাঁদ ডুবে গেল চিরতরে?
প্রভাতে সূর্য
ধ্বনিছে তূর্য,—
তারি কিরণের জালে
স্নেহ-বন্ধনে বন্দিয়া আড়ালে
চাঁদ ডুবে গিয়ে লুকোচুরি খেলা করে।
স্থূল দৃষ্টির দিগন্তপারে
জ্যোতির সায়রে অবগাহিবারে
চাঁদ ডুবে যায়—ফিরে আসে ক্ষণ পরে,
বিরহী নিশার
আলোক-তৃষার
কমল বিকশি ধরে।

ফুল ঝরে যায়!
ভেবেছ কি ফুল ঝরে গেল হারাবারে?
ঝরেছে নিভৃতে
মিশিতে মাটিতে
জননী-জঠর গুহায় লভিতে
তরল সুপ্তি নির্ঝরসধারে।
ঊর্ধ্বপিয়াসী আস্পৃহা তার,
দেহবল্লরী বাহি অভিসার—
শাখায় শাখায়
সবুজ পাতায়
মলয়মথিত সূর্যকিরণ-জারিত জীবনরাস—
লীলাচঞ্চল
ফলউচ্ছল
কার সে গোপন মরমের অভিলাষ
জাগিছে মুকুলে? নবসৃষ্টির নব-রূপসজ্জায়?
ফুল ঝরে গিয়ে ফিরে আসে বারবার।

ঢেউ ভেঙে পড়ে।
মিলায় কি ঢেউ অন্তবিহীন কালের অতল তলে?
মিলায় সুদূরে
উৎস গভীরে,
ঝলকি পলকে উঠে আসে ধীরে;—
স্ফীত সমুর্ধ্ব ঊর্ম্মি-শীর্ষ চেতন দীপনে জ্বলে।
তরঙ্গশিশু পরমোল্লাসে
খলখল হাসে, নেচে ছুটে আসে
লয়ে সুগভীর পরম নিবিড় চেতনার স্পন্দন;
পাষাণ ধরার বক্ষে ঝাঁপিয়ে
জড়-তামসের অঞ্চল নিয়ে
করে টানাটানি ছিঁড়িতে তখনি আবরণ-বন্ধন।
ঢেউ ভেঙে পড়ে ঢেউ ওঠে অনিবার
নব রূপে নব বিকাশ-শোভার
রূপান্তরের সাধনাধারায়
চেতনার ঢেউ আসে যায় বারেবার!!!

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

শ্রীমায়ের ভাষ্যসহ

৭—মানুষ যাকে জ্ঞান বলে তা হল মিথ্যা বাহ্যরূপকে যুক্তির সাহায্যে স্বীকার করা। প্রজ্ঞা আবরণের পিছনে দৃষ্টি দেয় ও সাক্ষাৎ দেখে। যুক্তি সবিস্তারে সব স্থির করে বসে, দেখায় সে-সকলের বৈসাদৃশ্য। যুক্তি করে বিযুক্ত, কিন্তু প্রজ্ঞা সকল বৈসাদৃশ্যকে অভিন্ন সামঞ্জস্যে সংযুক্ত করে।

জ্ঞান, যুক্তি, প্রজ্ঞা প্রভৃতির ওপর শ্রীঅরবিন্দ যা-কিছু লিখেছেন তা বলা হয়েছে আমরা যাতে সাধারণ চিন্তাধারার গতানুগতিক পথরেখা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারি, আর, যদি সম্ভব হয়, বাহ্যরূপের পিছনে রয়েছে যে সত্য তা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

অতি বিরল কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, সাধারণভাবে মানুষ তার চারপাশে, কখনো কখনো বা নিজের ভিতরে, কি ঘটছে সেটুকু কমবেশি নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করেই সন্তুষ্ট থাকে এবং সেইসব পর্যবেক্ষণ এক বা আর-এক নিয়মানুসারে, ভাসাভাসা যুক্তির সহায়ে শ্রেণী-বিন্যস্ত করে তাকেই নাম দেয় "জ্ঞান"। তাদের ধারণাই নেই, এমনকি নেই কোন প্রত্যয়ের আভাস যে যা-কিছু তারা দেখে, স্পর্শ করে, অনুভব করে, পরীক্ষা করে দেখে তা সবই হল মিথ্যা বাহ্যরূপ মাত্র, বস্তুর সত্যস্বরূপ নয়।

একটা যুক্তি যা সবসময় দেওয়া হয় তা হল এই "এই-যে আমি দেখছি, স্পর্শ করছি, অনুভব করছি, কাজেই এটা হল সত্য।"

অথচ বিপরীতপক্ষে বলা উচিত ছিল: "আমি এটা দেখছি, স্পর্শ করছি, অনুভব করছি, কাজেই এ হল মিথ্যা।" আমরা রয়েছি দুটি বিপরীত প্রান্তে আর পরস্পরকে বোঝার কোন উপায় নেই।

শ্রীঅরবিন্দের মতে সত্যকার জ্ঞান হল আসলে একাগ্রতার সহায়ে লব্ধ জ্ঞান, আর প্রজ্ঞা হল সেই অবস্থা যা লাভ করা যায় এই সত্যকার জ্ঞানের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকলে। এখানে তিনি তাই বলছেন: প্রজ্ঞা মিথ্যা বাহ্যরূপের আবরণের পিছনে দৃষ্টি দেয় এবং সাক্ষাৎ দেখে পিছনে রয়েছে যে সত্য। আর শ্রীঅরবিন্দ জোর দিয়ে বলছেন যে ভাসাভাসা, বহিরঙ্গ জ্ঞানের সহায়ে কোন কিছুর সংজ্ঞা নির্দেশ করলে তা সর্বদাই অপর কিছুর বিসদৃশ হবে; যা-কিছু দেখা যায়, অনুভব করা যায়, স্পর্শ করা যায়, আর যা বোঝা যায় না তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সবসময়ই কোন-না-কোন বৈসাদৃশ্যের উপস্থাপনার ভিতর দিয়ে।

যুক্তিবুদ্ধি সর্বদাই একটা জিনিসকে আর-একটার বিরুদ্ধে দাঁড় করায় আর তোমাকে বাধ্য করে বেছে নিতে। যেসব লোকের চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি স্বচ্ছ তারা জিনিসসমূহের পরস্পরের মধ্যে কি প্রভেদ তা সবই দেখতে পায়। এটা বেশ লক্ষ্য করবার মত যে বিচার-বুদ্ধি কাজ করতে পারে কেবল বিভেদের আশ্রয়ে; যেহেতু তুমি এটা এবং ওটার মধ্যে, এই ক্রিয়া এবং ওই অপর ক্রিয়াটির মধ্যে, এই বস্তু এবং ওই বস্তুটির মধ্যে প্রভেদ প্রত্যক্ষ কর, তাই তোমায় সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং বিচারবুদ্ধি কাজ করে।

কিন্তু সত্যকার জ্ঞান, একাগ্রতার সহায়ে লব্ধ জ্ঞান এবং তার ফলে লাভ হয় যে প্রজ্ঞা, তা সর্বদাই দেখিয়ে দেয় আপাতবিরুদ্ধ জিনিসসব কোথায় গিয়ে মিলেছে সুসঙ্গতির মধ্যে, হয়ে উঠেছে পূর্ণ, গড়ে তুলেছে এক নিখুঁত সংহতিময় সমন্বয়ী সাকল্য। আর স্বভাবতই, তাতে পুরোপুরি পাল্টে যায় দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতীতি এবং কর্মের পরিণামসব।

একান্ত অপরিহার্য প্রথম পদক্ষেপটি হল আমরা যেন তোতাপাখির মত, কি বলছি তা না জেনেবুঝেই আউড়ে না যাই যে "বাহ্যরূপ মিথ্যা"—আমরা তা বলি কারণ শ্রীঅরবিন্দ আমাদের তা বলেছেন, কিন্তু আসলে তার অর্থ আমরা বুঝি না। আর, বলতে কি, যখন আমরা কোন কিছু জানতে চাই, আমরা তা দেখে চলি, পর্যবেক্ষণ, স্পর্শ, স্বাদগ্রহণ ও অনুভব করে চলি, কারণ আমাদের বিশ্বাস যে পর্যবেক্ষণের আর অন্য কোন উপায় নেই। একমাত্র যখন তোমার "চেতনার স্থিতিবদল"-এর অনুভূতি হয়েছে, যখন এ সবকিছুর পিছনে চলে গিয়ে তাদের বাহ্যরূপের মায়িকতা স্পষ্টভাবে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করেছ, তখনই বোঝার শুরু। কিন্তু সেই অনুভূতি যদি তোমার না ঘটে তাহলে তুমি সবকটি সূত্র পড়ে ফেলতে পার, সেসব আবৃত্তি করতে এবং শিখতেও পার, আস্থাবানও হতে পার, কিন্তু প্রত্যক্ষবোধ তোমার আসবে না, তোমার পক্ষে তা বাস্তব সত্য হয়ে উঠবে না। এই যত আপাত রূপ, তাদাই বাহ্য-জগতের সঙ্গে যোগাযোগের এবং তা যে কি তা জানার ব্যাপারে একমাত্র উপায় থেকে যায়। আর অনেকসময় কেউ কেউ সারা জীবনই কাটিয়ে দেয় বস্তুসব বাহ্যত কেমন তা জানতে, আর যখন তারা সেসব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং যাকিছু পর্যবেক্ষণ করল বা যাকিছু শিখল সেসব স্মৃতিতে ধরে রাখে, তখন তারা খ্যাতিলাভ করে খুবই বিদ্বান বুদ্ধিমান জ্ঞানবান বলে।

এভাবে অনেক পরিশ্রমের পর, বড়জোর, এইসব বাহ্যরূপের উপর তুমি খানিকটা ক্রিয়া করতে পার, আনতে পার তাদের একটু পরিবর্তন—এইভাবেই বিজ্ঞানের সহায়ে জড়কে নিপুণভাবে ব্যবহার করতে শেখা হয়,—কিন্তু তা সত্যিকারের পরিবর্তন নয়, সত্যকার শক্তি নয়। আর যখন কেউ সেই অবস্থায় আসে, তখন সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয় যে তার গুণধর্ম পরিবর্তনের কোন ক্ষমতাই তার নেই। তুমি অনুভব কর যেন এক নির্বন্ধের গুরুভার তোমায় নুইয়ে দিচ্ছে, বন্দী করে রেখেছে, জান না কোথা থেকে বা কি রকমে। তুমি জন্মেছ এইরকম, এইরকম ক্ষেত্রে, এইরকম পরিবেশে, এইরকম চরিত্র নিয়ে, জীবনযাপন করে চলেছ যথাসাধ্য ভালভাবে, সব জিনিসের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে কিন্তু তাদের উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার না করে, চেষ্টা করে চলেছ তোমার নিজ চরিত্রের দোষত্রুটি কমিয়ে ফেলতে যদিও তার রূপান্তরসাধন তোমার ক্ষমতার বাইরে। অনুভব কর তুমি জালবদ্ধ যেন, এমন-কিছুর ক্রীতদাস যে সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না; পরিস্থিতির, অজ্ঞাতশক্তির হাতে খেলার পুতুল, খেলার পুতুল তুমি এমন এক ইচ্ছাশক্তির হাতে যার বশ্যতা স্বীকার কর না জেনে যা তোমায় বেঁধে রাখে। সব থেকে উগ্র বিদ্রোহী যারা তারাও হল ক্রীতদাস, কারণ তারা যা তোমায় মুক্তি দেয় তা হল আবরণের পশ্চাতে গিয়ে অন্তরালে যা রয়েছে তার সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎদর্শনের পর তার সঙ্গে তুমি একাত্ম হতে পার, আর একাত্ম হলেই সত্যকার রূপান্তরের চাবিকাঠি আসবে তোমার হাতে।

আমরা পড়ি, বুঝতে চেষ্টা করি, ব্যাখ্যা করি, জানতে চেষ্টা করি। কিন্তু একমিনিটের

সত্যকার অনুভূতি লক্ষ লক্ষ কথার শতশত ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশি কিছু শেখায় আমাদের।

তাহলে প্রথম প্রশ্ন হল : কেমন করে সে অনুভূতি আসবে?

অন্তর্মুখী হয়ে নিজের মধ্যে প্রবেশ কর, এই হল প্রথম পদক্ষেপ। আর, অন্তরে রয়েছে যা তার সত্যতাকে বাস্তবে অনুভব করবার মত তোমার গভীরে একবার যেতে পারলে, তখন ক্রমে ক্রমে নিজেকে সুনিয়মে প্রসারিত করে ধর যাতে তুমি হয়ে উঠতে পার বিশ্বের মত বিপুল, হারিয়ে ফেল সীমার অনুভব।

প্রস্তুতিপর্বের প্রথম দুটি পদক্ষেপ হল এই।

আর এদুটি জিনিস করতে হবে যতটা পূর্ণভাবে সম্ভব স্থিরতা, শান্তি ও অচঞ্চলতার মধ্যে। সেই শান্তি, সেই অচঞ্চলতা মনে আনবে নীরবতা, আর প্রাণে নিশ্চলতা।

এই প্রচেষ্টা, এই প্রয়াস সুনিয়মিতভাবে অধ্যবসায়ের সঙ্গে বারবার নূতন করে করতে হবে; আর তাহলে কমবেশি কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর বহিরঙ্গ সাধারণ চেতনায় যে দৃষ্টিতে জিনিস সব তুমি দেখতে তার থেকে স্বতন্ত্র এক বাস্তবতার প্রত্যয় তোমার আসতে শুরু করবে।

অবশ্য, ভগবানের করুণা হলে সহসা ভিতর থেকে আবরণখানি ছিন্ন হতে পারে আর তুমি তৎক্ষণাৎ সত্যকার সত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পার; কিন্তু এমনটিও যখন ঘটে তখনও অনুভূতির পূর্ণ মূল্য এবং পূর্ণ ফল পেতে গেলে এক আন্তর গ্রহিষ্ণুতার অবস্থা বজায় রাখা চাই আর তার জন্য প্রতিদিনই অন্তর্মুখী হওয়া অপরিহার্য।*

২৪-১০-৫৮

* Pensées et Aphorismes থেকে অনুবাদ। অনুবাদক : শতদল

মন চল নিজ নিকেতনে

চক্রপাণি চারদিক

মা এক এক সময় দু'হাতে কান চেকে বলতেন, "পৃথিবীটা অনাবশ্যক কথার শব্দে বধির"। এই অপ্রয়োজনীয় কথার তাণ্ডব বেড়েই চলেছে—পৃথিবীতে noise pollution ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। আমরা এই চল্লিশ বছরে পণ্ডিচেরীতেই শব্দতাণ্ডবে পারাস্তরটা বেশ প্রত্যক্ষ করলাম। ৭০ বছর আগে ৩১শে মার্চ শ্রীঅরবিন্দের অনুচর তরুণ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রসঙ্গান্তরে সেই কালের আবহাওয়ার একটি জীবন্ত চিত্র রেখে গিয়েছেন—যেদিন তিনি পণ্ডিচেরীতে প্রথম পদার্পণ করলেন। "রাত তখন প্রায় আড়াইটে, ইঞ্জিন থেকে হুইস্‌লের শব্দ শোনা গেল। তারপর ট্রেনখানির গতিবেগ ধীরে ধীরে মন্দীভূত হতে লাগল। তারপর আরও মন্দ, আরও মন্দ—মন্দ—মন্দতর—মন্দতম হয়ে অবশেষে থেমে পিছনের দিকে এক ধাক্কা লাগিয়ে আবার সামনের দিকে একটু পা বাড়িয়ে ট্রেনখানি একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বোঝা গেল এই ট্রেনটিতে ভ্যাকুয়াম ব্রেকের কোনো বালাই নেই।" অনবদ্য চিত্র। অনুপম এর ভাষা। এ এমন একটি যুগের কথা যখন রাস্তায় নীরবে পুশপুশ চলত—বাস, লরী, অটো, টেম্পো, ট্রাক্টর ইত্যাদি দেখা দেয়নি। মাইকের অবিশ্রাম উৎপাতও শুরু হয় নি। আজ এই বহুবিধ গর্জনের পরিবেশে পাশের লোকের সঙ্গেও চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়।

সেদিন পণ্ডিচেরীতে পদার্পণ করলেই মনে হত যেন কোথায় এসেছি, পৃথিবীর এক প্রান্তে যেন—পার্থক্যটা এতই প্রকট। এখানকার বাড়িঘরের নক্‌সা, লোকজনের চলা-ফেরার মেজাজ (ফরাসীরা ইংরেজের মতো কাঠখোট্টা এবং ব্যস্তসমস্ত মোটেই নয়—তারা বেশ নরম-সরম ঢিলে-ঢালা চালে চলে), খালি পায়ে বা চটি পায়ে পুলিশের ঘোরা-ফেরা, ভোরবেলা ফুলওয়ালাদের 'বুকে বুকে' (bouquet) বলে হাঁক, আর শহরের প্রায় গায়ের উপর সুনীল সমুদ্রের উদার বিস্তার একটা ভিন্ন জগতের চিত্র এঁকে দেয়। হঠাৎ যেন মনে হয় এখানে ছড়িয়ে আছে আশ্চর্য এক নীরবতা, এক গভীর শান্তি, একটা এলিয়ে পড়া অদ্ভুত আরাম। যেন পাওয়া যায় অশরীরী এ রহস্যের স্পর্শ।

পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দের যোগক্ষেত্র—তাঁর সাধনপীঠ; তাঁর সিদ্ধির আসন এই এখানে পাতা। তবে তাঁর সিদ্ধির সুরভি ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে। তাঁর সিদ্ধি একটা নবচেতনার, মানুষের আমূল রূপান্তরের—তাঁর বাণী মানুষী আধারে এক নবজন্মের ও নব জীবনের। মানুষ ক্রমে সেই ধারায় উঠে চলবে—এই তার নিয়তি, প্রকৃতির প্রবেগ এবং নিভৃত প্রয়াসও সেই দিকে। তিনি শুধু পথনির্দেশই করেন নি, দৃষ্টান্ত দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি শুধু আলোকময় অনুপ্রেরণা হয়েই উন্মুখ অভীপ্সুর মানস শিখরে স্পর্শ করেন নি, তিনি প্রত্যক্ষ হন নি তত্ত্বরূপে মাত্র; তাঁর সিদ্ধি ছিল দিব্যবিজ্ঞানকে নিয়ে, একেবারে মূল কায়িক ভিত্তিকে ধরে'—এই মৃন্ময়কে চিন্ময় করে তুলে। তাঁর দেহসত্তা তাই একরকম স্থানকালের শাসন ছাড়িয়ে ছিল—বিশ্বগতই হয়েছিল। এই সূক্ষ্মদেহের স্পর্শটিই

যেন বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়ে ছিল—তা ভাগ্যবান মাত্রেই অনুভব করতে পারতেন, এইটিই যেন গাঢ় হয়ে অনুভবগম্য হত প্রায় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত।"*

আবার পণ্ডিচেরীর বাহিরে সমস্ত পৃথিবীর বিরাট অংশ। অপ্রতিহত সেই বিপুল অংশ এই ভগ্নাংশের একেবারে অন্তরমহলে এসে প্রবেশ করেছে—বাহিরের জগতের প্রতিচ্ছবি দেখছি এখানেই। পুরাতন বিগতের সাক্ষাই হিসাবে কিম্বা বর্তমানের নিন্দুক হিসাবে বলছি না—শুধু বলছি সেকালে-একালে পার্থক্যটা এমনই দুস্তর। সেকাল ছিল ভালো আর আজকাল হল মন্দ? একথা বলাও ঠিক হবে না। অতীত ছিল একরকম—তার প্রয়োজন ও দাবি ছিল একরকম, তা ছিল সিদ্ধির জন্য সাধনা, তার রূপটাই ছিল ভিন্ন রকম—সমষ্টিজীবনের মূর্তিতে পর্যন্ত; বর্তমানকে বলতে পারি সিদ্ধি যা অর্জিত হয়েছে তার প্রয়োগ উদ্যোগ. একেবারে ঘোরতর ঘোরতম জড়ায়তনকে টেনে অধ্যাত্মের মধ্যে তুলে ধরা—কর্কশ কঠিন রূঢ় শব্দ তার অনুসঙ্গ, আলোড়নও যেমন অপরিহার্য। অর্থাৎ সাধককে এখন যেন চলতে হয়েছে সর্বত্র সাধারণ অবস্থার মধ্যে থেকেই।

তবু সেই শান্তির স্বর্গরাজ্য হারিয়ে যায়নি। মরমী বলেছিলেন. The kingdom of heaven is within. লাখ কথার এক কথা। একদা শান্ত পরিবেশে যে অন্তর্লোকের নিমগ্নতা সহজে প্রত্যক্ষ হতো তা আজো তেমনি অব্যাহত—কোলাহলের মধ্যে গভীরতম গহনতমের মধ্যে যদৃচ্ছা ডুব দেবার কৌশলটি আয়ত্ত থাকলেই দেখব সেই আমার শান্তি বাহিরেও ছড়িয়ে আছে, কলরব তাকে কিছুতে ডোবাতে পারে না। আত্মার সূত্রে সেই জ্যোতিরুত্তমের স্মৃতি জাগ্রত চেতনায় ধরে দেখব দশ কিলোমিটার হৃদয়ের অসীম লোকে লক্ষ যোজন ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

* বুলেটিনে মায়ের বাণী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫, পৃঃ ৭৩

সিদ্ক

পীয়ের কর্নেই

পঞ্চম অঙ্ক

শিনেনের গৃহ

প্রথম দৃশ্য
দন রোদ্রিগ, শিনেন

শিনেন। কি, রোদ্রিগ! কোথ্থেকে এ সাহস—আমার সামনে?
যাও! —এতে মানসম্মান যাবে আমার।
দয়া করে ছেড়ে যাও আমাকে।

দন রোদ্রিগ। দেবি, আমি যাচ্ছি মৃত্যুর কাছে,
তবে যাবার আগে শেষ বিদায় জানিয়ে যাই তোমাকে।
যে-প্রেম আমাকে রেখেছে তোমার শাসনের অধীন
তা মৃত্যুর মুখেও আমার সম্ভ্রম আকর্ষণ করছে।

শিনেন। মরতে যাচ্ছ তুমি?

দন রোদ্রিগ। আমার জীবননাশে তুমি যখন তৃপ্ত
সেই মুহূর্ত আমার পুণ্যক্ষণ।

শিনেন। সত্যিই প্রাণ দেবে তুমি?
সাঞ্চো তোমার নির্ভিক হৃদয়কে ভীত করার পাত্র নয়।
কিসে তুমি এত দুর্বল আর সে এত শক্তিমান?
যুদ্ধের আগেই রোদ্রিগের মুখে মৃত্যুর কথা!
যে আমার পিতা ও মুরদের ভয় পায় নি
সে কে এক সাঞ্চোর সঙ্গে লড়তে যাচ্ছে আর হতাশ হচ্ছে!
বীর পুরুষ, সাহস তোমাকে আহলে ত্যাগ করছে?

দন রোদ্রিগ। আমি শান্তির মুখে ছুটছি, যুদ্ধে নয়।
তুমি যখন আমার মরণ চাও তখন বাঁচার আমার কি ইচ্ছা থাকতে পারে?
সাহস আমাকে ছেড়ে যায় নি;
তবে আমার উদাসীন বাহু তোমার যাতে অপছন্দ

তা রক্ষা করবে না।
অগ্নিময় নয়নের উপর একটি আঘাতও আমি হানি নি;
তা শুধু আমার রাজার জন্য।
নিজেকে রক্ষার অবহেলা বিশ্বাসঘাতকতা হতো।
জীবন আমার হৃদয়ের কাছে এমন ঘৃণ্যবস্তু নয়
যে তার দাবি উড়িয়ে দিতে পারি।
এখন প্রশ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র।
বিচার হচ্ছে শুধু একলা আমার।
তুমি দাবি করেছ আমার মৃত্যু;
তোমার রায় মেনে নিলাম,
যদিও দণ্ড দেবে যে-হাত তা হওয়া উচিত ছিল তোমারই।
তবে তোমার হয়ে যে অস্ত্রচালনা করবে
সে তার ইস্পাতফলার প্রত্যুত্তরে কোনো প্রতিঘাত পাবে না।
যে তোমার হয়ে যুদ্ধে নেমেছে তাকে আঘাত করতে পারি না;
তার আঘাত তোমার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত ভাবতেও আমার সুখ।
যেহেতু তার অস্ত্র তোমারই মান রক্ষা করছে
আমার সর্বাঙ্গ থাকবে অরক্ষিত,
তার হাতে তোমারই হাত আমাকে বধ করছে দেখতে দেখতে যাব।

শিমেন। এমন কোনো অন্ধ মূঢ়তা তোমাকে না ভোলায়
যে জীবনের শেষের সঙ্গে গৌরবের শেষ।
যদিও ন্যায়সঙ্গত আমার ক্রোধ অপ্রিয় পথে আমাকে ঠেলছে—
তোমাকে মৃত্যুর মুখে পর্যন্ত অনুসরণ করাচ্ছে,
যদিও সম্মানবোধের দাবি অবশ বাহু ও অবারিত আঘাত,
মনে রেখো তোমার কীর্তির যত গৌরব
লাঞ্ছনা হয়ে দাঁড়াবে যখন মৃত্যুর কাছে পরাজিত তুমি।
কে বিশ্বাস করবে তুমি হাত তোলনি?
আমি প্রিয়, আত্মমর্যাদা আরো বেশি প্রিয়,
নাহলে আমার পিতাও থাকতেন আর থাকত সেই আশা—
সেই এক আঘাতে যা হারানো তাও থাকত
আমাকে তোমার শিমেন বলে ডাকার আশা।
তোমার আকাশছোঁয়া সুনাম এত সস্তা, দুর্বলা, পলকা বানাতে পার না।
বীরত্ব কত বেরকেরই দেখাতে পারে।
হয় তুমি পাবে আরো বেশি আর না হয় আরো কম!
আমাকে দুঃখ দিতেই তুমি বীর হতে পার
আর যখন চাই সাহসী হও তখন সাহস তোমার উবে যায়?

আমার পিতার সাহসকে এমন তাচ্ছিল্য করবে
যে তাঁকে জয় করে একটা দুর্বলের কাছে হারবে?
যাও, মরতে চেওনা, আমার ইচ্ছাকেও পরাজিত করো;
জীবন যদি আর মধুর মনেও না হয়, আত্মমর্যাদা তার দাবি জানাচ্ছে।

ডন রোড্রিগ। কাউন্ট মৃত, পরাজিত মুররা পলায়িত—
গৌরবের দারিদ্যে আমাকে আরো প্রমাণ দিতে হবে?
এখন থেকে আমার যশ সব আত্মরক্ষাকে উপেক্ষা করতে পারে।
কেউ বিশ্বাস করবে না আমার এ-হৃদয় পেছপা হয়,
কী আমার অসাধ্য?
কে বিশ্বাস করবে মান হারিয়ে কিছু প্রিয় আমার থাকতে পারে?
না, ইচ্ছা হয় সন্দেহ করতে পারো,
এই মারাত্মক দ্বন্দ্বে আমার যশ লাভ বারেও না কমেও না।
আমার সাহসকে তুচ্ছ করতে কেউ সাহসী হবে না,
ভাববে না ইচ্ছা করে হার স্বীকার করেছি।
"ও শিমেনকে ভালোবাসত"—বিচারালয় বলবে—
"সে বেঁচে থেকে তার বিরাগ সহ্য করতে পারত না।
অনুসরণকারী নিয়তির নির্মম হাতের কাছে—
শিমেনের প্রতিশোধকামী হাতের কাছে—সে দিয়েছে প্রাণ।
শিমেন নিতে চেয়েছে তার প্রাণ;
তার মহৎ প্রাণের কাছে বেঁচে থাকার প্রয়াস মনে হয়েছে অপমানকর।
পিতার সুনাম বাঁচাতে গিয়ে সে হারাল তার প্রেম;
প্রিয়তমার জন্য বলি দিল তার জীবন;
মুগ্ধ হৃদয়ের যা আশা ছিল তা সত্ত্বেও—
শিমেনের চেয়েও নিজের সম্মান বেশি,
এবং নিজের প্রাণের চেয়েও শিমেনকে বেশি দেখে।"
এইভাবে দেখো এই দ্বন্দ্বে আমার মৃত্যু
তা আমার যশ ম্লান না করে সগৌরবে তুলে ধরবে।
আমার স্বেচ্ছামৃত্যু পাবে এই অন্তর্ভেদী মাহাত্ম্য,
পাবে না জীবন, কিন্তু তোমার ক্ষতিপূরণ দিয়ে।

শিমেন। যেহেতু জীবন এবং সম্মান আমার পক্ষে তুচ্ছ ওকালতি করছে
এবং আমার না-চাওয়া তোমার মৃত্যু ঠেকাতে পারছে না,
রোড্রিগ আমার পুরোনো প্রেম একটু মুখ খুলতে চায়,
পরিবর্তে সাজোর গ্রাস থেকে আমাকে বাঁচাও।
যে ভবিতব্যে নিজে পুরস্কার হয়ে আমি যাকে ঘৃণা করি তার অধিগত হব

তার হাত থেকে রক্ষা করো।
আর বেশি বলতে হবে?
যাও আত্মরক্ষার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা কর,
কন্যার কর্তব্য করা শেষ হয়েছে আমার,
এবার নীরব করে দাও আমার ক্রোধ।
তার পরেও যদি শিমেনের জন্য হৃদয় তোমার উৎসুক থাকে,
বিজয়ী হয়ে
তবে বুঝব বৃথাই তুমি ভালোবাস নি।
এস তবে। একথা বলতে গাল আমার গরম হয়ে উঠছে।

ডন রোদ্রিগ। কোন্ শত্রু এখন আমার দুর্নিবার সাহসকে পাবাতে পারে?
(একাকী) এস এস, নাভার, মরক্কো, কাস্তিল।
এস, আমার দেশের সমবেত বীরত্ব।
সব একত্রে বিরাট দল বেঁধে আমাকে ছুঁড়ে ফেলতে এস।
আমার নিঃসঙ্গ বাহু তোমাদের একত্রিত শক্তির সমান।
এমন মধুর আশার কাছে স্পেনের ফুলটি কি দুর্বল।
আমার শিমেনের জন্য যুদ্ধে নামছি আমি।

দ্বিতীয় দৃশ্য
রাজকুমারীর গৃহ

রাজকুমারী

রাজকুমারী। হে বংশমর্যাদা, আমার প্রেমকে তুমি যে বানিয়েছ অপরাধ
তোমার সতর্কবাণী শুনব,
না হৃদয় আমার, শুনব তোমার মৃদুভাষ
যার কোমল শাসন এই কঠোর অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগায়?
রোদ্রিগ, শুধু যোগ্যতায় তুমি আমার সমান;
কিন্তু রক্ত তোমার তেজী ও নিখাদ হলেও
রাজকীয় শিরা থেকে আসে নি।
দুর্ভাগ্য আমার আলাদা রেখেছে কর্তব্য আর প্রেমকে।
বিরল শৌর্যের প্রতি আনুগত্য কি প্রেমিক চিত্তকে দুর্দশায় শাস্তি দেবেই?
বিপুল প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও যদি না শিখি
প্রেমিককে আলিঙ্গন দিতে কিম্বা প্রেমকে দমাতে
তখন যন্ত্রণা আমার কতখানি।

যুক্তি বলছে আমাকে প্রেম আর আভিজাত্যের মধ্যে বেছে নিতে
যদিও উচ্চ জন্মভাগ্য দাবি করে সিংহাসন
তুমি, রোদ্রিগ, জয় করেছ কত কত রাজা,
তোমার ছত্রছায়ায় সসম্মানে থাকব আমি,
যদিও এখন যে পেয়েছ গৌরবময় উপাধি 'সিদ'
তা স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় কোন রাজ্য শাসন করবে তুমি।
যোগ্য সে আমার কিন্তু ভালোবাসে শিমেনকে :
আমার দাবি ত্যাগে কাতর আমি।
মেয়েটার বাপের মৃত্যু তাদের মধ্যে এতই সামান্য বিরাগ আনে
যে কর্তব্যের খাতিরে তার মৃত্যু চাইলেও সে তাকে ভালোবাসে।
তাইতো তার অপরাধের আর তোমার হা-হুতাশের কোনো ফল নেই।
যেহেতু আমাকে শাস্তি দিতে নিয়তি চায়
দুই শত্রুর মধ্যেও প্রেম থাকুক অটুট।

তৃতীয় দৃশ্য
রাজকুমারী, লেওনোরা

রাজকুমারী। লেওনোরা, তুমি এলে কেন?

লেওনোরা। আপনার প্রশংসা করতে,
অবশেষে আপনি কষ্ট জয় করেছেন
পেয়েছেন বিশ্রাম।

রাজকুমারী। বিশ্রাম?
আশাহীন দুঃখে ভারাক্রান্ত হৃদয় কখন তা পাবে?

লেওনোরা। আশা বাঁচে আশা নিয়েই ; তাছাড়া তার নির্ঘাৎ মৃত্যু।
রোদ্রিগের মূর্তি আর মুছে করতে পারবে না আপনার হৃদয়
এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে জিতুক বা হারুক
সে তার শিকার।
আপনার আশা মৃত, আপনার বিক্ষত হৃদয় সেরে গিয়েছে।

রাজকুমারী। তেমন সবর এখনো কত দূরে।

লেওনোরা। কেন নিজেকে বিদ্রূপ করছেন?

রাজকুমারী। বরং বলো, কেন বারণ করছ আর আশা রাখতে?
হাজার সুবিধাজনক ছুতো বার করতে পারি
এই দ্বন্দ্বের কঠিন শর্ত এড়াবার জন্য।
প্রেম আলিয়ে মারল,
তবু তার কাছেই শিখেছি প্রেমার্তের ছলাকলা প্রয়োগের কৌশল।

লেওনোরা। তাদের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত প্রেমের শিখা
পিতৃহত্যাকেও ছাপিয়ে যায়।
তাহলে, কী করবেন আপনি?
কোনো মারাত্মক ঘৃণা শিমেনের কর্মধারাকে উস্কায় না।
তার দাবি দ্বন্দ্বযুদ্ধ,
কিন্তু সোজা বরণ করবে প্রথম যে তরবারি আনবে তাকে।
রোদ্রিগের সমান পাল্লার বীরত্ব দেখিয়েছে
এমন কোনো বীর যোদ্ধাকে সে বরণ করছে না।
সে-যুবকের তরবারি কখনো ব্যবহৃত হয়নি
তা তার উদ্দেশ্যের সহায়—
সাক্ষ্য তার মনোনীত।
তার শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা তার অপটু অসি।
নামযশহীন, কোনো সুনাম রক্ষার দায় নেই তার;
আর এই একান্ত সহজ মনোনয়ন পরিষ্কার দেখায়
এই যুদ্ধ কেমন কর্তব্যের দুর্বল ছুতো।
রোদ্রিগকে সে দিয়েছে অভ্রান্ত শিকার,
যার ক্ষতিহীন মৃত্যু তার সম্মানের শিরোপা।

রাজকুমারী। বুঝলাম তার অভিসন্ধি,
তবু এই অস্থির চিত্ত শিমেনের প্রতিদ্বন্দ্বী,
আর বিজয়ীর প্রেমাসক্ত।
অসুখী আমি। কী করব এখন?

লেওনোরা। স্মরণ করুণ আপনার অভিজাত জন্মসূত্র।
রাজকন্যা শেষে পিতার প্রজার প্রেমে মজবে?

রাজকুমারী। আমার প্রেম তার লক্ষ্য বদলেছে, শোন তাহলে।
সাধারণ ভদ্রলোক রোদ্রিগকে আর ভালোবাসি না;
না, তা নয়, তা নয়।
আমি ভালোবাসি মহৎ কীর্তির দায়িককে

দুঃসাহসী সিদকে, দু'জন রাজার বিজেতাকে।
তবু আমার প্রেমকে আমি জয় করব;
ভয়ে নয়,
পাছে তাদের মধুর অন্তরঙ্গতার শত্রুতা করে ফেলি তাই।
আমার জন্য যদি রাজমুকুট তাকে নিতে হয়
তাহলেও যে উপহার তাকে একবার দিয়েছি তা ফিরিয়ে নেবনা।
সে তো সন্দেহজনক কোনো যুদ্ধে যায় নি,
সুতরাং অন্য এক সুখের কল্পনা গড়ব আমি।
আমার সকল দুঃখের ভাগীদার
তুমি সাদায্য করো শেষ করতে যা শুরু করেছিলাম।

শিমেনের গৃহ
চতুর্থ দৃশ্য

শিমেন, এলভির

শিমেন। এলভির, বলে যাচ্ছি—বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে!
আমার আছে মাত্র আশা, তবু সবকিছুকে ভয় করি।
যে প্রতিজ্ঞা পারলে ফিরিয়ে নিতাম তা নাগালের বাইরে;
প্রতি ইচ্ছার অনুসরণ করে এক আশু অনুশোচনা।
আমার জন্যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধে ব্রতী,
প্রিয় বিজয়ের মূল্য দেবে আমার অশ্রুধারা।
ভাগ্য আমার মহৎ বাসনা পূর্ণ করবে মনে হলেও
হৃদয়ে আমাকে তবু বহন করতে হবে
পিতার প্রতিশোধ না নেওয়ার অথবা প্রেমিকের মৃত্যুর বেদনা।

এলভির। না, সান্ত্বনার স্বপ্ন দেখুন আপনি।
আপনার প্রেমিক কিম্বা আপনার প্রতিশোধ অনিবার্য।
দৈব যেদিকেই রায় দেবে
আপনার মর্যাদা এবং স্বামীলাভ হবেই।

শিমেন কি। যাকে ঘৃণা করি আর যার নিধন চাই।
আমার পিতার অথবা রোদ্রিগের হত্যাকারী?
একজনেরও জয় আমাকে দেবে প্রিয়ের রক্তে রঞ্জিত পতি।
এই জঘন্য নির্বাচনের বিরুদ্ধে অন্তর আমার বিদ্রোহ জানায়।
মৃত্যুর চেয়ে এই কলঙ্কের সমাপ্তিকে আমার ভয় বেশি।

তাই প্রতিহিংসা, প্রেম, আমার শান্তির বিঘ্ন ঘটায়:
তোমার নিষ্ঠুর মূল্য আর আমি দিতে পারি না।
আমার বিপন্ন ভাগ্যের সর্বশক্তিমান বিধাতা,
এই দ্বন্দ্ব অনিশ্চিতভাবে শেষ করো
কেউ যেন বিজয়ী বা বিজিত না হয়।

এলভির। না, এরকম নির্থক পরিণাম চাইবেন না,
যদি এখনো চান ন্যায়ের কঠিন বিচার,
এখনো যদি গভীর বিরাগ পুষে রেখেছেন,
এখনো আপনার প্রেমিক জীবিত বলে যদি অতৃপ্ত,
এই দ্বন্দ্ব নূতন করে যন্ত্রণা দেবে আপনাকে।
বরং চান তার বীরত্ব তাকে দিক নব নব গৌরব,
আর আপনার অভিযোগ দিক থামিয়ে:
যাতে এখনো শুষ্কার্দ্র নীতিসম্মত এই অসিযুদ্ধ
আপনার দীর্ঘনিঃশ্বাস থামিয়ে হৃদয়ে আনে সান্ত্বনা।

সিমেন। বিজয়ী হলেও তুমি কি ভেবেছ
তার কাছে আমি আত্মদান করব?
কর্তব্য কানার কঠিন, ক্ষতি আমার নিদারুণ।
যুদ্ধের কোনো নীতি, কোনো রাজাদেশ
কন্যার বিবেককে চুপ করাতে পারে না।
যুদ্ধে সহজ বিজয় লাভ করলেও
সিমেন থাকবে অটল হয়ে।

এলভির। সাবধান, ঈশ্বর এই অদ্ভুত বিদ্বেষের জন্য আপনাকে শাস্তি দিতে
আপনারই উপর প্রতিশোধ না নিয়ে বসেন।
কি! এখনো সসম্মানে চুপ থাকার অস্বীকারে
ফিরিয়ে দেবেন সুখের পসরা?
কি অর্থ এই কর্তব্যের? কী তার আশা?
আপনার প্রেমিকের মৃত্যু ফিরিয়ে দেবে আপনার পিতাকে?
দুঃখের এক আঘাতই কি আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়?
চাই কি ক্ষতির পরে ক্ষতি, দুঃখের পরে দুঃখ?
যান, খামখেয়ালিপনায় মন একগুঁয়ে রেখে
আপনি নির্ধারিত প্রেমিককে লাভ করার উপযুক্ত নন।
ঈশ্বরের রোষ তাকে ছিনিয়ে নেবে আপনার হাত থেকে,
আপনি থাকবেন তরুণ সাক্কোর বিধিবদ্ধ পত্নী হয়ে।

শিমেন। এলভির, যে বিধায় কাতর আমার চিত্ত
দয়া করে তাকে অকরুণ ভবিষ্যবাণী দিয়ে গভীরতর ক'রো না।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে উভয়কে এড়াতে পারব;
না পারলে, রোদ্রিগের প্রতি আমার সব অনুরাগ।
এ নয় যে মূঢ় প্রেমে এরকম চালিত আমি,
কিন্তু সাঞ্চোর জন্য পুরস্কার আমি হতে পারি না, পারি না।
সেই ভয় আর সব ভাবনাকে ছাপিয়ে উঠেছে।
সর্বনাশ! এ কী দেখছি; আমি গেছি।

পঞ্চম দৃশ্য

দন সাঞ্চো, শিমেন, এলভির

দন সাঞ্চো। আপনার পদতলে রাখবার জন্য এটা আমারই তরবারি

শিমেন। কি! যা থেকে ঝরছে রোদ্রিগের পবিত্র রক্ত?
বজ্রজাত নচ্ছার! কোন্ সাহসে আমার সামনে মুখ দেখালে
আমারই প্রিয়কে হত্যা করে?
প্রেম আমার, বাঁধ ভেঙে এসো, তোমার ভয় করবার আর কিছু নেই।
পিতার মৃত্যু আর তোমাকে রাশে টানে না
এই দারুণ আঘাতে সম্মান আমার পুনরুদ্ধৃত,
প্রেম আমার মুক্ত, অন্তর আমার হতাশার নিমজ্জিত।

দন সাঞ্চো। শান্ত মনে...

শিমেন। আমার কথা বলছ আমার সঙ্গে!
বীরের হত্যাকারীকে পূজা করি আমি।
দূর হও! বিশ্বাসঘাতক তুমি।
আমি ঠিক জানি তোমার হাতে মুক্ত রণাঙ্গনে সে বীর যোদ্ধার নিধন হয় নি।
আমার কাছে কিছু আশা ক'রো না।
আমার বীর তুমি। আমার মৃত্যু হবে তুমি নির্ঘাৎ।

দন সাঞ্চো। কি আশ্চর্য মায়া! শুনুন আমার কথা, বিনতি করছি।

শিমেন। ভাবছ তোমার ফন্দীও কাহিনী শুনব আমি—
ধৈর্য ধরে সহ্য করব তোমার ঔদ্ধত্য
যা এঁকে দেবে তার পতন, আমার পাপ,
আর সর্বোপরি তোমার প্রতাপ?

রাজবাড়ি
ষষ্ঠ দৃশ্য

দন ফের্নান্দ, দন দিয়েগ, দন আরিয়াস, দন সাঞ্চো, দন আলনসো, শিমেন, এলভির

শিমেন। মহারাজ, যা আমি বৃথাই ঢাকতে চেষ্টা করেছি
তা আর লুকোবার প্রয়োজন নেই।
আমি ভালোবাসতাম; আপনারাও জানতেন:
আমার পিতার জন্য এত প্রিয় শির দিয়েছিলাম মৃত্যুকে।
মহারাজ, আপনি জানেন প্রেম আমি বলি দিয়েছিলাম কর্তব্যের স্বার্থে;
এখন রোদ্রিগ যখন মৃত
আমার হৃদয় নিরন্তর শত্রু থেকে আজ প্রেমিকার রূপান্তরিত।
আমার জীবনদাতার এ প্রতিশোধ প্রাপ্য ছিল:
এখন প্রিয়ের জন্য ফেলতে পারি চোখের জল।
দন সাঞ্চো আমাকে বাঁচাতে এসে ধ্বংস করে,
তার খুনী হাতে পুরস্কার আমি।
দয়া, মহারাজ, দয়া যদি রাজাকে স্পর্শ করে,
তবে কৃপাভরে আমার প্রতি এই দারুণ বিধান ফিরিয়ে নিন!
বিজয়ের পুরস্কার হিসাবে,
যার অন্তে আমার কাছে পৃথিবীতে সব কিছুর অবসান,
আমার যা কিছু আজ সব তারই:
প্রার্থনা করছি, আমাকে কোনো পুণ্য নিরালা কোঠায় চলে যেতে দিন,
সেখানে চোখের জলে দিন কাটিয়ে মৃত্যু আসবে।

দন দিয়েগ। মহারাজ, অন্তরের বাসনা খুলে জানাতে
আর তার কোনো লজ্জা নেই মনে হচ্ছে।

দন ফের্নান্দ। শিমেন, আসল ঘটনা শোনো: তোমার রোদ্রিগ জীবিত।
বীরপুঙ্গবটি পরাজিত হয়েও তোমাকে মিথ্যা বলেছিলেন।

দন সাঞ্চো। উনি চকিত চিন্তায় নিজেকেই প্রতারিত করেছিলেন।
যুদ্ধের ফলাফল জানাতেই আমি গিয়েছিলাম—
ওই চিত্তজয়ী সেই সাহসী বীর
আমাকে নিরস্ত্র করে মহত্তভরে বললেন:
"ভয় নেই, এই যুদ্ধ রেখে দিলাম অমীমাংসিত,
যে হৃদয় শিমেনকে ভালোবাসে তাকে বিদ্ধ না ক'রে।

কর্তব্য আমাকে এই মুহূর্তে ডাকছে রাজসভায়।
তাকে জানিও শেষ সুযোগ—
তার পুরস্কার এই তোমার তরবারি রেখো তার পায়ে।"
আমি তাই করলাম,
আর নিজের তরবারি হাতে ফিরতে দেখে
উনি ভাবলেন আমি বিজয়ী,
তারপর প্রেম ও ক্রোধ হঠাৎ মিশে গেল
উনি এক অসংযত অবস্থায় এলেন,
আমিও শোনাতে পারলাম না আমার কাহিনী।
দ্বন্দ্বে হেরেও আমি পরিতৃপ্ত,
নিজের পরাজয়ও স্বীকার করছি কৃতজ্ঞতাভরে,
যদিও আমি ভালোবাসি এবং হারাচ্ছি আমার প্রেম
তবু মধুর এদের পরিপূর্ণ প্রেমের চরিতার্থতালাভ।

দন ফেরনান্দ। না, নহুহায় তোমার গণ্ড আরক্ত হবার কোনো কারণ নেই ;
আর তোমার প্রেমশিখাকে অস্বীকারের চেষ্টা করো না ।
তোমার বিশ্বস্ত প্রেম অমিত প্রশংসা পাবে
সম্মান তোমার অক্ষুণ্ণ, কন্যার কর্তব্যও সমাধা।
তোমার পিতারও প্রতিশোধ নেওয়া হলো,
নিজের ইচ্ছা পূরাতে
রোদ্রিগের জীবন তুমি বিপন্ন করেছিলে।
তোমারই জন্য তাঁকে বাঁচানো ঈশ্বরেরই বিধান ;
তোমার ভূমিকা তুমি ত্যাগ করনি ;
নাও পুরস্কার ;
আমার সুবিবেচিত আদেশের প্রতি বিদ্রোহী হয়ো না,
তোমার ভালোবাসার বাহুডোরে গ্রহণ কর তোমার প্রিয়তমকে।

সপ্তম দৃশ্য

দন ফেরনান্দ, দন দিয়েগ, দন আরিয়াস, দন রোদ্রিগ, দন আলনসো, দন সাঞ্চো,
রাজকুমারী, শিমেন, লেওনোরা, এলভির

রাজকুমারী। শিমেন, আর কেঁদো না।
তোমার রাজকুমারীর হাত থেকে সানন্দে নাও এই মহৎ বিজয়ীকে।

দন রোদ্রিগ। মহারাজ, অনুগ্রহ চাই যে আপনার,
আপনার সামনে প্রেমের প্রবল দাবি যে লুটায় তার পায়ে—

শিবেন, প্রতিশ্রুত পুরস্কার চাইতে আমি আসি নি,
এলাম আবার আমার জীবন তোমাকে উপহার দিতে।
তোমার জন্য আমার প্রেম কেবল সম্মানের নীতি বা রাজাদেশের বশ নয়।
এখনো যদি তোমার পিতার প্রতিশোধ বাকি থাকে
তাহলে বলে ফেল,
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।
হাজার প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয় করব,
পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তে যাব যুদ্ধ করতে করতে।
একাকী হটাব শত্রুব্যূহ, পর্যুদস্ত করব সেনাবাহিনী,
সেবোপমদের যশ ম্লান করে দেব;
আমার অপরাধ ক্ষালনের জন্য যা করা দরকার
সব আমি চেষ্টা এবং সার্থক করব।
কিন্তু অতৃপ্ত সম্মানের কণ্ঠ যদি এখনো চায় অপরাধী ঘাতকের মৃত্যু
মানুষের শক্তিকে অস্ত্র দিয়ে আমার বিরুদ্ধে পাঠিয়ো না,
তোমার ছাড়া অন্য কারো হাত প্রতিশোধ নিতে পারবে না।
শুধু একটি প্রার্থনা আমার: মৃত্যু শান্তির শেষ এনে দিক;
তোমার প্রিয় স্মৃতি থেকে আমাকে নির্বাসিত করো না।
আমার মৃত্যুতে যান তোমার সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে;
পুরস্কার হিসাবে বাঁচুক আমার স্মৃতি।
তোমার প্রতি আমার প্রেম স্মরণ ক'রে এক সময়ে ব'লো,
"সে প্রাণ দিয়েছে, নিজে কিছুতে কপট হতে পারে নি ব'লে।"

শিবেন। না, রোদ্রিগ, ওঠো।
মহারাজ, আর লুকাতে পারি না হৃদয়ের আবেগ,
তার সব দীর্ঘদিনের বাঁধ ভেঙে বের হয়েছে।
তার মহৎ সব গুণ আমার হৃদয়কে বাধ্য করছে তাকে ভালোবাসতে।
রাজার আদেশ হয়েছে—আনুগত্য তাঁর প্রাপ্য;
তবু, কঠিন রায়ে ভাগ্য আমার বাঁধা হলেও
আপনি কি সস্মিত দৃষ্টিতে অনুমতি দিতে পারেন?
কর্তব্য যদি আমাকে বাধ্য করে আপনার আদেশ শুনতে,
ন্যায়বিচার কি অস্বাভাবিক কাজ সমর্থন করবে?
রাজার প্রতি রোদ্রিগের কর্তব্যপালনের জন্য
অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে?
চিরকাল অনুশোচনার লাঞ্ছনায় ভুগব—
পিতার রক্তে কলঙ্কিত করেছি আমি আমার হাত।

ডন কেরনান্দ। সময় সব বদলে দেয় ;
আজ যা অসঙ্গত পরে তা মনে হয় আইনসঙ্গত ও শুভ।
তোমাকে রোদ্রিগ জয় করেছে—তুমি তার।
আজ তার বীরত্ব ঠিকই পুরস্কার জিতেছে।
তবে যেহেতু রণাঙ্গন থেকে সদ্য সে ফিরে এসেছে
আর তোমারও হৃদয় যখন রয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত
আমাকে মনে হতে পারে তোমার সুযশের শত্রু,
যদি এত তাড়াতাড়ি দিই তার জয়ের পুরস্কার।
আমার আইন বিবাহের বিজম্ভির দিনক্ষণ উল্লেখ করেনি,
আবার বিনম্রও রাজ-ইচ্ছার কোনো অদলবদল দেখায় না।
পুরো একটি বছর তোমার হৃদয়ে এনে দিক শান্তি,
শুকিয়ে কন্যার চোখের জলের ফোয়ারা।
তুমি, বীর যোদ্ধা, রণাঙ্গনে মহৎ কীর্তি তোমার সাধনে :
আমাদের সীমান্তে ম্যুরদের তুমি বধ করেছ,
তাদের ষড়যন্ত্র লণ্ডভণ্ড করেছ, করেছ তাদের আক্রমণ প্রতিহত ;
এখন তাদের দেশেই চালাও যুদ্ধ,
নেতা হও আমার সেনাবাহিনীর, লুণ্ঠন কর তাদের সারা রাজ্য।
'সিন' নাম তাদের হৃদকম্প আনবে ;
তারাই বলেছে—তারাই রাজা মেনে নেবে তোমাকে।
বিশ্রুততাই বীরত্বের মুকুট ;
এই কুমারীর আরো যোগ্য হয়ে ফিরে এসো।
তোমার মহা মহা কীর্তি এত উচ্চকণ্ঠে বলে যেন তোমার হয়ে
যাতে গর্ব ও প্রেম মিলে তাকে তোমার করে দেয়।

ডন রোদ্রিগ। সিমেনকে জয় করতে
এবং আমার রাজার সেবা করতে
বাহু আমার লৌহকল্প এবং অন্তর অগ্নিশিখা সম,
তার দৃষ্টির সামনে অনুপস্থিতি যদিও সহ্য করতে হবে আমাকে
মহারাজ, আপনি যে আশা দেখিয়ে নিরন্তর আনন্দ দিলেন সেজন্য ধন্যবাদ।

ডন কেরনান্দ। আশা রাখ তোমার বীরত্বে আর আশা রাখ আমার প্রতিশ্রুতিতে ;
তার হৃদয় তো তোমার ব'লে ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে,
যে মানসম্মানের প্রশ্ন তোমার বাধা হয়ে আছে
তা জয়ের তার ছেড়ে দাও
সময়, তোমার বীরত্ব আর তোমার রাজার ওপর।

সমালোচনা

"প্রণতি"—কবিতার বই। রচয়িতা—রমেন সেনগুপ্ত। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—তিন টাকা।

একুশটি স্বরচিত কবিতার সংকলন-গ্রন্থ "প্রণতি"। গ্রন্থখানি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী দিবস—১৯৭৮ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আশ্রম-মাতার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ নিবেদিত।

গ্রন্থকার অন্তরের অকৈতব ভক্তির পেলব স্পর্শ দিয়ে কবিতাগুলি রচনা করেছেন। প্রত্যেকটি কবিতাই নির্মাল্যের পবিত্র সুরভিতে সুবাসিত। ভক্তিমূলক হলেও কবিতাগুলি কাব্যসম্পদবিহীন নয়। অমিল ও সমিল এই দুই জাতীয় কবিতাই এই সংকলনের মধ্যে আছে। অমিল কবিতাগুলি কিন্তু গতানুগতিক গদ্য কবিতা নয়। এগুলির মধ্যে ছন্দের অন্তর্নিহিত স্বচ্ছন্দ গতি থাকায় অনায়াস পাঠক্রম ব্যাহত হয় না পরন্তু একটি ধারাবাহিক রসপ্রবাহ মাধুর্য সৃষ্টি করে। শব্দচয়নেও কবির নির্বাচন প্রশংসনীয়। যেমন—

যতবার গাঁথি মালা
প্রসাদী কুসুমে,
ছিঁড়ে যায়
বাসনার দুরন্ত বিস্ফোভে
পলে পলে।
মিথ্যা হয়
শুচিতার সর্ব আয়োজন।
নিষ্ঠুর কঠিন ঘাতে
ছিন্নভিন্ন হয়
জীবনের সব তন্ত্রীগুলি।
আবার গাঁথিয়া তুলি
দুরন্ত চেষ্টায়। (অনন্ত মুহূর্ত)

"পথচলা" একটি সুন্দর রসোত্তীর্ণ কবিতা। স্বরবৃত্ত ছন্দে সংবদ্ধ। কবিতাটিতে হাওড়া থেকে 'পণ্ডিচেরী চলার ছবি' সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে সূক্ষ্ম তুলির টানে, নয়নাভিরাম বর্ণন-বৈচিত্র্যে ও সুপ্রযুক্ত অলঙ্কারের সুষ্ঠু সন্নিবেশে। এই রেলপথযাত্রায় তিনি কবিদৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন—

বনের সবুজ হাতছানি দেয় দূরের পাহাড় বাজায় বাঁশী,
মুক্ত মাঠের অঙ্গনেতে বৃক্ষশিশু বেড়ায় হাসি।

"চিরন্তনী মা" আরেকটি উচ্চশ্রেণীর কবিতা। যখন "প্রলয়পয়োধি উত্তাল হ'লো সৃষ্টি -বেদনা-ভারে", তখন থেকে মহাশক্তির বিভিন্ন ভাববিগ্রহ তিনি কবিতাটিতে রূপায়িত করেছেন। এই কবিতায় কবি দেখিয়েছেন মহেশ্বরী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতী —মায়ের চতুর্বিধ রূপের বাঙ্ময় বিকাশ। মুখ্যত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গাঁথা এই কবিতাটি।

ছন্দোমাধুর্যে, শব্দ-সঙ্করনে, ভাবৈশ্বর্যে এটিও অনবদ্য রচনা। কবি মহাশক্তিসম্পন্না এই চতুর্বিধ মাতৃরূপের সমন্বয় সাধন করেছেন, একটি মাতৃমূর্তির মধ্যে। তাঁর এই মা —"চিরন্তনী মা"। তিনি দেখেছেন—

চারি মূর্তিতে একের প্রকাশ, একে মিলে গেছে চারে,
যুগ যুগ ধরি এই লীলা হয় অভিনীত বারে বারে।
চিরন্তনী সে মা
সাগরবেলার তীর্থভূমিতে চির-মধুময়ী মা।

অন্যান্য কবিতাগুলিও অনিন্দ্যসুন্দর।
'প্রণতি'র কাগজ ছাপা ও প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়।
আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও গ্রন্থখানি বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্বের মর্যাদা পাবার অধিকারী।

—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone : 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta-25

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

রমেন সেনগুপ্তের

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত

প্রণতি

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য : ৩·০০ টাকা

সমীরকান্ত গুপ্তের

কাব্যলোকে

বাংলা কাব্যের মনোজ্ঞ আলোচনা
প্রাচীন থেকে আধুনিক পৌঁছানোর চিত্তাকর্ষক প্রকৃতি-বিশ্লেষণ

মূল্য ৮·০০

Statement about ownership and other particulars about the Quarterly B A R T I K A to be published in the first issue every year after the last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1. Place of Publication:	Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2
2. Periodicity of its publication:	Quarterly
3. Printer's Name:	Amiyo Ranjan Ganguli
Nationality:	Indian
Address:	Sri Aurobindo Ashram Press, Pondy-2
4. Publisher's Name:	H. K. Niyogi
Nationality:	Indian
Address:	Sri Aurobindo Pathamandir, Cal-73
5. Editor's Name:	Nolini Kanta Gupta
Nationality:	Indian
Address:	Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital:	Sri Aurobindo Pathamandir 15, Bankim Chatterjee St., Calcutta-73

I, H. K. Niyogi, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd/-) H. K. Niyogi

Date: 24 April 1980 *Signature of Publisher*

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৯শে নভেম্বর, ১৯৮০)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

উষাহরণ কাব্য	শ্রীঅরবিন্দ	৫
দ্রষ্টা পুরুষ (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দ	১৪
স্বর্গীয় বিভা (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দ	১৫
নতুন উষা (কবিতা)	দেবযানী	১৬
আশ্লেষা (কবিতা)	পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য	১৭
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিময়	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৮
মায়ের আলাপ	...	২২
চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	৩২
সাবিত্রী কাব্যের তাৎপর্য	সুধা বসু	৩৫
যোনা ভানা (নাটক)	মেটারলিঙ্ক	৪৩

'বর্তিকা'র নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগস্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathmandir
15 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

1947

At the very moment when everything seems to go from bad to worse, it is then that we must make a supreme act of faith and know that the Grace will never fail us.

M. [illegible]

উষাহরণ কাব্য

শ্রীঅরবিন্দ

তৃতীয় খণ্ড

(প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়)

সৌরসেন সভাস্থলে সমাসীন আজি
সৌরসেন বৃষ্ণিগণ অদৃষ্টের দিনে
বার্দ্ধক্যে মহিমান্বিত, অন্ধক বিপৃথু
দেবভাগ দেবশর্ম্মা বৎসাবান শিনি
উদ্ধব সুতনু অনমিত্র, মহাবলী,—
যত বৃষ্ণি ভগ্নবল সর্ব্বহর কালে
আর না আস্ফালে ধনু দারুণ সংগ্রামে,
লৌহবক্ষ হতে না বেরোয় সিংহনাদ
শত্রুহৃদি বিদারিতে. ভীম অসিভার
অল্পক্ষণ বহিতে সমর্থ বাহু—তবে
মানসে সবল যেন চতুষ্কোণ দুর্গে
চারিদিক হেরে, তীক্ষ্ণ মৃত্যুঞ্জয় বুদ্ধি,
অতীত প্রদীপ শিখা ঘুরায়ে দর্শায়
পরিণাম আশাভীতি নবযুগ পথে।
প্রাচীন নৃপতি সেথা উগ্রসেন রাজা
পার্শ্বে বাসুদেব শৌরি বৃষ্ণি মহাকায়
আনকদুন্দুভি যোদ্ধা বিখ্যাত জগতে।
মহাভাগ পুত্রদ্বয় বসুদেব পাশে
আসীন রেবতীকান্ত হলধর বলী
অরিসেনা-ক্ষেত্রে চাষী, কৃষ্ণ মহাযশা
উরুকীর্ত্তি নারায়ণ মানব শরীরে।
আসিয়া কহিল কৃষ্ণে জীবন দুয়ারী :
"মহাকায় কেহ দ্বারে, বাসুদেব শৌরি,
কি গুপ্ত বারতা, কৃষ্ণ, কহিবে তোমারে।"
উত্তর করিল তারে কৃষ্ণ মহাযশা :
"সভাগৃহ সমাসীন বৃদ্ধেরা যেথায়
কে গুপ্ত বারত কহে কনীয়ান কর্ণে ?

সভাগৃহে, দৌবারিক, আন বার্ত্তাবহে।
বৃদ্ধ রাষ্ট্রপালবৃন্দে রাষ্ট্রের বারতা
নিবেদে সুমতি দূত। মহীয়ান বৃদ্ধ
শান্ত তার বুদ্ধি। ধীর অটল মানস
গূঢ় বহে মন্ত্রণা।" কহিল দৌবারিক :
"নহে দূত এই যোদ্ধা। ধন্বী মহেষ্বাস
দেবাকৃতি। দেবসম মহৎ কপালে
ভাতে কি নিগূঢ় আভা। দেবসম গতি
যেন পর্ব্বতচারী সিংহের।" সভাদ্বারে
উঠিয়া হেরিল শার্ঙ্গী মহাকায় কেহ
দাঁড়ায়েছে ধন্বী ভীম শরাসন করে।
প্লাবে দ্বারদেশ জ্যোতিঃ, উচ্চশির ঠেকে
তুঙ্গ তোরণাগ্রে, অদিতিনন্দন যন্ত্রী
মানবশরীরে ছন্ন মহৎ দেবতা
যেন বহ্নি অল্প ধূমে। কহিল মাধব :
"কে তুমি যাদবপুরে বার্ত্তাবহ? রথে
উঠিয়া না পদব্রজে লংঘি গিরিমালা
তপ্ত মরুদেশধূলি উড়াইয়া ধাবে
কোন জন্মভূমি ছাড়ি, কি বা বার্ত্তা মুখে
বাহিনে সুদূর পন্থা সমুদ্র-উদ্দেশী?"
আখণ্ডল যন্ত্রী কূকে উত্তর করিল :
"প্রথম কি এ আলাপ হইল মোদের,
গূঢ়জ্ঞানী, বৃন্দাবন কথা ভুলেছ কি তবে
তুমি যেথা মনোহারী দুরন্ত বালক
খেলিতে মধুর হাসি গোপবধূমাঝে?
গোবর্দ্ধন বাল্যকালে হেরিনু দুজনে,
নিবিড় খাণ্ডবারণ্যে আলাপ করিনু
রণের গম্ভীর মৌনে ধন্বী সহ ধন্বী।"
বাসুদেব মহাবণী উত্তর করিল :
"আখণ্ডল ধনুর্দ্ধারী, দেবত্ব আবরি
ছদ্মবেশী যে আইল আত্মগোপনার্থে
চিনেও না চিনে তারে আর্য্যমনা জ্ঞানী।
ছদ্মবেশে পরব্রহ্ম বিরাজে জগতে
বহুভাবে বহুরূপে। অজ্ঞানী মানব
চিনেও না চিনে তারে। ঈশ্বরের খেলা
ভাঙিতে না চাহে। মৃদু চাপা হাসি মুখে

খেলে সঙ্গে। ভবনদী পুলিন বিহারী
রাখে ক্রীড়া নিয়ম অক্ষুণ্ণ।
বাজে বংশী ভবনদী পুলিন সৈকতে
নাচে বামাগণ জ্যোৎস্নাপ্লুত মধুরাত্রী
মর্ত্ত্য পৃথিবীতে এলে, আখণ্ডল বজ্রী।"
আখণ্ডল ধনুর্দ্ধারী উত্তর করিল:
"ধর্ম্ম-রক্ষা-অর্থে, কৃষ্ণ, মহাত্মা অন্যায়
কর্ম্মক্ষেত্র আগে। পাপভার ক্লিষ্টা যবে
দেবী বসুন্ধরা, বাড়ে অধর্ম্ম সর্ব্বত্র,
ধর্ম্ম-অঙ্গে আসে গ্লানি, নারায়ণ বিষ্ণু
অবতরি নরদেহে দুর্জ্জনে বধিয়া
দূর করে মহেশ্বাস ভারতের ভীতি।
উগ্র দৈত্যগণ মধুর দানব দীপে
বহু পরাভবে তপ্ত পুনর্ব্বার শক্তি
জমাইছে। রাজধানী সে সুদূর দেশে
কিন্তু প্রাগজ্যোতিষ, কিন্তু হলা চীনভূমি
মানে ভীম শাসন, তুরুষ্ক করদীন,
চলিছে যবনেশ্বর মহাহ্রদতীরে।
অর্দ্ধভাগ পৃথিবীর ছাইল সে শক্তি
সহায় শম্বর নিত্য দানবপতির,
যোগ দিবে বরবেশে স্কন্দ তারকারি
দানব সম্বন্ধ লোভে। মহান অনর্থ
আর্য্যের দেবের সে বিবাহে। পাঠাইবে
দৈত্যভূমি প্রদ্যুম্ন-দয়িতা অনিরুদ্ধে
চারুস্মিতা দেবী। সহায় বিরিঞ্চি যবে,
হরিবে দৈত্যকুমারী, ভাঙ্গিবে বালক
উগ্রফল এ বিবাহ, নিঃসন্দেহে জানি।
কিন্তু মহাবলী দৈত্য প্রসাদে শম্বুর
কুমার দানবজিৎ রহে পাশে সদা
পরন্তপ ধনুর্দ্ধারী। সাধি বিশ্বহিত
যেন না বিপদে পড়ে চারু অনিরুদ্ধ
অকাল মরণে। ওঠ মহাবলী যোদ্ধা
বাড়ে ঘের, সদা যেন কৃষ্ণ মেঘরাজী
সন্ধ্যার গগনে দৈত্য। ভীমবাহু তার
উচ্চ হিমাচল মাপে প্রকাণ্ড দুদিকে।
শমিলে পারস্যতেজঃ—কদিন বা টিকে

ধর্ম্মচ্যুত—দিবাস্তির পশ্চিম তোরণে
ঘিরিবে অক্ষর শত্রু। শুন আসে কর্ণে
ভীম সিন্ধুনাদ। কাল-সমুদ্র যেমতি
ঘোষিছে ম্লেচ্ছজগত আর্য্যাবর্ত্ত পানে।
গর্জিছে পূরবে দৈত্য ঝটিকার ধ্বনি।
ঘূর্ণবায়ু যেন আসি, যাদব কেশরী,
চূর্ণ কর মেঘবল, উড়াও সে ঝড়ে।
আসন্ন ভবের রাত্রি দেবপ্রিয় দেশে,
সর্ব্বহর সর্ব্বঘাতী কৃতান্ত আসিছে
ক্ষত্রহীন করিতে ভারত। অখণ্ডিত
রৈলে এ ভীষণ শত্রু আর্য্যের দুয়ারে
কে রক্ষা করিবে তবে শূন্য আর্য্যভূমি?"
উত্তর করিল তারে বাসুদেব শৌরি:
"কালের করাল গ্রাসে কে বাঁচে, সুরেশ?
তূরীরবে জয়নাদে আরাব করিয়া
সুবহৎ রাষ্ট্রবৃন্দ বন্য ক্রূরকর্ম্মী
নির্দ্দয় নয়নে অগ্নি, গর্ব্বকথা মুখে,
অহর্নিশি চলিতেছে ধ্বংসপথে বেগী
অশ্ববৎ। আসে কত, যায় কত তবে।
প্রাচীন অসুর কোথা, বাঁধি মহাপুরী
প্রস্তরে লিখিল যারা, লিখি মৃৎপাত্রে
নিজ ইতিহাস, মূঢ়। ভাবিল চিরায়ু
মোরা। বসুন্ধরা ঢাকে সে বিপুল কীর্ত্তি।
সত্যযুগ মানবের পশ্চিম সাগরে
ডুবিয়াছে মহাদ্বীপ। নির্দ্দয় তরঙ্গে
মজিল সভার্য্যপুত্র সুকরুণরূপে
দেবসম সেই জাতি। লুপ্ত মহাযশ
বিস্মৃতির সর্ব্বগ্রাসী ভীম অন্ধকারে।
কত মহাজাতি উঠে প্রাসিতে পৃথিবী;
কত মহাজাতি গেল অনন্ত তিমিরে।
দেখে না অল্পায়ু জেতা। ভাবে আমারেই
বরিয়াছে জগদেব, আমিই অমর,
সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে রহিব চিরায়ু।
কাল জিজ্ঞাসিবে সূর্য্য কোথা সেই বলী।
এক সে পবিত্র জাতি বুঝে-চিনেছে নীলা,
জানে ঈশ্বরের ক্রীড়া সুখদুঃখ সব,

হইয়াছে চিরজীবী। রৌরব-তিমিরে
যদি ফেলে বিশ্বজেতা, দলি লৌহপদে
যদি ভাঙ্গে, যদি পেষে, নির্দ্দয় করিয়া
মনুষ্যত্ব লয় শুষি নিঘৃর্ণ মানসে
পাপের অগাধ পঙ্কে ডুবায় গোলাবে,
মরিবে না তবু। অদ্ভুত সে নরকে
যাইব নামিয়া আমি উদ্ধার করিতে,
যুগে যুগে আর্য্যত্রাতা নারায়ণ জিষ্ণু।
নিশ্চিন্ত চালাও রথ শোণিত নগরে
বাসব। আসিব কৃষ্ণ যদুকুল নেতা,
ঘূর্ণবায়ু যেন ঘোষি দৈত্যবিভীষিকা
চূর্ণ করি উড়াইব পূরব গগনে।"
ফিরিল সভায় পৌরি। দ্বারিকা ত্যজিয়া
ধরিল পর্ব্বত মার্গ আখণ্ডল বজ্রী,
কুয়াশা-বহৎ শৈলে। কুয়াশায় গূঢ়
ধরিল প্রদ্যুম্নপুত্রে বহৎ দেবতা
অর্দ্ধপথে। সুগন্ধিত দেবদারু বনে,
অগাধ কন্দরে ভাসি উঠে দেবরাট
ধাবমান কুয়াশায়, যেন ছায়াপুঞ্জে,
প্রকাণ্ড মায়াবী, হেরি পথিক যাহারে
"অনুসরে মোরে" ভাবে "রাক্ষস ক্রব্যাশী"
কাঁপি নিজ ছায়াতীত আলেমান-দেশে।
দালানে সভাগৃহের ধরিয়া সে শংখ
ভীমনাদী পাঞ্চজন্য বাসুদেব যোদ্ধা
উরু ঘোষী মহানাদে পূরিল নগরী।
শত সিন্ধুধ্বনি যথা ধ্বনিল আহ্বান
পর্ব্বতে প্রান্তরে জলে। চমকি উঠিল
মহতী যাদবপুরী ভবনে দুয়ারে
প্রমোদ-উদ্যানে। উগ্র আয়ুধ সাপাটি
অগণন চক্রঘোষে হুঙ্কারিল ভীমা,
লক্ষপদধ্বনি পথে; লক্ষবহাস্বরা
উরুস্বনা কোটিশিরা, সমুদ্র যেমতি
অযুততরঙ্গস্বর গর্জি যবে আসে
বেলাপানে,—সভাপানে ধাইল নগরী
অসীম আরাবে। উচ্চশৈলে প্রতিধ্বনি
ঘোষিল অরণ্য যথা বায়ু পরিষ্পন্দে।

যমুত বৃহৎ কায়ে সিংহসম নেত্রে
পুরিল বিস্তৃত দীর্ঘ সভাগৃহভূমি।
একপ্রান্তে সমাসীন সভার সম্মুখে
বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ সমরে যা যারা
অগ্রগামী। উগ্রসেন প্রাচীন নৃপতি
সবার মাঝারে শোভে বৃদ্ধ মহাকায়।
নয়নসমক্ষে চারি কৃতান্ত বর্ষিল
কর্ম্মক্ষেত্রে। চারিবার উঠিল হিল্লোলি
পবনে ধরার ধন, হাসিল জননী।
তীক্ষ্ণ অসি ঘুরাইয়া ভীষণ কৃষক
চারিবার কাটে। হেরিয়াছে উগ্রসেন।
উঠিছে পঞ্চবর্ষ্য শ্রান্তিহীন ক্ষেত্রে।
যুগসুখদুঃখ নেত্রে দীর্ঘজীবী রাজা
রহে, যেমতি পারস্যে পুরাতন শিলা
শত মহালিপি বক্ষে, নূতন যুগের
বিস্ময়। দেবের হস্তলিপি অনুমানে
মহিমা-স্তম্ভিত প্রজা, পূজে সেই গিরি।
সমাসীন নৃপপাশে বসুদেব শৌরি
আনকদুন্দুভি যোদ্ধা বিখ্যাত জগতে।
পুত্রপৌত্র চারিধারে, পৌত্রের তনয়
ঘেরে মহীয়ান বৃদ্ধে, কৃষ্ণ বলরাম
গদচারুদেষ্ণ সাম্ব প্রদ্যুম্ন সারণ,—
যেন শৃঙ্গ অগ্রগামী ঘেরা শতশৃঙ্গ'
ভগ্নবল বৃদ্ধ দেহ সর্ব্বহর কালে,
অক্ষত বিরাজে তবু মহিমা সে দেহে,—
প্রাচীন প্রাসাদ যথা উচ্চ যুগজয়ী
পূর্ব্ব-সাম্রাজ্যের চিহ্ন জনহীন পুরে
ভগ্নশির কালে ভগ্নপ্রাচীর। তথাপি
বিস্ময়ে এ কাল হেরি ভাবে: 'কেমন
সে কালের মানবেরা এ পাষাণরাশি
তুলিল গগনে যারা কৃতান্ত না মানি।'
পূজিয়া মহৎ বৃদ্ধে ভক্তিপূর্ণ নেত্রে
প্রতীক্ষা করিল সভা বাসুদেব-উক্তি।
উঠি সভামাঝে ধীরে কৃষ্ণ মহাযশা
তূর্যধ্বনি যেন ঘোষি আয়সের কণ্ঠে
ছাড়িল সিংহবচন সিংহবক্ষ হতে।

"উঠ ওহে সিংহজাতি, সাজ রণবেশে।
আনন্দের বার্ত্তা আজি যাদব-নগরে,
পুনঃ মহাকর্ম্ম এল, দেখায়েছে পুরে
চারুমুখ তার। যদুর সন্ততি মোরা
কত কাল বিনা লক্ষ্যে পচিয়া থাকিব
নিষ্কর্ম্মা আলস্যে? নাহি বাসি' এই অর্থে
রুক্ষোপলা গিরিভূমি, পর্ব্বতের কোলে
নাই স্থাপি এই অর্থে তরঙ্গ রক্ষিতা
দুর্জ্জয় মহতী পুরী মহোদধি তীরে।
অগম্য গিরিগহ্বরে শাবক শাবিকা
রাখি সিংহ বাহিরায় উরুচারী মৃত্যু
যথার্থে ভ্রমিতে। যদু শাবক শাবিকা,
বৃক্ষাগ্রে মধুর নীড়ে মধুর সন্ততি
নিরাপদে রাখিয়া বিশ্ববিচারী পক্ষে
পরহিতে ভ্রমি মোরা। স্বার্থপর শান্তি
ভজিতে নাহি জন্মিনু, ওহে সিংহজাতি।
পরার্থে দ্বারিকাপুরী, পরার্থে আমরা
যদুকুল, পরার্থে জন্মেছি বাসুদেব
দুঃখপূর্ণ ধরাতলে উচ্চ যদুবংশে।
কি হেতু সিংহ-বিক্রম দিয়াছে বিধাতা,
কি ফলে বা অল্পসংখ্য যাদব প্রতাপে
পৃথিবীর সমকক্ষ যদি না পরার্থে
খাটাই সেই বিক্রম। পরার্থেই সৃষ্ট
বাহুবল বুদ্ধিবল প্রতিভা জগতে।
দুর্ব্বল-উদ্ধার, অত্যাচারীর দমন
জন্মভূমি-রক্ষা, এ আমোদ এ বিলাস
নহে গান, নহে নৃত্য যোগ্য যদুকুলে।
বিশ্রামার্থে গান নৃত্য প্রীতি
সৃষ্ট বিক্রমার্থে অঙ্কিত চিরকাল ধনু
কিন্তু চিরদিন কি বিশ্রাম
করিব যাদব হয়ে আলস্যে?
কি নীরস সে দিন যেদিন না করিনু
কোন পরহিত মোরা ক্ষত্রোচিত তেজে।
স্বর্গের দেবতা আজি যাদব নগরে
কহিল এ বার্ত্তা বাণি। শুন রথিগণ,
মধুর দানব দ্বীপে দানব-ঈশ্বর

বাণ মহাবাহু, বাড়ে নিত্য তার কীর্ত্তি।
শাসিছে প্রতাপে ধরা। যত উগ্র জাতি
হিরণ্যকশিপু ভয়ে বিলীত হইল,
বন্ধ চ্যুত পরে, পুণ্য বাণাসুর ভয়ে
ভজে এক ছত্রচ্ছায়ে। প্রাগজ্যোতিষ
চীনভূমি পূর্ব্ববসুন্ধরা আচ্ছাদিল—
মঙ্গল তুরঙ্গ চূন মানে সে অধিপে।
সহায় শঙ্কর নিত্য দানবপতির,
যোগ দিবে বরবেশে রুদ্র তারকারি
বাসুর সম্বন্ধ-প্রার্থী। কহিতে এ বার্ত্তা
স্বর্গের দেবতা আজি নামিল নগরে।
উগ্রবল এ বিবাহ ত্রিদিবে ধরতে।
অতএব পাঠাইলে দানবের ভূমি
তনয়ে প্রদ্যুম্নজায়া। চারু অনিরুদ্ধ
রূপে ভুলাইয়া আনি দৈত্যকন্যারত্নে
গ্রহিবে বালক; বাহু-অতিগ সাধনে
উগ্রবলে হরিয়া বা বোদ্ধা মহাবলী।
কিন্তু পরাক্রান্ত দৈত্য, সহায় শঙ্কর
কুমার দানবজিৎ রহে সদা কাছে
পরন্তপ ধনুর্দ্ধারী। যেন না বিপদে
পড়ে অনিরুদ্ধ বোদ্ধা সুদূর বিদেশে।
অতিশয় অপকীর্ত্তি হইবে মোদের
মরিলে যাদব রথী বিদেশীর ভুজে
হত, যেন অসহায়, যেন হেয় কুলে
তার জন্ম। না সহিব দুর্ব্বল ধর্ষিত,
সবলে কি ডরাইব, কাপুরুষ যথা
বলান্বিত দৈবদোষে অশক্তে যে আস্ফালে
ঘৃণ্য শক্তি? কে মানিবে আর যদুবংশে
অধিপ বসুন্ধরার? বিশেষতঃ দৈত্য
চিরশত্রু আর্য্যের যিনিছে এবে ভূমি
আর্য্যাবর্ত্তপানে যেন কৃষ্ণমেঘরাশী
বাড়ে দৈত্যবিভীষিকা উত্তরে পূরবে।
হিমাচল দুইদিকে মাপে ভীমবাহু।
বাড়ে বহু ম্লেচ্ছ জাতি পশ্চিমে। যেদিন
অল্পায়ু পারস্য তেজ নিবারে যবনে,
নিরাপদ এ দেশের। পরে চারিদিকে

আক্রমণ, চারিদিকে সমুদ্র যেমতি
ঘোষিবে ম্লেচ্ছ জগৎ বিপন্ন ভারতে।
অতএব উঠ সাজ, ওহে সিংহজাতি।
সন্নাহে আবরি দেহ তূণীরব ছাড়ি
বাহিরি যাদব মোরা যুদ্ধ-অগ্নি নেত্রে
চক্রঘোষে সিংহনাদে পূরব-উদ্দেশী।
স্বদেশ-রক্ষার্থে ধর্ম্মরক্ষার্থে বিধাতা
সৃজিয়াছে যুদ্ধ মর্ত্ত্যে। পুনঃ ধর্ম্মযুদ্ধে
মাতি, ওহে যদুগণ। খুল্ল স্বর্গদ্বার,
ডাকিছে অপ্সরাকণ্ঠ বৈজয়ন্ত-মাঝে।"
কহিল মহারা। উরুচারী সিংহনাদে
উত্তর করিল জাতি। এই দিকে কিন্তু
উচ্চচণ্ড যেন উঠি ভ্রূকুটি ললাটে
কহিল নিন্দিয়া কৃষ্ণে হার্দীক সুধন্বী
কৃতবর্ম্মা। "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহব পিপাসু
কতদিন ভীমশ্রমে খাটাবি মোদের
নির্ম্মম সমরে ফেলি? আয়সের পুত্র
নির্ম্মম আয়স তুমি। পুরাকালে সুখী
সুপ্রিয় মথুরাপুরী ভজিতাম মোরা
নদীতীরে। ঝিল্লিকা-নাদিত বনরাজী
মধুর জীবন মেরে, বৃন্দাবন বায়ু
বিতরি মৃদু সৌরভ ভ্রমে মথুরায়,—
যমুনার কলস্বর বিলাসী শ্রবণে
সৌরসেন মহগ্রামে বাসিতাম সুখী।
কে সম্রাট কে বিক্রান্ত বিশাল ভারতে
নাই রাখিনু সে বার্ত্তা, সন্তুষ্ট রহিনু
ক্ষুদ্র সুরক্ষিত জাতি স্বাধীন স্ববলে।*

* পুরাতন অসম্পূর্ণ অসংশোধিত পাণ্ডুলিপির অনুরূপ মুদ্রণ।

দ্রষ্টা পুরুষ

শ্রীঅরবিন্দ

আত্মার নির্জনে শান্তি নিয়েছি, কিছুতে টলব না আর—
তোমারই ভুবন জুড়ে যে-শক্তির খেলা, দেখি তাই চেয়ে ;
অসীম অনন্ত ঘুঁড়ে, তাণ্ডবনৃত্যে এ-শক্তির বিস্তার
নৃত্যহীন অন্ধকূপে সময়ের, চলেছে টগ্‌বগিয়ে।

দারুণ ঘূর্ণিমন্থনে, মৌনমূক যে-শক্তি ঘুরিয়ে মারে
নক্ষত্র ও নীহারিকা তার সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে,
বিরাট সর্পের মত সেই ওঠে অস্তিত্বে কুণ্ডলাকারে—
সুখের মৌক্তিক কণা, দলিত যন্ত্রণা, যুগপৎ আনে।

প্রচ্ছন্ন গভীর কোন অচেতন হতে উদ্ভূত জাগর,
এ-শক্তির উর্ধ্বগতি মানুষের হৃদয়ে, কুণ্ডলাকারে
উদ্ভ্রান্ত ঘুমের কোন সমতলে ছুঁয়ে যায় তারপর
চিরশাশ্বত তলের আশীর্বাদ আর মহিমারে।

এই সব কিছু স'রে যাই, ছুঁতে পারি না, তথাপি আমি
তোমারই ইচ্ছার সর্বব্যাপী রহস্যের শর্ত-অনুগামী।*

অনুবাদ সুনীথ মজুমদার

* মূল কবিতার শিরোনাম : "The Witness Spirit"

স্বর্ণিল বিভা

শ্রীঅরবিন্দ

তোমার স্বর্ণিল বিভা নেমে এল মাথার ভেতর
মন তার ধূসরতা মুছে, সূর্য-স্পর্শে সচকিত ;
প্রজ্ঞার দুর্জ্ঞেয় স্থানে খুঁজে নেয় প্রদীপ্ত উত্তর—
প্রশান্তে প্রোজ্জ্বল, স্বচ্ছ, দ্যুতিময়, অগ্নিশিখা-ধৃত।

তোমার স্বর্ণিল বিভা নেমে এল দুই ওষ্ঠাধরে,
মুখের ভাষায় বেজে ওঠে সুর দিব্যমহিমার—
তোমার জয়ের গাথা আমারই নিজস্ব এক-স্বরে ;
অমরতার অমৃতে সিক্ত আমার শব্দসম্ভার।

তোমার স্বর্ণিল বিভা নেমে এল আমার হৃদয়ে
এ-জীবন ছিন্ন করে নিতে তোমারই শাশ্বত দিকে ;
এখন নিজেই এক মন্দির, বিরাজে তোমাকে নিয়ে—
সকল আবেগ তার কেবল তোমারই অভিমুখে।

তোমার স্বর্ণিল বিভা নেমে এল আমার চরণে ;
আমার ভূলোকে তুমি ক্রীড়ারত তোমারই আসনে।*

অনুবাদ : সুনীথ মজুমদার

* মূল কবিতার শিরোনাম : "The Golden Light"

নতুন উষা

মেহবানী

বর্ষ শেষ হয় ঋতুর চক্রে,
কালের লীলায় আসে নতুন কাল।
শঙ্খ বাজায় সে, অর্ঘ সাজায়,
অমৃতের কলস দীপ্যমান।
কর্ম এগিয়ে চলে বিশ্বকর্মে,
ভক্তি হয়ে ওঠে পরমা ভক্তি,
জ্ঞান ক্রমে ক্রমে মহাপ্রজ্ঞা,
হৃদয় সমুদ্র হয়ে বুক পেতে রয়।
কখনো তরঙ্গ, কখনো নিথর,
তিনটি আলোয় উজ্জ্বল ভবু।
প্রাণ আজ দীপাধার।
তিনটি শিখা শাশ্বতী হয়ে জ্বলে
শক্তি লয়ে
সাবিত্রীর নেত্র হ'তে।
মৃত্যু পরাজিত সে-আলোকবাণে।
অমৃতের সন্তান নিত্যই আসে
তাঁর বক্ষ হতে
প্রেম-সুধা লয়ে।
এ নয় কল্পনা, নয় মায়ার স্বপন!
পৃথিবী দিব্যভূমি,
কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানে
অমৃতের সন্তানেরা সত্যবান হয়।
এ নয় কল্পনা, নয় নিশার স্বপন।
নতুন উষার এ অনির্বাণ আলো।

আস্পৃহা

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

হতবাক গাছটার ভোরে
একটা দমকা হাওয়া ফিস্ ফিস্ করে
আমার কানেও করে দরদী উচ্চারণ :
আস্পৃহা, আস্পৃহা, এ্যাসপিরেশন।
এমনি হাওয়াই একবার
চিকাগোর পাড়ি দিয়ে মাদ্রাজে এসে তোলে
ঝড়ের ঝঙ্কার :
"It is will that is power."
স্বয়ং ঈশ্বর
আস্পৃহায় 'ঐচ্ছৎ' বিশ্ব চরাচর ;
সেই ইচ্ছাময় চাইলেন,
আলো হোক্, তাই আলো হয়।
ঘরের ভেতর
রেডিয়োতে রবীন্দ্রসঙ্গীত মুখর :
"মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে"—
এ কি মিছে ?
রাজারাণীদের ইচ্ছা যদি
হয় মজানদী,
দুরি তিরি ছক্কা পাঞ্জা নির্ভীক চেউ দিচ্ছে,
নতুন সৃষ্টির সেই ইচ্ছে।
জন্মাষ্টমীর কথা দেবকীরা বলতে পারে :
'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।'
গোষ্ঠের কানাইরাও সম্পাত করতে পারে
বীরত্বের ছায়া
"এমন কেন সত্যি হয় না আহা।"
বয়স কি সেই আস্পৃহা চুরি করে ?
দেশ তবে ভরে যাক চির কিশোরে।

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—১৯শ সূক্ত

১। অগ্নিং হোতারং প্র বৃণে মিয়েধে গৃৎসং কবিং বিশ্ববিদমমূরম্।
স নো যক্ষদ্দেবতাতা যজীয়ান্রায়ে বাজায় বনতে মঘানি ॥১॥

অগ্নিম্—অগ্নিকে
হোতারম্—হোতাকে, আহ্বানকারী ঋত্বিককে, উদ্বোধককে
প্র-বৃণে—আমি বরণ করি
মিয়েধে—যজ্ঞে
গৃৎসম্—প্রাজ্ঞ
কবিম্—দ্রষ্টা
বিশ্ববিদম্—সর্ববিৎ, বিশ্ববিৎ, সর্বজ্ঞানী
অমূরম্—অজ্ঞানমুক্ত, অমূঢ়
সঃ—সে
নঃ—আমাদের
যক্ষৎ—যাজন করবে, যজ্ঞ করবে
দেবতাতা—দেবরূপায়ণের জন্য, দেবশক্তিদের গড়ে তুলবার জন্য
যজীয়ান্—যজ্ঞসমর্থ
রায়ে—সম্পদের জন্য
বাজায়—পূর্ণতার জন্য
বনতে—সে জয় করে, লাভ করে
মঘানি—ধনপুঞ্জ

হোতা অগ্নিকে আমি বরণ করি এই যজ্ঞে, প্রাজ্ঞ যিনি, দ্রষ্টা যিনি, সর্বজ্ঞ যিনি, মুক্ত যিনি মূঢ়তা হতে, তিনি আমাদের জন্য যজ্ঞ করেন দেবত্বগঠনের জন্য, যজ্ঞসমর্থ তিনি, তিনি সম্পদের জন্য পরিপূর্ণতার জন্য যাবতীয় ধনরাশি আহরণ করেন ॥১॥

২। প্র তে অগ্নে হবিষ্মতীমিয়র্মচ্ছা সুদ্যুম্নাং রাতিনীং ঘৃতাচীম্।
প্রদক্ষিণিদ্দেবতাতিমুরাণঃ সং রাতিভির্বসুভির্যজ্ঞমশ্রেৎ ॥২॥

প্র-ইয়র্মি—প্রেরণ করি
তে—তোমার
অগ্নে—হে অগ্নি

হবিস্মতীম্—আহুতিপূর্ণ
অচ্ছ—অভিমুখে
সুদ্যুম্নাম্—পূর্ণ দীপ্তিময়
রাতিনীম্—দানশক্তি
ঘৃতাচীম্—তেজোময়
প্র-দক্ষিণিৎ—প্রদক্ষিণ করে
দেব-ত্রাতিম্—দেবত্বগঠন, দেবত্ব-রূপায়ন
উরাণঃ—বিস্তৃত বা বৃহত্তর করে
রাতিভিঃ—দানসহ
বসুভিঃ—সম্পদসহ
যজ্ঞম্—যজ্ঞে
সং-অশ্রেৎ—সম্যক আশ্রয় নিয়েছে

হে অগ্নি, তোমার অভিমুখে আমি প্রেরণ করি এমন এক দানশক্তি যা পূর্ণ আমার আহুতিতে, যা দীপ্তিময়, যা তেজোময়; সে যেন আসে এই যজ্ঞে তাকে প্রদক্ষিণ করে, তার সকল দানসম্পদ নিয়ে দেবশক্তির রূপায়ণকে বৃহত্তর করে।

৩। স তেজীয়সা মনসা ত্বোত উত শিক্ষ স্বপত্যস্য শিক্ষোঃ।
অগ্নে রায়ো নৃতমস্য প্রভূতৌ ভূয়াম তে সুষ্টুতয়শ্চ বয়ঃ ॥৩॥

সঃ—তাই
তেজীয়সা—তেজোময়
মনসা—মনের সহায়ে, মনের দ্বারা
ত্বা-উতঃ—তোমার দ্বারা রক্ষিত
উত—আরও, এখন তবে
সু-অপত্যস্য—সুষ্ঠু সন্ততিদের
শিক্ষোঃ—সেই শিক্ষাধন যা এনে দেয়
অগ্নে—হে অগ্নি
রায়ঃ—সম্পদের
নৃ-তমস্য—পরম দেবশক্তিদের
প্র-ভূতৌ—প্রাচুর্যে পূর্ণ
ভূয়াম—হব আমরা
তে—তোমার
সু-স্তুতয়ঃ—স্তোত্রবলে প্রতিষ্ঠিত করে
চ বয়ম—ধনবান (আমরা)

তুমি আমাকে রক্ষা করেছ তেজোময় মন দিয়ে, আমাদের শিক্ষা দাও তবে সেই শিক্ষা যা নিয়ে আসে সুষ্ঠু সন্ততি, হে অগ্নি, আমরা যেন হয়ে উঠি সম্পদে, পরমদেবত্বে প্রাচুর্যে ধনবান, আমরা যারা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করি আমাদের স্তোত্রবলে ॥৩॥

৪। ভূরীণি হি ত্বে দধিরে অনীকাগ্নে দেবস্য যজ্যবো জনাসঃ
স আ বহ দেবতাতিং যবিষ্ঠো শর্ধো যদদ্য দিব্যং যজাসি ॥৪॥

ভূরীণি—প্রচুর
হি—নিশ্চয়
ত্বে—তোমাতে
দধিরে—প্রতিষ্ঠিত করেছে
অনীকা—শক্তিশিখা
অগ্নে—হে অগ্নি
দেবস্য—দেবতার, দেবশক্তির
যজ্যবঃ—যজ্ঞাকাঙ্ক্ষী, যজ্ঞাভিলাষী
জনাসঃ—জনগণ
সঃ—তাই
আ-বহ—নিয়ে এস
দেব-তাতিম্—দেবত্বের রূপায়ণ, দেবত্ব গঠন
যবিষ্ঠ—হে যুবতম
শর্ধঃ—বাহিনীকে, চমূকে
যৎ—যখন, যবে
অদ্য—আজ
দিব্যম্—দিব্য, দেব
যজাসি—যজ্ঞ কর

বহুল শক্তিশিখা তারা তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে, দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করতে চায় যেসব মানুষেরা, তাই নিয়ে এস তুমি আমাদের কাছে দিব্য রূপায়ণ, হে যুবতম দেবতা, আজ যখন তুমি যজ্ঞ কর দেবচমূর উদ্দেশ্যে ॥৪॥

৫। যত্ত্বা হোতারমনজন্বিরেবে নিষাদয়ন্তো যজথায় দেবাঃ।
স ত্বং নো অগ্নেঽবিতেঽ বোধ্যধি শ্রবাংসি ধেহি নস্তনূষু ॥৫॥

যৎ—যেহেতু
ত্বা—তোমাকে
হোতারম্—হোতারূপে
অনজন্—অভিষিক্ত করেছে
বিরেবে—যজ্ঞে
নি-সাদয়ন্ত—আসনে আসীন করে
যজথায়—যজ্ঞ করবার জন্য
দেবাঃ—দেবতারা
সঃ—তাই

ত্বম্—তুমি
নঃ—আমাদের
অগ্নে—হে অগ্নি
অবিতা—রক্ষক (হয়ে বা রূপে)
ইহ—এখানে
বোধি—জেগে ওঠ
অধি-ধেহি—স্থাপন কর, প্রতিষ্ঠিত কর
শ্রবাংসি—অনুপ্রেরণা সব, দিব্যশ্রুতি সব
নঃ—আমাদের
তনূষু—দেহের মধ্যে

যেহেতু দেবতারা যজ্ঞসাধনার জন্য তোমাকে আসন দিয়েছে, যজ্ঞের হোতারূপে অভিষিক্ত করেছে, তাই তুমি আমাদের রক্ষকরূপে জাগ্রত হও, আমাদের দেহের মধ্যে স্থাপন কর দিব্য অনুপ্রেরণা সব ॥৫॥

মায়ের আলাপ

(Les Bases du Yoga, pp. 118-122, ed. Ashram)

১৬ই মার্চ, ১৯৫৩

(আজ সন্ধ্যার পাঠ সমাপ্ত হল এই লাইনগুলি দিয়ে।)

"...প্রধানত অবচেতনার দরুণই সব কিছুর পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে, কেবল বাইরের দিকটা ছাড়া কোন কিছুই একেবারে বদলায় না। সেই জন্যেই লোকে বলে স্বভাবকে বদলানো যায় না। আর ওই কারণেই সকল কিছুই, যেগুলোর হাত থেকে মানুষ চিরকালের জন্যে মুক্ত হয়েছে বলে আশা করেছিল, সেগুলো অনবরত ফিরে ফিরে আসে...তাছাড়া যে সব জিনিস চেপে রাখা হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়নি, সেগুলো ওই অবচেতন স্তরে ডুবে থাকে এবং যে মুহূর্তে সুযোগ পায় তৎক্ষণাৎ উপরে ঠেলে ওঠে অথবা শস্যের বীজের মতন অঙ্কুরিত হতে থাকে।"

শ্রীমা কিন্তু এর মধ্যে নিরাশ হবার ত কিছু নেই, কারণ যদি কোন আশাই না থাকবে তাহলে কোন দিনই আমরা দেহগত বাহ্য রূপান্তর লাভ করতে পারতাম না।

যাক্, এবার প্রশ্ন ?

প্রশ্ন মা, কি ভাবে প্রাণের এলাকা থেকে কোন কিছুকে বর্জন করতে হয়, যাতে সেটা অবচেতনার মধ্যে গিয়ে ঢুকতে না পারে ?

শ্রীমা আঃ! কোন কিছুকে তুমি চাও না বলেই ঠেলে সরিয়ে দেওয়া, আর তোমার চেতনার অবস্থাকে এমনভাবে বদলে ফেলা, যাতে সেটি তোমার স্বভাবের কাছে সম্পূর্ণ অজানা বস্তু হয়ে ওঠে, এ দুয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। সাধারণত, কেউ যখন অভ্যাসগত এমন একটা কিছু করে থাকে, যেটা সে অন্তর থেকে করতে চায়না, সে তখন সেটাকে তাড়িয়ে দেয় অথবা ঠেলে সরিয়ে দেয়। কিন্তু তার নিজের ভিতর কোন্ জিনিসটা ওই অভ্যাসটিকে বা বিশেষ ওই ঝোঁকটিকে আশকারা দিয়ে এসেছে, এবং তখন পর্যন্ত তাকে সায় দিয়ে চলেছে, সেটা সে লক্ষ্য করতে মোটেই চেষ্টা করে না। চেতনার মধ্যে কোথায় একটা চাকচাক গুড়গুড় ভাব আছে যার দরুণ ওই জিনিসটা আবার চেতনার মধ্যে ঢুকে পড়ার সামর্থ্য লাভ করে সেটা সে দেখতে চায় না। কিন্তু সেটাকে বকা-ঝকা না করে বা জোর করে তাড়িয়ে না দিয়ে যদি তোমার প্রাণময় চেতনার মধ্যে গভীরে তলিয়ে যাও, আর যদি সেই পৃষ্ঠপোষকতাটিকে খুঁজে পাও, অর্থাৎ সেটি বিশেষ একরকমের ক্ষুদ্র স্পন্দনের মতো কিছু, যেটা সত্তার গভীরে, এক কোণে ঢুকে গেছে, সেটিকে যদি খুঁজে বের কর, (প্রায়ই তা এতই অন্ধকারময় এক কোণে লুকিয়ে থাকে যে সেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর, কিন্তু যদি শিকারীর মতন সন্ধানে বেরিয়ে পড়, অর্থাৎ অন্তর্মুখী হয়ে একনিবিষ্ট হয়ে, বস্তুটিকে একেবারে তার উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত অনুসরণ কর, তাহলে দেখতে পাবে, সাপের মতন কুণ্ডলী

পাকিয়ে একটা কিছু রয়েছে। কখন কখন তা খুবই ছোট্ট, একটা বটরের দানার চেয়ে বড় নয়, কিন্তু অত্যন্ত কালো এবং ভীষণভাবে আঁকড়ে রয়েছে।

এরপর দুটি উপায় আছে : হয়, এমন একটা তীব্র আলো তার উপর ফেলা, যা হল সত্যের চেতনার আলো, এতই তীব্র তার জ্যোতি, যে তার তেজে ও বস্তুটি একেবারে গলে যাবে। আর তা নয়ত, তাকে চিমটে দিয়ে টিপে ধরার মতো করে তার সেই গোপন জায়গা থেকে টেনে বের করে এনে, তোমার চেতনার সামনে অর্পণ করা। প্রথম উপায়টি হল একেবারে মৌলিক, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের উপায়। কিন্তু সর্বদাই মানুষের পক্ষে এই সত্যের জ্যোতিকে অধিকার করা সম্ভব নয়, তাই ওটিকে সর্বদা প্রয়োগ করা যায় না। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অবলম্বন করা যায় বটে, কিন্তু তাতে দারুন কষ্ট হয়, একটা দাঁতকে উপড়ে ফেললে যে পরিমাণে যন্ত্রণা হয়, এও সেই রকম। জানিনা তোমাদের কারুর কখন দাঁত তুলে ফেলতে হয়েছে কি না। কিন্তু ওতে যে ভীষণ কষ্ট হয়, এ-ও সেই রকম। এই খানটাতে ভীষণ লাগে (বলে, মা বুকের মাঝখানটাতে আঙুল দিয়ে দেখালেন, এবং একটা সংকোচনের ভাব করলেন)। আর সাধারণত মানুষের সাহস বড়ই কম। যখন ভীষণ লাগে, কষ্ট হয়, তখন সে এইভাবে এড়াতে চেষ্টা করে (মা ভঙ্গি করে দেখালেন), আর সেই জন্যেই ওই জিনিসগুলো মানুষের মধ্যে অনন্তকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু যার সাহস আছে, সে, যত কষ্টই হোক, ওটাকে চেপে ধরে টেনে বের করে, নিজের সামনে এনে ধরতে পারে, এইভাবে সামনে ধরবে, (ভঙ্গি করে দেখালেন), যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ এবং সেটাকে গলিয়ে বিলীন করছ, তারপর সব শেষ। আর কখন ওটা অবচেতনার মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে না এবং তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না। এহল একেবারে চিরকালের মতো ব্যাধিমুক্ত হবার জন্যে অস্ত্রচিকিৎসার ব্যাপারের মতো। এটিকেও ঠিক অস্ত্রচিকিৎসার মতো করে করতে হবে।

প্রথমত খুঁজে বের করতে চাইলে, অতিমাত্রায় অধ্যবসায়ী হতে হবে, লেগে থাকতে হবে। কারণ সাধারণত কেউ যখন এগুলোকে খুঁজে বের করতে আরম্ভ করে, তখন তার মন এসে মধ্যস্থতা করে হাজারটা চমৎকার যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে তোমার অনুসন্ধান করার কোনই দরকার নেই। মন তোমাকে বলবে, "না না, কোন দরকার নেই, এতে তোমার কোনই দোষ নেই। ব্যাপারটা হল এই, ব্যাপারটা হল তাই, এ হল যত ঘটনাচক্রের ফল, ওই সব যত বাজে লোকের কাণ্ড, ও সব বাইরে থেকে এসেছে। এই ধরণের যত রকমের অপূর্ব সব কৈফিয়ৎ, আর তার ফল হবে এই যে, তোমার আত্ম-আবিষ্কারের সংকল্পটি যদি খুব সুদৃঢ় না হয়, তাহলে তুমি আল্‌গা দিয়ে বসবে, আর তাহলেই সব শেষ। কিছুদিন পরেই আবার সব কিছু নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। যত সব বাজে প্রেরণা বা বদ খেয়াল যেগুলো তুমি চাওনি, যে সব বদভ্যাস তুমি পছন্দ কর না, সব আবার ফিরে আসে, তখন আবার নতুন করে আবিষ্কারের কাজ শুরু করতে হয়, যতদিন পর্যন্ত না তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হচ্ছ যে তুমি অস্ত্রোপচার করবেই। অস্ত্রোপচার একবার করতে পারলেই আপদের শান্তি। তখন তুমি একেবারে ব্যাধিমুক্ত। কিন্তু যে কথা বললাম, মনের যত কৈফিয়তে কান দেবে না, কারণ প্রতিবার সে বলবে, "হ্যাঁ, জানি জানি, আগের আগের বেলায় আমার দোষ ছিল বটে, কিন্তু এবার সত্যি বলছি, একেবারে দিব্যি করে বলছি, আমার কোন দোষ নেই, আমি একে-

বারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।" এ কথায় কান দিয়েছ কি সব গেল, আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। অবচেতনা ত সাবধানেই রয়েছে, রিপুটি তার মধ্যে ডুব দিয়ে, দিব্যি আরামে নিচে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে, আর প্রথম যে দিনটিতে তুমি অন্যমনস্ক থাকবে, সে খপ্ করে ঠেলে উঠে সুদীর্ঘকাল থেকে যেতে পারে। আমি এমন সব লোকেদের জানি যাদের পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল, কারণ ঠিক ঠিক যা করা চাই তার জন্যে একটি বারও তারা সংকল্প চ্যুত করেনি।

হ্যাঁ, সত্যিই খুব লাগে, বেশ একটু কষ্ট বোধহয়, কিন্তু হলেই বা, তারপরেই ত সব শেষ।

বাঃ,...কারুর আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই? তোমার...? না? তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? তোমার?

প্রশ্ন : আমার জিজ্ঞাস্যটা আজকের পাঠ্যাংশের বাইরে।

শ্রীমা : পাঠ্যাংশের বাইরের? কিন্তু আজকের পাঠ্যাংশের মধ্যে ত সব কিছুই পড়ে। তাহলে কি করে তা এ বিষয়ের বাইরে হতে পারে? লোকে বলে অবচেতনা বিশ্বব্যাপী।

প্রশ্ন : যা, কেউ যখন এখানে রয়েছে, এবং পূর্ণযোগ অনুসরণ করছে, আমি বলছি, এখানে...

শ্রীমা : "এখানে রয়েছে," তার মানে, "আশ্রমে", না-কি "এই ক্লাসে"? না।

(সকলের উচ্চহাস্য)

প্রশ্ন ক্লাসে এবং আশ্রমেও।

শ্রীমা : বেশ কথা। তারপর?

প্রশ্ন : এটা কি নিশ্চিত যে, পরের জীবনেও আমরা এখানে আসব বা আশ্রমে থাকব? অথবা অন্য অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্যে অন্যত্র যাব?

শ্রীমা : সেটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপর। প্রথমত, পরের বারের জীবন বলতে, তুমি কি বলতে চাইছ? যে যে সব লোক দেহত্যাগ করেছে এবং আর একটি দেহ গ্রহণ করবে?

প্রশ্ন : আজ্ঞা হ্যাঁ।

শ্রীমা : কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে, যে অবস্থায় তারা মারা গেছে তার উপর, তাদের শেষ শুভইচ্ছার উপর, আর তাদের চৈত্যপুরুষের সংকল্পের উপর। এ জোর, অচালিত বা জোর করে বাধ্য করার ব্যাপার নয়। প্রত্যেকের বেলাতেই এ স্বতন্ত্র।

আরো আমি তোমাদের অনেকবার বলেছি যে, মৃত্যুর পরে মানুষটার অদৃষ্ট কি রকমের হবে, তা সাধারণত সেটার জন্যে তার শেষ অবস্থায় চেতনা কি রকম ছিল, সেটার মূল্য সব চেয়ে বেশী। অর্থাৎ, মানুষটার মৃত্যুর সময় যদি তার অন্তরে এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে যে সে আবার ফিরে এসে তার আরব্ধকর্মে যোগদান করবে, তাহলে অবস্থাগুলো সেই ভাবে গড়ে

উঠবে, যাতে তেমনটা সম্ভব হয়। কিন্তু মৃত্যুর পরে যেটা ঘটে, তার জন্যে, আবার সকল রকমের সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ কেউ আছে যারা চৈত্যপুরুষের মধ্যে ফিরে আসে। আমি তোমাদের আগে বলেছি যে, বাহ্যসত্তা নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবে, এমন ঘটনা অতিশয় বিরল। তাই আমরা চৈত্যপুরুষের সম্বন্ধেই আলোচনা করব, যেহেতু সে সর্বদাই টিঁকে থাকে। আবার এমন অনেকে আছে, যাদের চৈত্যপুরুষ চৈত্যরাজ্যে ফিরে যায়, যে অভিজ্ঞতা তাদের এ জীবনে হয়েছিল সেগুলোকে পরিপাক করবার জন্যে এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে তৈরী করবার জন্যে ফিরে যায়। তাতে কয়েক শতাব্দী কেটে যেতে পারে, সেটা লোকেদের উপর নির্ভর করে।

যে চৈত্যপুরুষ যত বেশী বিকাশলাভ করেছে, যত বেশী সে তার পূর্ণ পরিণতির জন্যে তৈরী হয়েছে, তার পুনর্জন্মের জন্যে তত বেশী সময় লাগে। এমন সব সত্তা আছে, যারা হাজার দু'হাজার বছর পরে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

যে চৈত্যপুরুষের বিকাশ যত বেশী প্রাথমিক হয়, তার পুনর্জন্ম তত শীঘ্র ঘটে। এমন কি অনেক সময় ত খুবই নিম্নস্তরে, যখন সে প্রায় পশুর জীবনের কাছাকাছি হয়, সেটা ঠিক ওই রকম হয় (ইঙ্গিতে দেখালেন) অর্থাৎ এমনটা মোটেই বিরল নয় যে, লোকেরা তাদের নাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করল। ব্যাপারটা ওই রকমের বা কতকটা ওই রকমের, অথবা তার পরের পুরুষে জন্মগ্রহণ করল। তবে সর্বদাই সেটা হল ক্রমবিবর্তনের অতি আদিম পর্যায়ের ব্যাপার। যার চৈত্যপুরুষ তখন খুব সচেতন হয়ে ওঠে নি ; সবে তখন আকার নিতে আরম্ভ করেছে। যে পরিমাণে সে বেশী করে পরিণতি লাভ করতে থাকবে, ততই তার পুনর্জন্ম গ্রহণ অনেক পিছিয়ে যাবে, যে কথা আগে বললাম। যখন চৈত্যপুরুষ পূর্ণ পরিণতি লাভ করে, যখন তাকে আর তার বিকাশের জন্যে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে না, তখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে যদি বিবেচনা করে যে তার কাজ অন্যত্র, তাহলে সে পৃথিবীতে না আসতেও পারে, অথবা সে যদি চায়, তাহলে পুনর্জন্ম গ্রহণ না করে সে সম্পূর্ণ চৈত্যচেতনাতেও বাস করতে পারে। অথবা, আবার যখন ইচ্ছা হবে আসতে পারে, যেমন ভাবে ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা, সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে থাকতে পারে। এমন কোন কোন চৈত্যপুরুষ আছে যারা বিশ্বশক্তিদের সঙ্গে সংযুক্ত, কেউ কেউ আবার অধিমানসের সূক্ষ্ম সত্তাদের সঙ্গে অথবা অন্যত্র অন্যত্র সংযুক্ত। তারা অনুক্ষণ পার্থিব আবহাওয়াতে বিরাজ করে এবং তাদের কাজের জন্য একের পর আর, দেহ অবলম্বন করে। তার ফলে, চৈত্যপুরুষ যে মুহূর্তে পূর্ণ বিকশিত, এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে উঠবে,—একবার পূর্ণ পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে থাকে—যখন তার যা, ইচ্ছা সে তাই করতে পারে, সেটা নির্ভর করে, সে কি চায় তার উপর। সেই জন্যেই সঠিক বলা যায় না এটা এই রকম হবে বা ওইরকম হবে। সে যা চায় ঠিক সেটাই করে, এমনকি সে দেহত্যাগ করবার মুহূর্তে ঘোষণা পর্যন্ত করতে পারে (তেমনটা ঘটেছে), কোথায় সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে এবং যা করবে তার জন্যে এখন থেকেই ঠিক করে রাখে। কিন্তু এমন পরিণত অবস্থা লাভ করা খুব সাধারণ নয়—চৈত্যপুরুষ কি পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছে তার উপর, এবং সত্তার সর্বাঙ্গীণ চেতনা যে আধারকে রূপ দিয়েছে তার উপর সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এ ছাড়াও আবার মনের, প্রাণের এবং

দেহের চেতনা রয়েছে, যেগুলি চৈত্যচেতনার সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে। মানুষটা যখন দেহত্যাগ করে, সেই সময় চৈত্যপুরুষ একটা আশা বা একটা অভীপ্সা অথবা একটা সংকল্পকে রূপ দিয়ে গড়ে, আর সাধারণত সেটাই ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয় স্থির করে।

তাই, "কি ঘটছে? এবং কি করা উচিত?"—এভাবে প্রশ্ন করা চলে না। যা কিছুই সম্ভব তা ঘটেছে এবং সব কিছুই করা যেতে পারে।

প্রত্যেকেরই নিজের মনে একটি বিশেষ সমস্যা আছে। সে সাধারণভাবে প্রশ্ন করে। কিন্তু তার মনের মধ্যে প্রশ্নটির বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। তাই কেউ ওসব প্রকাশ্য ভাবে আলোচনা করে না।

(মা পবিত্রর দিকে তাকিয়ে বললেন) পবিত্র, তোমার কোন প্রশ্ন আছে? (পবিত্র উত্তর দিল, নেই) আঃ! বড়ই আকসোসের কথা!

প্রশ্ন : মা, এখানে লেখা রয়েছে, "সত্যের আলো সর্বদাই মানুষের অধিকারে থাকে না—"

শ্রীমা আলো সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু মানুষ সর্বদা তাকে ব্যবহার করতে পারে না।

প্রশ্ন : কিন্তু যদি...

শ্রীমা সত্যের জ্যোতি অনুক্ষণ বর্তমান এবং সর্বত্র তা রয়েছে, কিন্তু তা তোমার আয়ত্তের মধ্যে নেই, এই অর্থে যে, তুমি তা ব্যবহার করতে জান না।

প্রশ্ন : কিন্তু তোমার কাছে গিয়ে যদি চাওয়া যায়?

শ্রীমা আঃ। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা উচিত নয়। স্বভাবতই, তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, "আমার কি করা উচিত?" তোমাদের মধ্যে যে কেউই সে প্রশ্ন করতে পার,—আর আমি তোমাদের বলব, "বাছারা, সেটা অত্যন্ত সোজা,—কেবল আমাকে ডাকবে, তারপর যখন সংযোগটা অনুভব করবে, তখন সেটাকে মাথার উপরে রাখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অংশটি বুঝতে পেরেছে।"

কিন্তু সে ক্ষেত্রেও, জেনে রাখতে হবে যে, বেশ একটু কষ্ট হয়, তোমাদের আগে থেকেই বলে রাখছি। কারণ সে বস্তু কোন এক জায়গায় আঁটা আছে, তাকে সেখান থেকে স্থানচ্যুত করতে সাহসের দরকার। আর যখন তার উপর সত্যের আলো প্রয়োগ কর, তখন জ্বালা করে, এক এক সময় ত পুড়ে যায়, সেটাকে সহ্য করতে জানা চাই। তার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে অকপট হওয়া দরকার...এই ভাবে, নিজেকে গুটিয়ে রেখে, "ওঃ! ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, বড্ড লাগছে" না বলে, নিজেকে সম্পূর্ণ উদার ব্যাপক ভাবে খুলে ধরতে হবে, এবং পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে হবে।

কেউ কেউ আছে যাদের মাথার মধ্যে ওই রকম ছোটখাট কালো কালো জিনিস আছে। কারুর কারুর আবার এই খানটাতে আছে (মা হৃৎকেন্দ্র ইঙ্গিত করলেন), কারুর কারুর আছে আরও নিচে। প্রত্যেকের বেলাতেই সেটা নির্ভর করে, কিন্তু প্রত্যেকের বেলাতেই সেই একই বস্তু, সর্বদাই। আমার একথা বলার কারণ হল এই যে, ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত,

যদি কেউ একাজ করে—সে যে কেউই হোক—ফল একই হবে, বললাম, সেটা মাথার মুকে বা চেতনার সকল কেন্দ্রে, যেখানেই হোক, যদি আবিষ্কারের কাজটি কেউ বহুদূর পর্যন্ত করে চলে, একটু একটু করে এগিয়ে, ক্রমশ আরও এগিয়ে অবিরামধারে যত্নান্ত ভাবে করে চলে, তাহলে সর্বদাই একটি জিনিসের কাছে গিয়ে পৌঁছবে, দূর থেকে তাকে দেখে একটি ছোট্ট মটরের দানার মতো বোধ হয়...ছোট ছোট কলাইয়ের দানার মতন...কালো দানার মতন। কিন্তু যদি খুব কাছ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পার (তোমার একাগ্রতা কি পরিমাণে তার উপর সেটা নির্ভর করে) তাহলে লক্ষ্য করবে ওটা হল একটি পরমাণুর আকারের ক্ষুদ্রতম সাপ নিজেকে ঘিরে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। তখন তুমি তার ল্যাজটা ধরে টেনে বের করতে থাক।

প্রশ্ন : মা, যত রকমের অসৎ-বৃত্তি আছে তত রকমের সাপও কি আছে?

শ্রীমা : আছেই ত! (সকলের হাস্য), প্রচুর আছে, একেবারে একটি পুরো সৈন্য-বাহিনী আছে। যখন মাথায় থাকে তখন বড়ই বিরক্তিকর হয়, কারণ সেগুলোকে খুঁজে বের করা আরও কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া, মানুষের মাথাটি এত বেশী ভুল ধারণায় ভর্তি যে সেখানে গুছিয়ে একটা সুব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন। যেখানে ওটাকে খুঁজে পাওয়া এবং সরিয়ে ফেলা সব চেয়ে বেশী সহজ, তা হল এই খানটাতে (মা বুকের মাঝখানটা নির্দেশ করলেন), কিন্তু ওখানটাতেই ওটা সবচেয়ে বেশী কষ্ট দেয়। তাহলেও আবার ওখানটাতেই ওটাকে খুব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়, আর সম্পূর্ণ আরোগ্য করা যায়। আরও নিচে, প্রাণের রাজ্যে ওটা আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিশৃঙ্খল—অত্যন্ত তালগোল পাকিয়ে আছে। সংখ্যায় তারা অনেক,—যখন থাকে তখন তারা একসঙ্গে অনেকই থাকে। সব বিশৃঙ্খল হয়ে মিলে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে রয়েছে। আগে সেগুলোর মাঝে একটা শৃঙ্খলা এনে তারপর খুঁজে বের করতে হবে। কতকগুলো এইভাবে একের সঙ্গে আর জড়া-জড়ি করে রয়েছে। (অঙ্গভঙ্গি করে দেখালেন) যেমন ধর, অনেকে আছে যারা রাগটা একটুতেই ফোঁস করে রেগে ওঠা তাদের স্বভাব—সাংঘাতিক ভাবে রেগে একেবারে আগুন হয়ে ওঠে,—আর ঠিক ওই জায়গাটাতেই ওর কারণটা খুঁজতে হবে। সেখানেই ওটা একেবারে তালগোল পাকিয়ে মিশে আছে, খুব তাড়াতাড়ি গভীরে চলে যেতে হবে, কারণ ওটা বন্যার বেগে নিমেষে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর একবার ছড়িয়ে পড়লে তখন একেবারে কালো ধোঁয়ার মতন ঠেলে উঠে চেতনাকে ভারী করে তোলে, তখন মানুষটার ভিতরটা ঠাণ্ডা করা, সেখানে শৃঙ্খলা বিধান করা, অতিমাত্রায় কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেই টের পেলে যে রাগের আগুন এইবার ঠেলে উঠল বলে, তখন নিমেষেই যদি প্রাণের কেন্দ্রে, ওই জায়গাটাতে, চলে যেতে পার, আর সঙ্গে একটা ভাল চশমা দিয়ে যাবে, যাতে ভাল করে দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে সেই কোনটিকে ঠিক আবিষ্কার করতে পারবে। আর যেই খুঁজে পেলে, অমনি খপ্ করে, এইভাবে সেটিকে ধরে ফেলবে, তা হলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, একটি কথাও মুখফুটে বের করবার আগে রাগটা পড়ে যাবে। এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই আমি তোমাদের দিলাম, এমন আরও কত শত আছে। স্পর্শকাতরতা, আঁতে-ঘা লাগা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা....উত্তেজনা বটেই, তবে অবশ্য নিছক বাস্তব

উত্তেজনা নয় : আমি বলতে চাই (অবশ্য শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না, কারণ শব্দটা হল হাস্যকর অনুকরণ) লোকে যাকে বলে "ভালবাসা"—এই সবের সঙ্গে জড়িত যা কিছু, যত রকমের আসক্তি যত রকমের ভাবপ্রবণতা সমস্ত কিছুরই বাসা ওইখানে।

প্রশ্ন : আর মাথার মধ্যে ?

শ্রীমা : আ। মাথার মধ্যে যত রকমের বিকৃত চিন্তার, যত কিছু বিশ্বাসঘাতকতা—কত রকমের প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা যে আছে, তা আর বলবার নয়। মানুষ এত ঘন-ঘন তার মাথার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং নাছোড়বান্দা হয়ে, এত রকমের করে, সত্যিই তা ভয়াবহ—সব রকমের মীমাংসা, দৃষ্টিভঙ্গী, অনুকূল যত কৈফিয়ৎ, যুক্তি প্রভৃতি, যে বিষয়ে আগেই বললাম, তাছাড়া নিন্দা, সমালোচনা করার অভ্যাস—যখন কোন সুযুক্তির, সুবিবেচনার কথা কিছু বলা হয়,—যেগুলো শুনলে তোমার দোষত্রুটিগুলো ধরা পড়বে বলে সেগুলো তুমি শুনতে চাও না তখন এই অভ্যাসটি প্রকাশ পায়, তৎক্ষণাৎ তোমার স্বপক্ষের যুক্তি, কৈফিয়তের অবতারণা করা, অপরের ধারণার বা চিন্তার তীব্র প্রতিবাদ করা, অথবা এমন সব লোকও আছে যারা সেগুলোকে ঠাট্টা বিদ্রূপে পরিণত করে, কেউ কেউ আবার সে গুলোর বিরুদ্ধে উল্টে আর একটা ধারণা বা যে কোন একটা সাধারণ বিতর্ক পেশ করে। মানুষের মাথার মধ্যে, যে কি বাজারই আছে তা কল্পনাও করতে পারবে না। সাংঘাতিক রকমের কিছু এটা। ভিতরে কত কি যে ঘটছে তা যদি বাস্তব দিক থেকে লক্ষ্য কর, তাহলে সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে যাবে—সেখানে শৃঙ্খলা বিধানের আগে, পরিষ্কারভাবে দেখা, সব কিছুকে গুছিয়ে রাখা, দুটি পরস্পরবিরোধী ধারণা বা ভাব, সমান্তরালভাবে পাশাপাশি যেতে পারে না।

আমি এমন প্রচুর লোককে জানি, যারা মাথার মধ্যে পরস্পরবিরোধী নানা ভাবকে পুষে রেখেছে, সেগুলো সমন্বয়ের আকারে সাজানো গোছানো নেই—তাদের কাছে সমন্বয় করবার প্রশ্নই ওঠে না,—কিন্তু এমন সব জিনিস যা মারাত্মকভাবে পরস্পরবিরোধী, অর্থাৎ যে সব ধারণা কিছুতেই পাশাপাশি থাকতে পারে না, সেগুলো দিব্যি সহোদর ভাইবোনের মতো একসঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে। তুমি সে সবকে এক বিশাল সমন্বয়ের সূত্রে সাজাতে পার, তা হবে এক যতি উচ্চস্তরের কাজ। কিন্তু দুটি জিনিস, দুটি ধারণা, যাদের কার্যকরী পরিণাম সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী, এবং যেগুলি হল একই ব্যাপারের দুই সম্পূর্ণ বিরোধী যুক্তি...সে দুটি জিনিস একই সঙ্গে রয়েছে এবং ঠিক পাশাপাশি আছে, কখন কখন এত বেশী কাছাকাছি থাকে যে, দেখে বোধহয় যেন তারা সংযুক্ত এবং তাদের এই সংযোগের হাস্যকরতা সত্ত্বেও দিব্যি একসঙ্গে বাস করছে।

একদিন আমি তোমাদের একবার থেকে এ সম্বন্ধে কতকগুলি উদাহরণ দেব। প্রায়ই তোমাদের কথাটা বলি, কিন্তু কখন দৃষ্টান্ত দিইনি। একদিন অনেকগুলি দৃষ্টান্ত একসঙ্গে করে দেব। তখন তোমরা দেখবে, যদি তা দুঃখের বিষয় না হয়, ত বেয়াড়া কিছু হলেও বেশীর ভাগ লোকে যাদের মধ্যে এটা আছে তারা খেয়ালই করে না, কারণ এতে তাদের কোনই অসুবিধা হয় না। যদি কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা থাকে নানা বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের কিছু কিছু ধারণা নিশ্চয় আছে, যেমন ধর পৃথিবী সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, অস্তিত্বের হেতু সম্বন্ধে, অস্তিত্বের লক্ষ্য সম্বন্ধে, ভবিষ্যতের উপলব্ধি সম্বন্ধে,

এমন আরো কত ধারণাই তোমাদের আছে। এখন চেষ্টা কর একদিন এই ছোট্ট মজার খেলাটি করতে: সব ধারণাগুলিকে তোমার সামনে নিয়ে এস, এইভাবে, তারপর তাদের সাজাতে আরম্ভ কর। দেখবে ব্যাপারটা কি রকম সহজ হবে, আর হয়ত তোমার খুব মজা লাগবে। দেখবে, বিস্ময়কর কত জিনিস আবিষ্কার করবে।

দেখছ তাহলে, ইতিমধ্যেই করবার মতন কাজ রয়েছে,—মাত্র এই প্রদর্শনীর কাজটি, পরপর একটি একটি করে তোমার সামনে সাজিয়ে রাখা, যে কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে তোমার যত কিছু ধারণা আছে, যেন তুমি সেগুলিকে কোন একটি প্রবন্ধের আকারে লিখতে বাধ্য হয়েছ, যেন তোমাকে সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়েছে, যেমন, "অমুক জিনিসটির সম্বন্ধে, অথবা অমুক বিষয় সম্বন্ধে তোমার কি মত?" আর তখন তুমি প্রবন্ধটি লিখতে বাধ্য হও—সব ধারণাগুলিকে পরের পর সাজাও, দেখবে ব্যাপারটা কিম্ভূতকিমাকার হবে। অবশ্য যদি তোমার আগে থেকে একটি কেন্দ্রীয় ধারণা জানা থাকে, আর সম্ভবত তা যদি হয় একটি অপরিবর্তনীয় মূল সত্য, যেটিকে ঘিরে তুমি অন্য সব ধারণাগুলিকে সাজাচ্ছ, তুমি তাদের মধ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত শৃঙ্খলা স্থাপন করছ, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হয়, সেইভাবে প্রত্যেকটিকেই তার নিজের নিজের জায়গায় রাখছ, তাহলে তুমি সেটিকে একটি আদর্শ বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করে তুলবে। কিন্তু যদি আগে কখন এ কাজটি না করে থাক, আর এখন যদি তোমার মনের মধ্যে যা রয়েছে সেটাই লক্ষ্য করতে চেষ্টা কর, তাহলে সত্যিই অবাক হবার মতন কিছু একটা দেখতে পাবে। যাই হোক, আমি তোমাদের বলছি, "তা যদি অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার না হয়, ত অত্যন্ত বেয়াড়া কিছু হবে। কল্পনাও করতে পারবে না, ঘন্টাখানেকের মধ্যে, তুমি কি পরিমাণে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পার, অথচ তাতে একটুও আশ্চর্য বোধ কর না।

এটা প্রবন্ধের আকারে লিখলে বেশ সুন্দর হবে। আমি একটা ছোট্ট প্রবন্ধ লিখব... বিষয়টা কি হবে? (যেটা খুশি একটা নাও, তাতে কিছু এসে যায় না) কোন্ লক্ষ্যের দিকে জীবন এগিয়ে চলেছে?" "পৃথিবীতে জীবনধারণের উদ্দেশ্য কি?" অথবা "কেন মানুষকে জন্মালেই মরতে হয়?" এই ধরনের যেটা খুশী একটা বিষয় নাও। আমি বলছি না দেখ, কেন তুমি আজ ফুটবল খেলেছ, আর কালকে বাসকেট বল খেলবে? না, ও ধরনের বিষয় নয়, কারণ ওগুলোর তুমি সর্বদাই কৈফিয়ৎ দিতে পারবে। আমি বলছি আর একটু সার্বজনীন, সাধারণ বিষয়ের কথা। ওটাকে তোমার সামনে রাখ, আর ও সম্বন্ধে তোমার ধারণাগুলোকে পর পর লিপিবদ্ধ কর, দেখবে সেটা মজার ব্যাপার হবে।

প্রশ্ন: মা, প্রায়ই কোন একটা বই পড়তে পড়তে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে কি করে বুঝব, কোন্‌টা অন্যের ধারণা আর কোন্‌টা আমার নিজের?

শ্রীমা: আরে, না, না:, ওরকম কোন কিছু নেই। অপরের ধারণা আর নিজের ধারণা বলে কিছু নেই। কারুরই নিজস্ব ধারণা বলে কিছু নেই। ও হল এক অনন্ত মহাসমুদ্র। তা থেকে যে যার নিজের মর্জি অনুযায়ী ধারণাকে সংগ্রহ করে। ধারণা হল সাধারণের সম্পত্তি, সমষ্টিগত অধিকার।

কেবল বিভিন্ন স্তরের ধারণা আছে। যেমন, একটি হল যা অতিশয় সাধারণ, তার মধ্যে আমাদের সকলের মস্তিষ্কই ডুব দেয়, এইখানে তারা একেবারে কিল্‌বিল্‌ করছে ঘাঁকে ঘাঁকে। এ হল "সার্বজনীন মহোদয়"-দের স্তর। এর পরে আছে আর একটু উঁচু স্তর, যাদের বলা হয় চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের জন্যে সেটা। সংখ্যায় তারা অনেক। তারপরে আরও উঁচুতে অনেক স্তর আছে, কতক বা বাক্যের অতীত রাজ্য, কিন্তু তবুও সেগুলো ধারণার, ভাবের রাজ্য। তারপর আবার এমন সব মানুষও আছে, যারা একেবারে খুবই উঁচুতে উঠে যেতে পারে, সেখানে তারা জ্যোতির মতন একটা কিছুকে ধরতে পারে, আর সেই জ্যোতিকে তার যত ধারণার আর যত চিন্তার রূপকে সঙ্গে নিয়ে নামিয়ে আনতে পারে। এই উর্ধ্বের রাজ্যের কোন একটি ভাবকে যদি তারা টেনে আনতে পারে, তাহলে তা নিজেকে সুব্যবস্থিত করে, নানা রকমের অসংখ্য চিন্তার আকারে দানা বাঁধবে, যেগুলো এই ভাবটিকেই ভিন্ন আর এক রকমে প্রকাশ করতে পারে। আর সেক্ষেত্রে তুমি যদি হও লেখক বা কবি বা শিল্পী, তাহলে যখন তুমি সেটিকে আরও নিচে নামিয়ে নিয়ে আসবে, তখন নানা রকমের বস্তুকে প্রকাশ করতে পারবে, যেগুলি মাত্র একটিই ক্ষুদ্র ধারণার বা ভাবের চারিদিকে অসংখ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু সেগুলি আসে খুবই উর্ধ্বের রাজ্য থেকে। আর যখন তা করতে শিখেছ, তখনই তুমি বুঝেছ কোন্‌টা বিশুদ্ধ ভাব, আর কি ভাবে তাকে প্রকাশ করতে হয়।

অনেকে আছে যাদের মাথার মধ্যে এ কাজ হয় না, তার কারণ, তাদের মধ্যে কল্পনা বলে কিছু নেই, অথবা লেখবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু তারা শিক্ষার দ্বারা এটা করতে পারে, অন্যেরা যা লিখেছে সেগুলো পড়ে করতে পারে। যেমন ধর, কত কত কবি আছে, যারা একই ভাবকে প্রকাশ করেছে,—একই ভাব—কিন্তু এতই বিভিন্ন আকারে তা করেছে যে কারুর যদি প্রচুর পড়ার অভ্যাস থাকে, তার কাছে তা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। যারা পড়তে ভালবাসে এবং অনেক পড়ে, তারা দেখে, তাইত, এই ভাবটা অমুক লোক এইভাবে প্রকাশ করেছে, তমুক লোক বলেছে ওই ভাবে, ওই লোকটা রূপ দিয়েছে এইভাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই রকম করে তুমি এক ঝুড়ি কাব্য সংগ্রহ করতে পারবে, যেগুলোকে বিভিন্ন কবি প্রকাশ করেছে, একই ভাবকে বয়ে, আর সে ভাবটি খুব উঁচুতে রয়েছে। তখন তুমি লক্ষ্য করবে, বিশুদ্ধ ভাব বা প্রতীক ভাব, আর মনের জগতে, এমন কি মনের আনুমানিক বা শিল্পীর জগতে তার প্রকাশ রূপের মধ্যে প্রায় মূল-গত একটা তফাৎ আছে। যে পোশাকে নয় অথচ কসরৎ করতে ভালবাসে তার পক্ষে এমনটা করা খুবই ভাল। এ হল মনের কসরৎ।

কিন্তু যথার্থই যদি বুদ্ধিমান হতে চাও, তাহলে তোমাকে মনের কসরৎ করতে শিখতে হবে। ঠিক যেমন, সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ দেহ যদি লাভ করতে চাও তাহলে শরীর চর্চার কসরৎ করতে শিখতে হবে। এ-ও সেই একই জিনিস। যারা কখন মনের কসরৎ করেনি তাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি অতি নগণ্য এবং অতি সরল হয়ে থাকে, আর তারা সারা জীবন শিশুর মতন চিন্তা করে। তাই কি ভাবে মনের কসরৎ করতে হয়, তা শিখতে হবে। কিন্তু তাই বলে বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই, অর্থাৎ যেন বদ্ধমূল ধারণা না গড়ে বসে, যেন না বলতে আরম্ভ কর, "এই ঠিক, ওই ভাবেরটা ঠিক নয়, এই ধর্মই হল সত্য, অন্যটা

মিথ্যা", অথবা এর উল্টো কথাও বলা নয়—যদি এ সবের মধ্যে পড়ে যাও, তাহলেই সম্পূর্ণ মূঢ়তার পরিচয় দেবে।

কিন্তু এই সব যদি দেখতে শেখ, যেমন ধর, সকল ধর্মকে একে একে নিয়ে যদি দেখতে চেষ্টা কর, কি ভাবে তারা প্রত্যেকেই কোন অদ্বিতীয় একের জন্যে একই অভীপ্সাকে প্রকাশ করেছিল, তাহলে সেটা খুবই উপভোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর তখন তুমি এই সব নিয়ে কলরং করতে সুরু করতে পার। আর যখন সে সবকে কর্তুত্বের মধ্যে আনতে পারবে, তখন নিজেকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারবে, আর মানুষের অন্তহীন বিতর্ককে দেখে একটু হাসতে পারবে। আর তখনই কেবল তুমি চিন্তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছ। তখন কেউ তোমার মতন করে চিন্তা করে না বলে তুমি চটে আগুন হবে না। দুঃখের বিষয়—এ ব্যাধিটি এখানে বড় বেশী ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

বেশ, আর কারুর কোন প্রশ্ন নেই ত? তার মানে, যথেষ্ট হল আজ।

বিদায় তবে, এস তোমরা সবাই।

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

শ্রীনীরদের ভাষ্যসহ

৮—হয় কেবল নিজের বিশ্বাসকেই জ্ঞান, আর অন্য সকলের বিশ্বাসকে প্রমাদ অজ্ঞানি ভণ্ডামী বলে দিও না, আর না-হয় সাম্প্রদায়িক সব মতবাদকে আর তাদের অসহিষ্ণুতাকে বিদ্রূপ ক'রো না।

সাম্প্রদায়িক সব মতবাদ আর ধর্মমত সমূহের অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয় এই কারণে যে যত সম্প্রদায় ও ধর্মমত মনে করে যে একমাত্র তাদের বিশ্বাসই জ্ঞান, আর অন্য সকলের বিশ্বাস হল প্রমাদ, অজ্ঞান বা ভণ্ডামী।

এই সহজ-সাধারণ গতিবৃত্তিই, যা তারা সত্য বলে মনে করে তাকে মতবাদ রূপে গড়ে তুলতে আর অন্যরা যা সত্য বলে মনে করে তাকে প্রচণ্ডভাবে হেয় করতে তাদের প্রণোদিত করে। আমার জ্ঞান, আমার বিশ্বাসই একমাত্র সত্য আর অন্যদের বিশ্বাস সত্য নয়,—একথা চিন্তা করা মানেই হল যত সব সম্প্রদায় ও ধর্মমত যা করে বেড়াচ্ছে ঠিক তাই করা।

কাজেই, সম্প্রদায় ও ধর্মমতসমূহ যা করছে তুমি যদি ঠিক তাই কর, তাহলে তাদের বিদ্রূপ করার অধিকার তোমার নেই। অথচ নিজের অজ্ঞাতসারেই তুমি তা কর, কারণ তোমার কাছে তা খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দ তোমাদের যা বোঝাতে চান তা হল এই যে, তোমরা যখন বল "আমরা সত্যকে পেয়েছি এবং যা এই সত্য নয় তা-ই এক প্রমাদ" (অতটা স্থূল ভাবে বলবার সাহস যদি তোমাদের না-ও হয়). তখন তোমরা ঠিক তাই কর যা করছে ওই যত ধর্মমত ও সম্প্রদায়।

নিজেকে যদি খানিকটা বিষয়ীভূত করে দেখ, তাহলে দেখবে যা-কিছু তুমি শিখেছ বা যা-কিছু চিন্তা করেছ এবং যা তোমার কাছে বিশেষ করে সত্য বলে মনে হয়েছে, মনে হয়েছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আর সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়েই, তুমি জ্ঞান বলে প্রতিষ্ঠা করেছ, এবং তোমায় যদি কেউ বলে "না, না, তা হল এরকম, তা ওরকম নয়" তৎক্ষণাৎ তুমি তাদের সেই স্বতন্ত্র ধারণায় প্রতিবাদ করে উঠবে।

নিজের দিকে যদি তুমি লক্ষ্য রাখ, এই অসহিষ্ণুতা কিভাবে আসছে তা তুমি বুঝতে পারবে এবং তৎক্ষণাৎ উদ্ধত যত বাদানুবাদ তুমি থামিয়ে দিতে পারবে। আগেই একবার যা বলেছি তাতেই ফিরে এলাম তবে : বস্তুসমূহের নিহিত সত্যের সঙ্গে তোমার যে সংযোগ ঘটেছে, যা তোমার ব্যক্তিগত—আর যা কমবেশি স্বচ্ছ, কমবেশি গভীর, কমবেশি সুষ্ঠু, কমবেশি শুদ্ধ—তা তোমায়, তোমাকেই শুধু, দিয়ে থাকতে পারে এক মনোরম ও কখনও-বা চূড়ান্ত অনুভূতি, কিন্তু তোমার সেই সংযোগ এক চূড়ান্ত মূল্যের অনুভূতি দিয়েছে বলেই তাকে এক সর্বজনীন অনুভূতি বলে মনে করবে বা ধরে নেবে যে অনুরূপ সংযোগ অন্যদেরও দেবে সেই একই অনুভূতি তা নয়। আর যদি তুমি এটা বোঝ যে তা হল একান্তই ব্যক্তিগত, ব্যষ্টিগত এবং সত্তা-সাপেক্ষ, বোঝ যে তা ব্যতিক্রম-বিহীন ও বিশ্বজনীন এক বিধান মোটেই নয়, তাহলে অন্যদের জ্ঞান সম্বন্ধে তুমি আর কোন হেয় ধারণা পোষণ করতে পারবে না।

বা তাদের উপর তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও তোমার অনুভূতি আরোপ করতে চাইবে না। তাহলেই দূর হবে সকল মানস কোন্দল, যা সর্ব্বদাই একেবারে নিরর্থক।

অবশ্য, সূত্রটির প্রথমাংশটিকে নেওয়া যেতে পারে একটি উপদেশ হিসাবে; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সে-অর্থে তা লেখেননি; লিখেছেন যে ভুল আমরা নিজেরা করি অথচ অন্যের মধ্যে যা দেখে বিদ্রূপ করি সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তুলতে। এটা আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস, শুধু এই ব্যাপারেই নয়, সব ব্যাপারে। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে-মুহূর্তে আমাদের নিজেদের কোন দুর্বলতা—কোন হাস্যকর অভ্যাস, কোন ত্রুটি বা কোন অপূর্ণতা থাকে, তা কমবেশি প্রকৃতিগত হয়ে থাকে বলে আমরা মনে করি এসব তো খুবই স্বাভাবিক এবং তাতে আমরা মর্মাহত হই না, কিন্তু সেই দুর্বলতা, সেই অপূর্ণতা সেই হাস্যকর অভ্যাস যদি আমরা অন্যের মধ্যে দেখি তাহলে আমরা আঁতকে উঠে বলি: "এটা কেমন হল! সে এরকম!" অথচ আমরা লক্ষ্যই করি না যে আমরা নিজেরাই "ওই রকম"। আর তাই ওই দুর্বলতার ওই অপূর্ণতার সঙ্গে আমরা আরও এই হাস্যকর ব্যাপারটি জুড়ে দিই যে তা আমরা লক্ষ্যই করি না।

এ থেকে শিক্ষার বিষয়টি হল এই: যখনই কারু মধ্যে কোন জিনিস তোমার মনে হবে একেবারেই বরদাস্ত করা যাচ্ছেনা বা হাস্যকর—"কি! সে এরকম, তার এরকম ব্যবহার, সে এ-ধরনের কথা বলে, সে এরকম কাজ করে" তখন তোমার নিজেকে বলা চাই: "দাঁড়াও, দাঁড়াও! আমিই হয়তো আমার অলক্ষিতে ওই একই জিনিস করছি। আমার পক্ষে ভাল কাজ হবে অন্যের সমালোচনা করবার আগে নিজের ভিতরে তাকিয়ে দেখা, যাতে আমি নিশ্চিত হতে পারি যে সামান্য একটু ভিন্ন ধরনে আমিও ওই একই জিনিস করছি না।" আর তোমার যদি থাকে এ-হেন শুভবুদ্ধি ও মেধা যাতে যতবার অন্যের ব্যবহারে আঘাত পাবে ততবারই এরকম করতে পার, তাহলে দেখতে পাবে অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হল দর্পণের মত যা আমাদের দেওয়া হয়েছে যাতে করে আমরা আরো সহজে ও আরো স্পষ্টভাবে সেসব দুর্বলতা দেখতে পাই যা আমরা নিজেদের মধ্যে বয়ে চলি।

সাধারণত এবং প্রায় নিশ্চিতভাবে যা-কিছু অন্যের দেখে তুমি আঁতকে ওঠ, তাই হল ঠিক সেই জিনিস যা তুমি নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে চলেছ—কমবেশি প্রচ্ছন্নভাবে, কমবেশি গুপ্তভাবে, হয়তো বাইরে থেকে সামান্য একটু ভিন্ন ধরনের যা তোমাকে নিজের সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হতে সাহায্য করে; আর তোমার মধ্যে যা কিছু তোমাকে তেমন আঘাত দেয় না সেই জিনিসই যদি তুমি অন্যের মধ্যে দেখ তৎক্ষণাৎ তা হয়ে ওঠে দানবীয়।

— এ ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখ, তোমার নিজেকে পরিবর্তন করতে এটা অনেক অনেক সাহায্য করবে, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের সাথে তোমার সম্বন্ধের মধ্যে তা নিয়ে আসবে এক সহাস সহিষ্ণুতা, এক শুভ-ইচ্ছা যা আসে সহানুভূতিপূর্ণ বোধগম্যতা থেকে, আর অনর্থক যত কলহের অন্তেই প্রায়শ হবে পরিসমাপ্তি।

দ্বন্দ্ব না করেও জীবনধারণ করা যায়। একথা বললে অদ্ভুত লাগে কারণ, অবস্থা সব বর্তমানে যেমন তাতে, তার বিপরীতই সত্য বলে মনে হয়, যেন জীবনটা সৃষ্টিই হয়েছে দ্বন্দ্বের জন্য, এই হিসেবে যে পরস্পর-মিলিত মানুষদের প্রধান কাজই হল ঝগড়া করা, খোলাখুলিভাবেই হোক আর গোপনেই হোক। এটা ঠিক, সব সময় মানুষ কথা কাটাকাটি করে

না, সৌভাগ্যের বিষয় সবসময় ঘুঘোঘুঘিও করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রয়েছে একটা নিরন্তর উত্তেজনার অবস্থা কারণ মানুষ তার চারপাশে সেই পূর্ণতার প্রকাশ দেখতে পায় না যা সে চায় নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে—আর তা উপলব্ধি করা সে দেখে তার নিজের পক্ষে খুবই কঠিন—কিন্তু অন্যদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সে মনে করে খুবই স্বাভাবিক।

"ওরা এরকম কি করে হতে পারে?—" তুমি ভুলে যাও যে "এরকম" না হতে পারা যে কতখানি কঠিন তা তুমি নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেয়েছ।

চেষ্টা কর, তুমি নিজেই দেখতে পাবে।

সব কিছুকে দেখ একটা তাচ্ছিল্যের হাসি নিয়ে, যেসব জিনিস তোমায় বিরক্ত করে সেসবকে নাও তোমার নিজেরই এক শিক্ষা হিসেবে, তাহলে তুমি জীবনধারণ করবে আরও অনেক বেশি শান্তিপূর্ণভাবে, এবং আরও বেশি কার্যকরী ভাবেও বটে, কারণ নিশ্চিতই শক্তির একটা বৃহৎ অংশ অপচিত হয় সেই উত্তেজনায় যা তুমি অনুভব কর যখনই অন্যের মধ্যে সেই পূর্ণতা তুমি দেখতে না পাও যা তোমার নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছ।

অন্যদের কি পূর্ণতার উপলব্ধি হওয়া উচিত তাতেই তুমি থেমে থাক, কোন্ লক্ষ্যে তোমার নিজেকে পৌঁছতে হবে সে সম্বন্ধে প্রায়ই সচেতন থাক না। যদি তুমি সে সম্বন্ধে সচেতন হও, তাহলে আয়ত্ত কর যে কাজ তোমায় দেওয়া হয়েছে তাই দিয়ে অর্থাৎ যা উপলব্ধি করতে হবে তা উপলব্ধি করে, অন্যরা কি করল না করল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, কারণ, তলিয়ে দেখলে ওটা তোমার ব্যাপারই নয়। আর সত্যকার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবার সব থেকে ভাল উপায় হল নিজেকে শুধু বলা "যা কিছু আমায় ঘিরে রয়েছে, আমার জীবনের সব কিছু পরিস্থিতি, যেসব মানুষ আমার কাছাকাছি রয়েছে, তারা সবই হল আয়নার মত যা ভাগবত চেতনা আমায় সম্মুখীন করেছেন যাতে আমি দেখতে পাই কতখানি উন্নতি আমায় করতে হবে। যা-কিছু অন্যের মধ্যে দেখে আমার আঘাত লাগে তাহল সেই আত্মোন্নতির কাজ যা নিজের মধ্যে আমায় করতে হবে।"

আর সম্ভবত যদি কেউ সত্যকার পূর্ণতার অধিকারী হয়ে থাকে, অন্যদের মধ্যেও সে প্রায়ই তা আবিষ্কার করবে।*

৭-১১-৫৮

* Pensées et Aphorismes থেকে অনুবাদ।

সাবিত্রী কাব্যের তাৎপর্য

সুধা বসু

সাবিত্রী কাব্যের যা তাৎপর্য, তার সার কথা রয়েছে প্রথম পর্বে। আর, প্রথম পর্বের প্রথম দুটি সর্গে রয়েছে তারও নির্যাস। প্রথম পর্বে শ্রীঅরবিন্দ দুটি চরিত্রকে মাত্র উপস্থাপিত করেছেন, সাবিত্রী এবং অশ্বপতি। তার মধ্যেও প্রথম এসেছেন সাবিত্রী, তারপর অশ্বপতি।

অশ্বপতির আরজা সাবিত্রী। কার্যকারণ বা প্রাকৃতকালের ধারা অনুসরণ করলে দেখানো হত, অশ্বপতির তপস্যার ফলে সাবিত্রীর জন্ম হয়েছে। কিন্তু তা না করে প্রথমে সাবিত্রীর কথা বলা হচ্ছে।

আমাদের চেতনায় দুটি ভূমি। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত এই দুই ভূমিতে প্রথমটির কারবার জড়ের কার্য-কারণ পরম্পরা নিয়ে, অন্যটি জড়োত্তরের মধ্যে মহাকারণের দৃষ্টির সম্মুখে ফুটতে থাকে। এই দুই ভূমির মধ্যে যে-ব্যবধান কিম্বা যে বৈশিষ্ট্য, তার দিকে ইঙ্গিত করেই কিন্তু সেটি ফোটে। সোজা কথায়, প্রাকৃত দৃষ্টিতে বস্তু আগে ভাব পরে, আর অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে ভাব আগে বস্তু পরে। অতএব সাবিত্রী চেতনা বা সাবিত্রীর আবির্ভাব একটা নিত্য সত্য। আর, সেই চেতনার আবেশেই তাকে বাবাহনের একটা আকৃতি জেগেছে অশ্বপতির অন্তরে। তাই এখানে প্রথম এসেছেন সাবিত্রী, তারপর অশ্বপতি। এই প্রথম পর্বেই শ্রীঅরবিন্দ এ কাব্যের মধ্যে অশ্বপতির ও সাবিত্রীর যে তপস্যা ও সিদ্ধি, তার কথা সংক্ষেপে বলে নিয়েছেন।

আবার প্রথম পর্বের প্রথম অধ্যায়ে যে কালবিন্যাস, সেও অর্থপূর্ণ। প্রথমেই আমরা পাই, মহাকালের পটভূমিকা। তারপর ক্রমশ সেই কালকে সংক্ষিপ্ত করে শেষে এক অহোরাত্রে পর্যবসিত করা হয়েছে। সাবিত্রীর জীবন বা সাবিত্রী চেতনাকেও আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি তার অভিব্যক্ত মর্ত্যে আবির্ভূত চেতনা, আরেকটি শাশ্বত অমূর্ত চেতনা। সাবিত্রীর মর্ত্যজীবনকেও কবি যেন তিন ভাগে ভাগ করে দেখালেন। সত্যবানকে দেখার পূর্বে পর্যন্ত সাবিত্রীর সহজ সাধারণ জীবন। প্রথম ভাগ ঐ পর্যন্ত বলা চলে, দ্বিতীয় ভাগে সম্বৎসরব্যাপী একত্র থাকার জীবন। সম্বৎসর একত্র যাপনেরও একটা তাৎপর্য আছে। উপনিষদে অনেক জায়গায় সম্বৎসরকে প্রজাপতি বলা হয়েছে। আমাদের মর্ত্যচেতনায় কাল পরিমাণের বৃহৎ একক সম্বৎসর। তার মধ্যে যে ঋতুচক্রের আবর্তন, তা থেকেই মর্ত্যজীবনের একটা পুরোপুরি ছক আমরা পেয়ে যাই। তাহলে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত যুগপৎ দুটি ভাব নিয়েই সাবিত্রীর সত্যবানের সঙ্গে এই সংবৎসরকাল যাপন, তাঁর জীবনের এক বিশিষ্ট পর্ব। বলা যেতে পারে, সমস্ত মর্ত্যজীবনেরই এই বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম সর্গ এখানেই শেষ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গে সাবিত্রীর জীবনের অহোরাত্র। একে তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্ব বলা যায়। সংবৎসরকালব্যাপী যে পর্ব, তার মধ্যে চলেছিল সাবিত্রীর অন্তরের তপস্যা। একেই শ্রীঅরবিন্দ পরে সাবিত্রীর যোগ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই অহোরাত্রের

পর্বে চলেছে সাবিত্রীর অন্তরমন্থন। এর মধ্যে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই একসঙ্গে মিশেছে, ব্যঞ্জনা অত্যন্ত প্রগাঢ় হয়েছে কিন্তু কালব্যাপ্তিতে তা মাত্র এক অহোরাত্রের ঘটনা। এমন কি বলা যেতে পারে, এটি এক সূর্যোদয় হতে আরেক সূর্যাস্তের পরের কি হয়তো মধ্য-রাত্রির পূর্বের ঘটনা। তারপর যেখানে তিনি এ সর্গটি শেষ করেছেন, সেখানে দেখিয়েছেন যে সাবিত্রী চেতনা যেন একটি বজ্রের আঘাতে অন্ধ তমিস্রার শেষ বাধাটিকে বিদীর্ণ করে স্বতঃস্ফূর্ত অমৃত চেতনার প্রভাস্বর হয়ে দাঁড়াল। এইখানে সাবিত্রী চেতনার একটি পরিপূর্ণ পরিচয় মেলে।

এই দিক থেকে ও মননের দিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ খুবই অর্থপূর্ণ। বিষ্ণুর যে সপ্তপদক্রম, তার মধ্যে সবিতা আছেন তৃতীয় পাদে। যাস্ক ছবিটি এইভাবে এঁকেছেন: সবিতাকে দেখা যাচ্ছে না, তিনি রয়েছেন শিশুলয়ের নীচে। কিন্তু তাঁর প্রভা প্রাচীমূল হতে মধ্যাহ্ন গগন পর্যন্ত এক অস্পষ্ট আলোকে বিচ্ছুরিত হল। এইটি হল দেবযান—আলোর পথ। এই ধারাটিই সাবিত্রী চেতনার মর্ত্যধারা। সাবিত্রী এই সবিতারই প্রজ্ঞা প্রেম এবং প্রাণ।

প্রথমে যা আভাসিত হয়েছে, ক্রমে তাই-ই প্রভাসিত হয়েছে। আভাস থেকে প্রভাসে যাওয়াই সৃষ্টির তাৎপর্য। এ তিনি প্রথম সর্গে আবারও ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম সর্গকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল বিশ্বের বিসৃষ্টি। তার মধ্যে universal-এর বর্ণনা। তারপর বাকি অংশটুকু যাতে সাবিত্রীর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়েছে, তা হল সাবিত্রীরই বিশ্বচেতনা দ্বারা আবিষ্ট যে ব্যষ্টি-চৈতন্য, তার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। তাহলে সাবিত্রী-চেতনার পটভূমিরূপে আবার আমরা পাচ্ছি বিশ্ব-চৈতন্যকে। বিশ্বচৈতন্যে সাবিত্রী চেতনার যে আবির্ভাব—কবির ভাষায় এইটিই The great event। সাবিত্রী যখন উন্মেষিত হলেন বা তাঁর উন্মেষের প্রাক্‌ক্ষণেই এর সূচনা। আর যখন সবিতা হলেন বিষ্ণু, তাঁর সেই মাধ্যন্দিন মহিমাই এর পরিণাম। তাহলে এইখান থেকেই সাবিত্রীর সমগ্র মর্ত্য জীবনটিকে ঠিক অমনই এক আলোর প্রচ্ছটারূপে দেখতে পাই আমরা। প্রথম সর্গে এইটিকেই তিনি চিত্রিত করেছেন।

এই চিত্রের ভূমিকা রূপে শ্রীঅরবিন্দ কতগুলি দার্শনিক তত্ত্ব—তত্ত্ব বলতে কিন্তু philosophy নয়, কতগুলি দর্শনকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। সার্বভৌম এক সমস্যার সমাধান চাই। বৈদিক ঋষি সমস্ত ব্যাপারটা এইভাবে দেখেছেন। আলোর উপাদান-হর, দিনের আলো বেড়ে চলে। মধ্যগগনে এসে আলো তার চরম বিন্দুতে পৌঁছায়। তারপর শুরু হয় আলোর অবক্ষয়—মিলিয়ে যাওয়া। বৈদিক সাধনায় একটা প্রচেষ্টা ছিল, যাতে এই আলো মিলিয়ে না যায়। এ-ভাবটিকে তাঁরা আরেকটা রূপ দিয়েছিলেন—বলেছিলেন ব্রহ্মণ্ডি চক্রের কথা, রাশিচক্রের মধ্য দিয়ে আকাশে যা আঁকা রয়েছে। সূর্য ওই রাশিচক্রের ও সাতাশ নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে চলছেন আর ব্রহ্মণ্ডিচক্র বারবার আবর্তিত হচ্ছে। তাতে আমরা একবার আলো একবার অন্ধকার পাই। এ আবর্তন কি চিরদিন চলবে? তাহলে আর অমৃতত্বের আশা থাকে না। ঋষি তাই ভাবনা করলেন যখন আলো সহজের ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে—উষাকালে হতে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত আলোর যে প্রচয়, তার

নিম্নগতি রুদ্ধ করতে পারলেই এই আবর্তগতি লাভ করবে অধ্বর গতি। মাধ্যন্দিন গগনের সূর্যকে নামতে না দিলে, নিম্নগতিকে রুদ্ধ করতে পারলে আলো আর নিভে যাবে না। ভূ-চক্রের উর্ধ্ববিন্দু স্পর্শ করে tangent-এর মত যে গতি আবর্তন পেরিয়ে সমূর্ধ্বপানে চলে যায়—এইভাবে হয় মৃত্যুর পরে আত্মার বিজয়। সাতাশটি নক্ষত্র পেরিয়ে যেমন অভিজিৎ নক্ষত্র আবর্তনের পারে শাশ্বত বিন্দু, সাবিত্রী হলেন সেই অভিজিৎ চেতনার দ্যুতি। তাই তাঁর চলা আবর্তগতি রুদ্ধ করে ঐরকম অধ্বর গতি সৃষ্টি করা। এই আলোর পথ ধরে চলার সাবিত্রী শক্তির আবির্ভাবের তাৎপর্য বুঝতে গেলে, যেতে হবে একেবারে কাল-জঠরের গোড়ায়, সৃষ্টির উন্মোচনের রহস্যমূলে।

It was the hour before the gods awake—কাব্য রচনার প্রথমেই কবি দেখালেন সৃষ্টির পূর্বক্ষণ। যে সৃষ্টি এই মর্ত্য চেতনাতে নেমে এসেছে, তারও পূর্বে কল্পনা করা যায় সেই আদি মুহূর্ত। একদিকে অব্যক্ত যেন গাঢ় অন্ধ তমিস্রা, সেখানে সূক্ষ্মচেতনার স্পন্দ কখন সুরু হল—সেই ক্ষণ সেই আদিবিন্দু। কালের যেন দু'টি মান পেলাম, এক ভাগে দেবতারা জাগেননি, অপর দিকে জাগছেন। পুরাণের বর্ণনায় অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায় জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রায়। যোগ-নিমগ্ন নিদ্রিত বিষ্ণু কালাতীত সত্তা। সেই অনন্তের বোধে বোধ করি, বোধও সেখানে যেন মূর্ছিত। দুটিই অনন্ত কালাতীত ও শাশ্বত কাল-প্রবাহ—পরাগতি ও আবর্তগতি। অসৎ থেকে সৎ, ঐ অন্ধতমিস্রার মাঝে চিৎস্পন্দ জাগিয়ে তুলেছে পরমাপ্রকৃতি। এই কালবিন্দু নিয়ে সৃষ্টি রহস্য বর্ণিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ কাব্যরচনার প্রারম্ভে সেই বাঙ্ময় চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এই ভাবগুলি ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে রয়েছে। পরম অব্যক্তকে ঋষি বলেছেন অপ্রকেত সলিল, এত গহন এত গভীর যে চেতনা সেখানে যেন নেই, যেতেও পারে না। তাকে জেনেছে কে? "কো অদ্ধা বেদ?" পরমব্যোমে যিনি অনিমেষ দৃষ্টিতে চোখ মেলে রয়েছেন, তিনি কি তাকে জেনেছেন? রহস্য-সম্পৃক্ত এই সব শব্দগুলির ব্যঞ্জনা কল্পনাকে নিয়ে যায় সেই অগমলোকে.. শ্রীঅরবিন্দের অনুপম ভাষায় এইসব বর্ণনায় ধ্বনিতরঙ্গ।

ঋগ্বেদের সৃষ্টিসূক্তে যেমন দেখি, অভীদ্ধ তপস্যা (luminous energy) হতে ঋত ও সত্য হতে জাত হলেন রাত্রি। সেই রাত্রি, যেখানে কিছু নাই, তবু কি যেন আছে...তারই মাঝে দুলে উঠল মহাসমুদ্র। অর্ণব সেই সমুদ্রতরঙ্গসঙ্কুল কালপ্রবাহ... জাগল সম্বৎসর সূর্য। তপঃশক্তি সব কামনাকে বশীভূত করেছে...এইবার বিশ্ব ধীরে ধীরে চোখ মেলছে। ঋষিরা বলেছেন কল্পনা—"যথা পূর্বমকল্পয়ত"—পর্বে পর্বে ঘটে চলেছে, যা কিনা চিন্ময় এবং সম্পদ্যমান। যা কিছুর প্রকাশ ঘটছে, আবির্ভাব, আর ভাবের বাস্তবতা চিন্ময়,—সেই চিন্ময় বাস্তবতাই কল্পনা। অরূপ যখন রূপ ধরে, অরূপের সেই চিন্ময় কল্পনাই বাস্তব। আর্ষ চিন্তার আবিষ্ট এই চিত্র (Idea)কখনই imagination নয়। সাধারণভাবে কল্পনা বলতে আমরা তাই বুঝে থাকি।

জগৎপতির যোগনিদ্রা মহাকারণের অবস্থা...তাঁর নাভিপদ্ম হতে বাঙ্ময় ব্রহ্ম ওঁ; এই হল প্রজ্ঞা, তা থেকে সৃষ্টির সূচনা। এখানে এই বাক্যে তেমনই সূত্রাকারে ঐ অবস্থা-গুলি বুনিয়ে কয়েকটি বর্ণনাকে ঘনবদ্ধ করে গাঁথা হয়েছে, সাধনার অনুকূলে বাঙ্ময়

অপূর্ব ব্যঞ্জনা। প্রথম ভাগে অন্ধতমিস্রা হতে মহা সাবিত্রীচেতনার উন্মেষ, আর দ্বিতীয় ভাগে বিশ্বে অমৃতময় জীবন।

আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি, আমাদের সাধারণ চেতনায় সেখানে জ্ঞান থাকে না। বিজ্ঞানভূমিতে এই নিদ্রা সমাধিতে পর্যবসিত হয়। চেতনা গভীরে অন্তরাবৃত্ত হলে নিদ্রা হয় সমাধি-স্থিতি। আত্মচেতনা প্রকৃতির বশে যখন অবশ, সেখানে চেতনা গুটিয়ে গেলে মৃত্যু ঘটে যায়, বলা চলে। নিদ্রার মধ্যে প্রতিদিনই এইরকম মৃত্যুর মহড়া চলে। কিন্তু গভীরের আত্মচৈতন্য এই মরণে অনুবিদ্ধ হয় না। যোগীরা দেখেন এই অন্তরাবৃত্তিতে গভীর হতে আরও গভীরে চেতনা অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে আর চেতনার নতুন নতুন ভূমিগুলি আবিষ্কৃত হয়। এ কিন্তু বিজ্ঞানভূমির প্রত্যয়। নিদ্রা বা স্বপ্নকে অবলম্বন করে সমাধি প্রবর্তিত হয়। সেই সংযোগ বিন্দু হতেই আবার জাগরণ শুরু হয়। ব্রহ্মাণ্ডে যা ঘটে, পিণ্ডেও তাই ঘটে থাকে। প্রাত্যহিক চেতনার মাঝে এবং সাধনবোধেও সেরকম আসে। অন্তরাবৃত্তির পথ ধরে নিজের চেতনার মাঝেই ডুব দিতে হয়। সমাধি থেকে ব্যুত্থানের পথই বিশ্বচেতনার উন্মেষের রহস্য, সৃষ্টির রহস্য। অন্তরাবৃত্তির পথে সমাধি যেন সুষুপ্তি, তা থেকে স্বপ্ন এবং তা থেকে জাগরণ। গভীর সুষুপ্তির মাঝে স্বপ্নময় যেন খুলে গেল বশীর প্রেরণায়। তারপর পরম জাগ্রত ভূমি—Epiphany was disclosed—তন্দ্রাগাঢ় অবস্থা...পরম সুষুপ্তির মাঝে প্রেষণা যার সেই বশী, তাঁর অতীন্দ্র তপ (luminous energy), দ্যুলোকে আতত অনিমেষ সেই চক্ষু। এই চক্ষুর কথা প্রথম দিকেই বলেছেন, যা কিনা প্রলয়ের সাক্ষী। যেখানে সুষুপ্তি ভাঙছে, Between the first and last Nothingnesses, সেই চরম বিন্দু অসৎ থেকে সৎ। এ দৃষ্টি না দেখেও সব দেখে, পুরুষের দৃষ্টি। আবার আছে প্রকৃতির দৃষ্টি—সব দেখেও দেখে না, Mind of night-এ eyeless muse-এর উন্মেষ। Nothingness-এর চক্ষু X'ray-র মত দৃষ্টি ফেলে পরমাপ্রকৃতির অন্ধ-তমিস্রার মাঝে চিৎস্পন্দ জাগিয়ে তুলছে। মূলে যে অনিমেষ আঁখি, তা তো প্রবুদ্ধ যোগচেতনারও অগোচর। বলা যায় বরুণের সেই চক্ষু—"চক্ষু মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ"। অগ্নির যোগ-দৃষ্টিতে সৃষ্টি আর মিত্রের চোখে প্রলয়, বরুণ পরমের অতীত সংজ্ঞা দিয়ে দেখেন। এ যেন সেই অষ্টাদশী আদিত্য চেতনা।

ঘুম ভাঙছে...প্রথম চার লাইনে গভীর সুষুপ্তির চিত্র। সৃষ্টির মূল তত্ত্বগুলি (basic principle) প্রসুপ্ত, Silence's marge ; অব্যক্ত। Fathomless zero occupied the world। পরম শূন্যতা, যেখানে গেলে আর ফিরে আসা যায় না। এই শূন্যতাই একটা power obscure যা কিনা ঐ worldকে occupy করে রেখেছে। ব্যাপারটা ঘটে যেন কালচেতনায়, সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগ্রত সব জড়ানো রয়েছে। অনিমেষ সেই আঁখির দৃষ্টিতে সবটাই চিদ্‌ঘন, আর eyeless muse-এর মাঝে অস্ফুট আভাস। যোগ-চেতনায় এই রকম সব মিলিয়ে অনুভব হয়। সুষুপ্তির মাঝে মহাসত্তাটি তলিয়ে যেতে চায়। ভুবনকে কিছুতেই যেন ফুটতে দিতে চাইছে না। প্রাকৃত নিদ্রার পরেও অনেক সময় এই ব্যাপারটা ঘটে। এই fathomless zero গভীর থেকে গভীরে টেনে যেন নিয়ে যেতে চায়—বিপ্রকর্ষ। ওদিকে প্রকর্ষ, যে টানে ঘুম থেকে জাগতে চাইছি, কিন্তু ঠিক সময়টায় সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সেই বিপ্রকর্ষ আর প্রকর্ষের মাঝে

সৃষ্টিবীজ। সেখানে, মহাকালী দেবতা বা বলা যায়, নিদ্রাশক্তি প্রবল। সেই অনিমেষ পুরুষ আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে সেখানে ঝাঁপ দিলেন। তখন এক সংঘাতে মহাবিপ্রকর্ষ আর মহাপ্রকর্ষের মাঝে এক আবর্তগতি সৃষ্ট হয়—এক দোটানা ভাব। পরম চেতনার মহাকর্ষণ আর অদিতি চেতনার আকর্ষণের যে তির্যকপাত সেটাই 'ং'-এর চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। এই তির্যকপাতেই সৃষ্টির সূচনা—প্রথম movement যেন আরম্ভ হল, এইরকম বোধে আসে। ক্রম দিয়ে দেখানো বা বোঝানো হলেও ব্যাপারটা অক্রম। অসীম (Infinite) অনন্তকে বাঁধা যায় না। সেই শক্তিপাতেই জড়ে আবর্তগতি আরম্ভ হয়ে গেল। সেটাই বিশাল এই সৌরজগত যেমন দেখছি; মনে হয় এ কি অন্তর্গতির আবর্তন, moved creative slumber। আচ্ছন্ন সেই পরম চেতনায় গতির সঞ্চার, তার মাঝে দেখা দিয়েছে সৃষ্টির উদ্যতি। প্রথমেই আবর্তগতি জড়চেতনায় সঞ্চারিত। বুদ্ধিকে সেটা আক্রমণ করলে যেমন দেখি একই চিন্তা ঘুরে ঘুরে আসে, এটাই আধার শক্তিকে সৃষ্টি করেছে। যে জড় চেতন হল, জাগল, তা চিৎপ্রভায় সমুজ্জ্বল। প্রতিটি গতির পিছনে পরমের আবেশ। বিশ্বকে সম্যক্ দৃষ্টিতে দেখলে আগাগোড়া চিন্ময়, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তা মূঢ়। আদিম আকাশ বৃহতের ভাবনার অধিষ্ঠান (enormous space-movement)। এ পর্যন্ত এই উন্মেষকে কোনও সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তারপর একটা উদ্যতি প্রয়তি (stir)। উর্ধ্বে মহিমা অধে প্রয়তি—প্রথম বীজাঙ্কুর। এখানে eyeless muse, তারই গভীরে সেই আকূতি, যেটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তিনটি শব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন stir, movement, eyes। Nameless movement, unnamed idea ইত্যাদিতে বোঝানো হয়েছে, অসতের মাঝে গতীর সেই প্রাণস্পন্দ। এই সংযোগ কোথা থেকে আসে? বিশ্বের মাঝে আবর্তন, জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি প্রলয় একই তত্ত্ব বারবার আসে একই রঙ্গালয়ে। কবিতার ছন্দের মত, একটি ছত্রে যেখানে যতি, পরেরটিও সেখানে থামল, কিন্তু পুনরাবৃত্তি নয়। এই দৃষ্টিতে বিশ্বের গতির তাৎপর্য বোঝা যাবে, সামের ছন্দে বিষ্ণুশক্তি এগিয়ে চলে—এই তো great event! পুনরাবৃত্তিতে স্মৃতি থেকে যায়—"যথা পূর্বমকল্পয়ত"। একই ছাঁদ হলেও একেবারে একরকম নয়।

Ideaকে ফুটিয়ে তোলার যে প্রেষণা, শব্দরাশির এক ঘনবদ্ধ (compressed) আকূতি, তিনিই ওঙ্কার, The Word। তারপর আসে বিশ্বমূলের পার্থিব ভাব। আগে পর্যন্ত সব অপার্থিব অরূপ, তারই মাঝে ফুটে উঠছে রূপ...একদিকে পূর্ণ অপরদিকে অস্পষ্ট মায়ের বুকের যে আকূতি—an infant longing, একটি শিশুর ছবি। মা প্রসূত, তারই কোমনা দেখা দিল ঐ শিশুর মাঝে। পুরাণে বর্ণিত অনুরূপ চিত্র—প্রলয়ে প্রাণশূন্য থৈ থৈ করছে, বটপত্রে ভাসমান শিশু বিষ্ণু তারই মাঝে দেখা দিল। এই বিশ্বহসত্তার ভিতর দিয়েই সমস্যা ও পরে সমাধান পাওয়া যাবে।

চেতনার তিনটি ভূমি সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগ্রত (তন্দ্রা) এই তিন অবস্থায় অব্যক্ত প্রকৃতিতে আকূতির উৎসারণ। এর মূলে রয়েছে পুরুষের অনিমেষ প্রজ্ঞার দৃষ্টি, তাতেই অবচেতনের মাঝে জাগে চেতনার আভাস। পুরুষের ঐ প্রজ্ঞা দৃষ্টিতেই আভাস প্রভাসে পরিণত হবে। বিষয় আর বিষয়ীর মাঝে বিদারণ রেখা দেখা দিল, পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষের দিক থেকে অগ্রে ছিল কাম বা মনস রেতঃ, দিব্য পুরুষের সংবেগ প্রবেগ। ওই কাম

অস্পষ্ট, সুস্পষ্ট হলে হয় কল্প—সংকল্প। রূপায়ণের আবেগ থাকলেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তখনও পাওয়া যাচ্ছে না, আপ্তকামের স্বলসিত লীলা। প্রকৃতির মহা-তপস্যার গোড়াতেও এই অস্পষ্টতা। ওর পরের অবস্থা—eye of deity—ঈক্ষা, প্রাচীনেরা বলতেন আলোচন। এই লোচন, আলো যেন প্রকৃতিকে চঞ্চল করে তুলল। আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠলেও রূপরেখা তখনও দেখা দেয়নি—এই সবই নেপথ্যে। ৭৮

এই স্পর্শই যান্ত্রিকতা ভাঙার জন্য শক্তিপাত (Intervention)। অলক্ষ্যে কে যেন আমাকে ছুঁয়েছে—কাম, ঈক্ষা, শক্তিপাত তাঁর প্রসাদ, কিন্তু কি পাব, তখনও তা বোঝা যায়নি। বিশ্বপ্রকৃতিতে (আমাদের মনোজগতে) একটি ছায়া পড়ল, ভাব গাঢ় হল। বিষয় (subject) যেন বিষয়ী (object) থেকে পৃথক হতে চাইছে; বিষয়ী কিন্তু স্বীয় অন্তরের মহিমাকেই আস্বাদন করবেন, বিষয় নিজেকে জানবে। এর মধ্যে আবার দেখা দিল কালের সংস্কার। নেপথ্যে প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ, একটা কিছুর তখনও অপেক্ষা —আবেশ, God-touch। A sense was born...All can be done if the God-touch is there। এই আবেশে ফুটে ওঠে কোন্ সুদূরের অস্পষ্ট স্মৃতি। অব্যক্তের মাঝে রূপরেখা দেখা দিতে থাকে। ঋগ্বেদে তাঁকে বলা হয়েছে ত্বষ্টা, যিনি অব্যক্তের মাঝে আকৃতি বা বিকৃতি সৃষ্টি করেন। আর সেই উন্মুখীনতার মাঝে আবির্ভূতা হন গৌরী, চঞ্চলা ঊষা তিনি হাম্বারব করলেন (গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষতি)—শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন The Word, The Name, সেই নামের স্পন্দ। যা ছিল অপ্রকেত সলিল, ত্বষ্টার তক্ষণে তাতে রূপরেখা দেখা দিল। তখনও কিন্তু thrill of transfiguring touch—স্বপ্নের অবস্থা। জানিনা কি পাব, কিন্তু প্রাপ্তির আশ্বাসে চেতনা রোমাঞ্চিত।

Persuaded the inert black quietude
And beauty and wonder disturbed the fields of God

সাধকের স্বপ্নচেতনায় যেন জগতের আবির্ভাবে, অব্যক্ত হল আভাস। সুষুপ্তির আদিক্ষণে যে বিদারণরেখা দেখা দিয়েছিল, সে-রেখা আরও বিস্তৃত হয়ে একে একে দেবীমার সব অপাবৃত হয়ে গেল। স্বপ্নে যার খোলা, তাই কিছু অস্পষ্টতা...আধিদৈবত দৃষ্টিতে বলতে হয় নূতন উষার তোরণ দেখা দিল। যখন এমনি করে আলো এসে পড়ে, যা গুহাহিত, গর্ভিত ছিল এই পৃথিবী সেই অব্যাকৃত, উষার ঐ আলোয় দেখা দেয় ভর্গ তেজে। অন্ধকার তো শূন্য নয়, তার রূপ আছে। যা শুয়ে আছে, তার মধ্যে চেতনার আভাস সে চিন্ময়, তা ঠিক অব্যাকৃত বলা চলে না, পৃথিবীও চিন্ময়ী তার স্বরূপে। আমার মাঝে যা ছিল তমোঘন; যার আদি একেবারে নিরেট নিরাশ্বাস, আলো আঁধারির দ্বন্দ্বে সেই আধারের মাঝেকার অব্যক্ত বেদনা দূর হল, সব কিছু চিন্ময় বিদ্যোদিত হয়ে উঠল। এ যে স্বপ্নের লিপি। বারবার আলো পড়ে, আর আধারের সামনে সব কিছু আলোর অভিষিক্ত হয়ে উঠতে থাকে। দিকচক্রবাল থেকে আলোর ধারা মূর্ধণ্যচেতনাকে আলোকিত করেছে। অন্ধকার আছে, তবুও যেন নেই, সূর্যোদয়ের পূর্বেকার সেই চিত্র। তারপর এই অব্যক্তকে রূপান্তরিত করতে আভাস প্রভাস হয়ে উঠল, এই হল উষার আবির্ভাব—The Symbol Dawn। এর মধ্যে আলোর লুকোচুরি আছে, এই আছে এই নেই।

কবির ভাষায় "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই...। এই রকম চলে বহুদিন পর্যন্ত, বারবার সেই চিরন্তনী উষার বিদ্যোতনে উজ্জ্বলতা বেড়ে চলে ও শেষে পরমসত্তা চেতনায় ধরা দেয়। আশ্বাস স্থির থাকে, যেন দ্যুলোক থেকে নুয়ে পড়েছে সেই পরম প্রকাশ। প্রাতিভ সংবিৎ ঝলকে ঝলকে ধারার মত নামতে থাকে। এই হল অব্যাকৃতের ব্যাকৃতি—সৃষ্টির উন্মেষ, সহজের ধারা বয়ে চলে। যে সাধক সেই ভাগ্য লাভ করেন, তার উষার উদয়ের পর্ব চলতেই থাকে। সাধনার মাঝে কৃচ্ছ্রতার বোধ থাকে না। আবরণ-গুলি সব একে একে উন্মোচিত হতে থাকে। সহজ চেতনার আলো নুয়ে পড়ে আধারকে ছুঁয়ে দিলেই আলো জ্বলে ওঠে। এই সাধকদের সাধনায় প্রথম দিকেই, দীপ্ত সূর্যের আলোর পরিপূর্ণ মহিমায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তার লক্ষ্য, তার পরম প্রাপ্তি। কিন্তু তা থাকে না, যেন সব পাওয়া হয়ে গেল, তারপরই কিছু নেই...তারপর এষণা চলতে থাকে..."ক্ষ্যাপা খুঁজে মরে পরশ-পাথর"। কিন্তু কেন?

নিয়তির যিনি স্রষ্টা তিনি স্বেচ্ছায় তাকে বেঁধেছেন, তাকে যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে দিয়ে পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে তিনি পারেন। তাই শক্তিপাত, তাঁর অনুগ্রহের করুণার ধারা স্বচ্ছন্দ ধারায় মুক্তি পাবে, এই আশ্বাসে 'কান পেতে রই'। তাই সাধক ও আর ফিরে যেতে পারে না, আবর্তন বিবর্তন হয়, সাধকের হয় গোত্রান্তর। স্রোতে ঝাঁপিয়ে যখন পড়েছি, ভেসেই চলব, নিশ্চিত জানি, সমুদ্রে পৌঁছাবো—এই তার জোর ভরসা।

এই ভাবে অব্যাকৃত যাকে বলি, তাতে চিন্ময় রূপ দেখা দেয়। এই মৃন্ময়ী পৃথিবীর মাঝে প্রচ্ছন্ন যে চিন্ময়ী—'হিরণ্যবক্ষা অদিতি' তাঁর রূপই ফুটে ওঠে—তখন Epiphany was disclosed। আর দেখা দিল A face...A form—এবার রূপের আগুন সর্বত্র তিনি জ্বালিয়ে দিলেন। এই দিব্যরূপ বিশ্বতোশ্চক্ষুর আত্মরূপের প্রতিমা। শিব যখন সমাহিত, সতী অন্তর্লীন, তিনিই আবার পার্বতী উমা রূপে সামনে, চেতনার এই সোনা অন্তরে বাহিরে। একবার যেন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখা হল....এ রূপই যে word, immortality, অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা। সাধক জীবনে এই রকমে শক্তিপাত সত্য হয়। মায়ের ক্রিয়া সত্য হয়ে ওঠে। প্রতি পর্বে সাধক বুঝতে পারে, রূপান্তর হয়ে চলেছে। এরপর যা আসে, তা জাগ্রত ভূমি। তখনই দৃষ্টি ধারা বিচ্ছিন্ন হল এই রকমটা বোধে আসে। বিশ্ব জাগল, ইন্দ্রিয়বুদ্ধি জন্মাল। তখন সুষুপ্তির সম্ভোগে যা-পাওয়া, স্বপ্নের যা দর্শন তাকে কেমন ভাবে লাভ করা যাবে? সমাধির ব্যবধানে যেমন প্রাকৃত জীবন আচ্ছন্ন করে চেতনাকে, কিন্তু স্মৃতি থাকে। মহাপ্রকৃতির দৃষ্টিতে ফোটে বিশ্ব-ভুবনের কল্পনা, শক্তির এবার উন্মেষ ঘটবে। তিনি যেন চোখ বুজে ছিলেন নিমেষে, আর উন্মেষে ফুটল অপরূপ বিশ্ব, তাকে আমরা দেখতে পাইনে। এই সীমিত পৃথিবী, দূর থেকে তাও যে অপরূপা। আলো আঁধারের যে খেলা সবই অপরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আশ্চর্যবৎ এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টি। সাবিত্রী কাব্যে, এই অপরূপার চোখের সামনে আলোর এই বিশাল জগৎ ফুটে উঠেছে। কবি বারবার তার কথা বলেছেন। সাবিত্রীর তপস্যা ও সিদ্ধি অরণ্যানীর পরিবেশে সঙ্ঘটিত, তার মাঝে মৃত্যু জন্ম দুঃখ সুখ আঁধার আলো হয়ে উঠছে, সে প্রকৃতি চিরনবীনা। বিশ্বপ্রকৃতির জাগরণে কবির বর্ণনা—"নির্ঋতি হল ঋতম্"। নির্ঋতির চরম মৃত্যু।

প্রগতির দু'টি দিক—পূর্ব ও উত্তর, দু'দিকের বিলম্বিত কোণ ঈশান অপরাজিত দিক। বিপরীত দিক হল নৈর্ঋত। যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেটাই মৃত্যুর দিক ধরলে অপরদিকে চেতনার অপরাজিত মহিমা। নির্ঋতি আপেক্ষিক, তাই ক্ষণিক। চিরতরুণী এই শ্যামা পৃথিবী, তার মধ্যে চলেছে ঋতুর আবর্তন। তাই জগৎ এক অপরূপ কাব্য। মৃত্যুর পরে অমৃতের আভাস পরমা প্রকৃতির আলোয় হাসিতে ধরা পড়ে। All grew consecration and rite—অন্তরীক্ষে যে মহাপ্রাণ স্পন্দিত তার আনন্দ অরণ্যে পর্বতে উল্লসিত, সে উল্লাস উথলে ছাপিয়ে পড়ছে। বিশ্বমৃত্যু এখনও চলছে, এর ছায়া নির্ঋতির খেলা। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্যুলোকের উপান্তে হাসির খেলায় অমৃতের নির্ঝর বয়ে চলেছে, পৃথিবী নিঝুম হয়ে সেই ধারাসার গ্রহণ করেছে, ঘুমের মত তাকে লালন করেছে। এরপরে আর এক লীলা—যে নির্ঋতি প্রকাশের দ্বারা পরাভূত, তাকে মুক্তি দেওয়া হল। এই দ্বন্দ্ব অথচ এই নৈশ্চিন্ত্য কেন? তার উত্তর দেওয়া যায় না।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞাচক্ষুর সামনে উদ্ভাসিত চিত্র দেখালেন, তা সুন্দর। এই সৌন্দর্য আর ঐ দৃষ্টিপাত, এই দুয়ের মাঝে সেতু হয়ে রয়েছে প্রেমের মহিমা। এই প্রেমই সাবিত্রী কাব্যের মূল তত্ত্ব। এতক্ষণ পর্যন্ত যে অন্ধকার দেখেছি, তা সুসহ আলোর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। ইন্দ্র আদিত্য প্রজ্ঞাশক্তি আর বৃত্র আবরণ শক্তি, প্রজ্ঞা ও প্রাণ। অন্তরীক্ষে মেঘের সঙ্গে বজ্রের হানাহানি, লড়াই হয়। তারপর আলো ফোটে, স্মিতহাস্যের উদ্ভাসনতায় সব সহজ হয়ে যায়। কিন্তু যে আলো তখন এসেছিল সরে গেলে বজ্রশক্তির প্রয়োজন, এই এক আবির্ভাব। দিব্য আবির্ভাব যেন স্তিমিত হয়ে গেল, কিন্তু অগ্নিশিখাকে তো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। চেতনার মাঝে সূচীমুখ হয়ে ফুটে উঠল অভীপ্সার আগুন, তার বহ্নিতে চিৎকণ রূপে এই যে নিজেকে গুহাহিত করে রাখা, এই হল নিগূহণ (involution)। এর মাঝে চলে মৃন্ময়ের মাঝে রূপের ব্যাকৃতি। চিন্ময় সেই ব্যাকৃতি, তাতে ভাব রূপ নেয় এখানে। মৃন্ময়ী প্রকৃতি বিভিন্ন আকৃতি গড়ে তোলে। সুরু হয়েছিল অসম্ভূতি থেকে, তারপর স্বপ্ন। এবার উর্ধ্বায়ন। বিবর্তন শুরু হল জড়প্রকৃতি থেকে। তির্যক প্রাণী এল, তারপর ধীরে ধীরে মানুষ। এই মানুষের যে শ্রম, তার মাঝে প্রকৃতির তপস্যার গুরুভার, সে তার সবল স্কন্ধে বহন করে নিয়েছে। তার মধ্যে দুটি ভাবই দেখতে পাব—নেপথ্যে থাকে অসম্ভূতি, স্বপ্নসম্ভূতি তা থেকে অপর ভাগে আমাদের শক্তিতে বিবর্তন, প্রকৃতির ঊর্ধ্বায়ন কালের ধারা বেয়ে চলেছে। এই ইতিহাসের যুগসন্ধিতে সাবিত্রীর আবির্ভাব এক দিব্য চিন্ময় শক্তিপাত। নিয়তি অন্ধ, কিন্তু অনিমেষ দৃষ্টিতে সেও তাকিয়ে আছে, সে জানতে চায়। সাবিত্রীর আবির্ভাবের এই হল পটভূমিকা।

মোরিস মেটারলিঙ্ক

Maurice Macterlink

মোনা ভানা

Mona Vana

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত

(পুরাণো কাগজপত্র থেকে দু'টি অপ্রকাশিত অনুবাদ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি মেটারলিঙ্কের মোনা ভানা, অন্যটি দ্য মুসের ভেনিসীয় রজনী। অপ্রকাশিত অনুবাদ দু'টি সাহিত্যজীবনের আদিযুগের কীর্তি। তাদের পরিমার্জনা না করেই প্রকাশ করা হল।

সুবিখ্যাত ফরাসী রোমান্টিক কবি ও নাট্যকার দ্য মুসে ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বেলজিয়ান মেটার লিঙ্ক—দু'জনের এই দুটি নাটকে একই মূল সুর, দৈহিক প্রেম, পার্থিব প্রেম। তবে সে প্রেম শিল্পীর হাতে এত গাঢ় গভীর, উদার যে তা দেহকে কলঙ্কিত করতে চায় না, দেহাতিরিক্ত হয়ে উঠতে চায়। এ প্রেম প্রায় আত্মিক প্রেমের পর্যায়ে উঠে আসে—আবেগের সংযমে, আবেগের শুদ্ধতায়, আন্তরিকতার অকপটতায় তার সুরভিতে ফুটে ওঠে অতিন্দ্রিয়ের একটা মধুরতা—পাঠকের চিত্তও সরসিত সুরভিত হতে পেরেছে দেহাতীত মাধুর্যরসের কল্যাণে।)

পাত্র-পাত্রী

গিদো কোলোনা	পিসানগরীর সেনানিবাসের সেনাপতি
মার্কো কোলোনা	গিদোর পিতা
প্রিচিভাল	ফ্লোরেন্স নগরের বেতনভুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ
ত্রিভুলজিও	ফ্লোরেন্সের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি
বোর্সো	গিদোর সহকারী কর্মচারী
অরেল্লো	ঐ
ভেদিও	প্রিচিভালের সচিব
জিয়োভান্না (মোনা ভানা)	গিদোর পত্নী

অমাত্যবর্গ, সৈন্যসামন্ত, গ্রামবাসী, সাধারণ নরনারী, ইত্যাদি।

প্রথম ও তৃতীয় অঙ্ক পিসা নগর
দ্বিতীয় অঙ্ক নগরের সন্নিকটভাগ।

(পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে)

প্রথম দৃশ্য

গিদো কোলানার প্রাসাদের এক কক্ষ

প্রথম দৃশ্য

গিদো ও তার কর্মচারী বোর্সো এবং তোরেল্লো খোলা জানালার নিকট। জানালার ভিতর দিয়ে পিসানগরের গ্রাম্যভাগের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

গিদো

বিষম সঙ্কটাবস্থায় পড়ে গিয়েছি আমরা। তাই এতদিন ধরে সামন্তবর্গ আমাদের কাছে যে সকল বাধাবিপত্তির কথা গোপন রেখেছিল এখন বাধ্য হয়ে সে-সকল আমার কাছে স্বীকার করেছেন। ভেনিস যে দুইটি সেনাবাহিনী আমাদের সাহায্যকল্পে পাঠিয়েছিল তারা নিজেরাই ফ্লোরেন্সবাসী কর্তৃক অবরুদ্ধ—একটি বিবিয়েনা সহরে, আর একটি এলসি সহরে। ভেরনিকা, পিউজি এবং মন্তালোনের স্থলপথ, আর আরেজ্জো ও কাসেন্তিনের মত জলপথ, সবই শত্রুর হাতে। সকল দিক থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন। যে ফ্লোরেন্স একেবারে তরবিচ্ছল না হলে ক্ষমা কি জানেনা, তারই রোষ কবলে আমরা অসহায়ভাবে পড়ে গিয়েছি। আমাদের সৈন্যেরা কি পুরবাসীরা এসকল পরাজয়ের বার্তা এখনও জানে না। কিন্তু সে রকম জনরব একটা ক্রমেই গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। যখন তারা জানবে সত্য ঘটনা, তখন কি-ই না করে বসবে... তাদের ক্রোধ, নৈরাশ্য, আতঙ্কের ফলভোগ করতে হবে আমাদের এবং আমাদের সামন্তবর্গকে...এই তিনমাসব্যাপী অবরোধ, নিষ্ফল বীরত্ব, দুর্ভিক্ষ, এই যে এত কষ্ট তাদের মত খুব কম পুরবাসীকেই সহ্য করতে হয়েছে—এ সকলের দরুণ তারা এখন বেপরোয়া, বুদ্ধিশুদ্ধি তাদের লোপ পাবার মত। তবুও অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হলেও, একটিমাত্র আশায় তারা আমাদের মেনে চলছিল—সে আশাও তাদের বুঝি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এখন বাকী বিদ্রোহ, শত্রুর অপমান, পিসানগরের অবসান...

বোর্সো

আমার সৈন্যদের সব অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে গেছে। একটি তীরও নাই, একটা গুলিও নাই, মাটির নীচের সকল জায়গা উলটে-পালটে দেখলেও এক মুঠি বারুদ আর মিলবে না।

তোরেল্লো

আমি আমার শেষ গোলা গত পরশুদিন ছেড়ে দিয়েছি সান্ত-আন্তেলিও এবং ভাল্পাসের কেল্লার কামান গাড়ির উপর; আমার তীরন্দাজদের তরবারি ছাড়া আর কিছু নাই বলে তারা দুর্গপ্রাকারেও স্থান নিতে অস্বীকার করেছে।

বোর্সো

ঐ দেখুন ভেনিসীয় সেনারা আমাদের ঘরে যে দেয়ালটা রক্ষা করছিল তাতে প্রিন্সিভালের কামান কত বড় ফাঁক করে দিয়েছে...পরিসরে প্রায় শ'গজ হবে; একটা ভেড়ার পাল অবলীলাক্রমে তার ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে...এখানে আর দাঁড়াবার উপায় নেই। রোমানী পদাতিকরা, এস্‌কাডী এবং আলবানীরা আমায় বলেছে যে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই যদি আত্মসমর্পণের পত্র না স্বাক্ষর করা হয় তবে তারা সকলেই দল ভেঙ্গে চলে যাবে।

গিদো

প্রধানবৃন্দ দশদিনের মধ্যে বারবার তিনবার তিনজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন আত্মসমর্পণের সর্ত্ত ঠিক করবার জন্যে। কিন্তু তাঁরা কেউ আর এ পর্যন্ত ফিরে এলেন না...

তোরেল্লো

ক্রুদ্ধ পৌরবাসীর হাতে আমাদেরই রাস্তার উপর নিহত হয়েছে তাঁর সহকারী আন্তোনিও রেনো. প্রিন্সিভাল এ অপরাধ কখন মার্জনা করেন নাই। এই অজুহাতেই ফ্লোরেন্স আমাদের সভ্য সমাজ থেকে বের করে দেবার সুযোগ পেয়েছে, আমরা যেন অসভ্য বর্বর এই ভাবেই এখন আমাদের সাথে সে আদান প্রদান করতে চায়।

গিদো

কিপ্ত জনসঙ্ঘকে শান্ত ও সংযত করবার সাধ্যই আমাদের ছিল না, তারা ভুল-ক্রমে যা করেছে সে খুবই অন্যায় হয়েছে—এসব কথা বুঝিয়ে বলতে আমার নিজের পিতাকে পাঠিয়েছি। কিন্তু তিনিও ত ফিরলেন না...

বোর্সো

এই এক সপ্তাহ ধরে নগরের চারিদিক উন্মুক্ত, প্রাচীর ভগ্ন, কামান নিস্তব্ধ। তবে কেন প্রিন্সিভাল আক্রমণ করছে না? কোন মহলব ফেঁদে সে অপেক্ষা করছে? না, এ তার সাহসের অভাব? অথবা ফ্লোরেন্স থেকে কোন গুপ্ত আদেশ এসেছে?

গিদো

ফ্লোরেন্সের আদেশ চিরকাল গুপ্তভাবে চলে, কিন্তু তার অভিসন্ধি খুবই পরিষ্কার। পিসানগর বহু অনেকদিন ধরে ভেনিসকেই মিত্ররূপে ধরে রেখেছে, পূবের ঔপনিবেশিক ছোট ছোট রাজ্যগুলোর সামনে বড় খারাপ একটা উদাহরণ সে দেখাচ্ছে...পিসারাজ্যের ধ্বংস চাই...অল্পে অল্পে নিপুণভাবে চক্রান্তের সহায়ে এ যুদ্ধটি ডেকে আনা হয়েছে,

ফলত জোর করে অস্বাভাবিক নৃশংসতা ও শঠতা জাগিয়ে তুলে, আগামী প্রতি-হিংসার সমর্থক দিসাবে। আমার বিনা কারণেই সন্দেহ হয় না যে তারই গুপ্তচরের প্রেরণায় আমাদের গ্রাম্য লোকেরা রেগোকে খুন করেছে। আর বেছে বেছে প্রিঞ্চি-ভালের মত অসভ্য অশিক্ষিত বর্বর পাহাড়ীকে যে আমাদের বিরুদ্ধে পাঠান হয়েছে তারও যথেষ্ট হেতু আছে। এই প্রিঞ্চিভালই না প্লেসান্সনগর লুঠ করে স্বনামধন্য হয়েছে? লোকে বলে নাকি সেখানকার সকল পুরুষ বাসিন্দাকে নির্মূল করে পাঁচ হাজার স্বাধীন রমণীকে সে দাসী বলে বিক্রী করেছিল।

বোর্সো

এক্ষেত্রে কিন্তু লোকেদেরই ভুল। প্রিঞ্চিভাল নয়, কিন্তু ফ্লোরেন্সের প্রতিনিধিরাই এ হত্যা ও বীভৎস অত্যাচার করতে হুকুম দেয়। প্রিঞ্চিভালকে আমি নিজে কখন দেখি নাই, কিন্তু আমার এক ভাই তাকে চিনত। সে পাহাড়ী বটে, তার বাপ ছিল নাকি বাস্ক কিম্বা ব্রেতঁনী, ভেনিসের এক প্রহরী। তার জন্ম ছোট বংশে, একথা সত্য; কিন্তু লোকে যেমন মনে করে সে অসভ্য বর্বর তেমন সে নয়। হতে পারে বদরাগী, খেয়ালী, এমনকি লম্পট, নিষ্ঠুর কিন্তু আমি জানি তার মত সোজা মানুষ, তার মত ন্যায়নিষ্ঠ সহজে মেলে না—আমি নির্ভয়ে তার হাতে আমার তলোয়ারখানা তুলে দিতে পারি...

গিদো

ওটা যতক্ষণ তোমাকে রক্ষা করতে পারে ততক্ষণ কিন্তু তুলে দিও না। কার্যেই তার পরিচয় আমরা পাব, তখন বুঝব আমাদের দু'জনের মধ্যে কার কথা ঠিক। ইতিমধ্যে আমাদের যারা অবনতমস্তকে এবং হাত একটুও না তুলে এখান থেকে বের হতে দিতে চায় তাদের বিরুদ্ধে প্রয়াসের এই শেষ সুযোগ। প্রথমে জানতে হবে সৈন্যদের, দেশবাসীদের, নিরাশ্রয় গ্রামবাসীদের পরিপূর্ণ সত্যটি। তারা জানুক আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়নি, তারা যেন এমন নিরুপদ্রব যুদ্ধ নিয়ে না ভাবতে থাকে যেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুটি বিরাট সেনাদল যুদ্ধান্তে রণক্ষেত্রে পড়ে ছিল দুই বা তিনজন মাত্র আহত; এমন লৌকাত্র্যপূর্ণ অবরোধ নিয়েও নয় যেখানে জয়ী অচিরে হয় আশ্রয়দাতা এবং পরাজিতের প্রিয়তম বন্ধু। এ এক অন্তর্নিহিত যুদ্ধ যেখানে জীবন মৃত্যুর ছড়াছড়ি, যেখানে আমাদের স্ত্রী পুত্ররা...

দ্বিতীয় দৃশ্য

একই, মার্কো

(মার্কোর প্রবেশ। গিদো তাকে দেখিয়া আলিঙ্গনের জন্য কাছে ছুটিয়া গেল)

মু :

গিদো

বাবা। তুমি ফিরে এসেছ। আমাদের এত দুর্ভাগ্যের মধ্যে একি সৌভাগ্য, কি সুখের অঘটন! তোমার ত আর আমি কোন আশাই করিনি। ...তুমি কি আহত? অমন করে চলছ যে?...তারা কি তোমার উপর কোন উৎপীড়ন করেছে? তুমি পালিয়ে এসেছ? কি করেছে তারা?...

মার্কো

কিছুই করে নাই, বাবা! ভগবান আছেন। তারা ত মোটেই বর্বর নয়...অতিথি পূজার্হ, তারাও মানে—যেমন করে আদর অভ্যর্থনা করা উচিৎ, আমাকেও তেমনি ভাবেই করেছে। প্রিক্লিডাল আগে থেকেই আমার কথা জানে, আমার লেখা সবই তার পড়া আছে: প্লাতনের তিনখানি নাটক আমি যে পুনরুদ্ধার করেছি তা নিয়ে আমাদের অনেক আলাপ হল। হাঁটতে আমার কষ্ট হচ্ছে—সে আর আশ্চর্য্যের কি! আমার বয়স ত হয়েছে, আর আসছিও অতদূর থেকে...আচ্ছা, বল দেখি, প্রিক্লিডালের শিবিরে কার সাথে আমার সাক্ষাৎ হল?

গিদো

আমার সন্দেহ হয়: ফ্লোরেন্সের নির্ব্বল্ল প্রতিনিধিরা...

মার্কো

হাঁ্যা, তা সত্য। তারাও ছিল, বা তাদের একজন; আমি একজনকে শুধু দেখেছি ...কিন্তু সেখানে সর্ব্বপ্রথম যার সাথ পরিচয় আমার কাছে করা হয় তিনি হচ্ছেন মার্সিল ফিসিন, তিনিই পূজার্হ আচার্য্য যিনি প্লেতোকে উদ্ভাসিত করেন...মার্সিল ফিসিন যেন প্লেতোরই আত্মা পুনর্ব্বার পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে।...সকল মানুষের প্রতি যেখানে সেখানে যাবার পূর্ব্বে তার দেখা পাবার জন্য আমি জীবনের দশ বৎসর উৎসর্গ করতে প্রস্তুত...আমরা যেন ছিলেম দুটি ভাই, বহুদিন পরে যারা পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছে...আমরা হেসিওড, আরিস্তোত্ত, হোমার নিয়ে আলোচনা করতেম... তিনি আর্ণো নদীতীরে সেনানিবাসের কাছে অলিভবনানী মধ্যে বালুতলে নিহত এক দেবীর দেহ উদ্ধার করেছেন। এমন অনির্বচনীয় সুন্দর যে যদি তাকে দেখতে তবে মুগ্ধ তুমি ভুলে যেতে...আমরা আরো নীচে খনন করি: সে একখানি হাত পায়। আমি দুইখানি হাত মাটি থেকে বের করি, এত নির্ম্মল এত কমনীয় যে মনে হয় হাসি

সৃষ্টি করার জন্য, শিশির ছড়িয়ে দেবার জন্য, উষাকে আদর করবার জন্যই তারা গঠিত...একখানি হাতে এমন বঙ্কিম ভঙ্গি নিয়েছে হাল্কা আঙুলগুলি যেন অপর হাতটি তখন একখানি আরশির হাতল মুঠির মধ্যে ধরে ছিল...

গিদো

পিতা, আমরা যেন ভুলে না যাই যে একটা দেশশুদ্ধ লোক ক্ষুধায় প্রাণ হারাতে বসেছে, কোমল হাত আর পিতলের শরীরের ধারপাশ ধারে না...

মার্কো

সেহাটি মার্বেলের পাথরের।...

গিদো

হোক। কিন্তু আসুন, তার চেয়ে ত্রিশ হাজার জীবের কথা আমরা বলি—এক মিনিট বিলম্বের ফলে তা নষ্ট হতে পারে। আমার একটি চতুর কথায়, একটি সুসংবাদে হয়ত রক্ষা পাবে...একটি বড় বা ছিন্ন হস্তের জন্য আপনি সেখানে যান নাই... এরা আপনাকে কি জানিয়েছে? —ফ্লোরেন্স অথবা খ্রিষ্টিভাল আমাদের নিয়ে কি করতে চায়? —বলুন শীঘ্র, কিসের অপেক্ষায় তারা আছে? ...এই যে অভাগারা গবাক্ষের নীচে চীৎকার করছে তাদের আপনি শুনছেন না? পাথরের ফাঁকে যে ঘাস জন্মেছে তা নিয়ে এরা কাড়াকাড়ি করছে...

মার্কো

ঠিক কথা! আমি ভুলে গিয়েছিলাম তোমরা যুদ্ধ কর যখন বসন্ত আবার ফুটে উঠেছে। সুগোপিত রাজার মত আকাশ যখন প্রস্ফুটিত, সাগর যখন আলো-ভরা পাত্রটির মত ভেসে ওঠে যেন কোন নীলিমার দেবী আর এক নীলিমা দেবতাদের প্রতি তাকে প্রসারিত করে দিচ্ছে, পৃথিবী যখন এত সুন্দর এবং মানুষকে এত ভালবাসছে! তোমাদের আনন্দ এক রকম। আমি আমার নিজের সুখের কথাই কেবল বলছি। না, তোমরাই ঠিক বুঝেছ; যে সংবাদটি আমি নিয়ে এসেছি তা অবিলম্বেই তোমাদিকে আমার বলা উচিত ছিল...তাতে ত্রিশ হাজার জীবন রক্ষা হবে শুধু একটি জীবনের কষ্টের বিনিময়ে; কিন্তু তাতে এ-জীবনটি আপনাকে এমন গৌরব-মণ্ডিত করবার সুযোগ পাবে, যুদ্ধের সকল গৌরবের চেয়ে যা মহত্তর...একজনের উপর ভালবাসা খুব প্রীতিকর খুব প্রশংসনীয়, কিন্তু যে ভালবাসা বড় হয়ে আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে তা শ্রেষ্ঠতর...সুরক্ষিত সরল, একনিষ্ঠতা এক ভাল গুণ; কিন্তু এমন দিনও আসে যখন অন্যদিকে দৃষ্টি দিলে এ সকলকে ছোট বলে মনে হয়... এই দেখ...কথার শুরুতেই আত্মহারা হয়ে এমন দিব্যি গেলে বস না যাতে আমাদের পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ হয়, যাতে বুদ্ধির গতি প্রয়োজন মত খেলার বাধা পায়...

গিদো

(কর্ম্মচারি সকলকে সরিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন)

তোমরা যাও...

মার্কো

না, থাক...এ যে আমাদের সকলেরই ভাগ্য নির্ণয় হতে যাচ্ছে...আমি বরং চাই আসন্ন মৃত্যু থেকে যাদেকে আমরা পরিত্রাণ করতে যাচ্ছি তাদেকে দিয়ে কথাটি ভরে উঠুক, যে সকল দুঃখীজনকে আমরা রক্ষা করতে উদ্যত জানালা দিয়ে তারা যেন শুনতে পায় কি মুক্তিসংবাদ আমি নিয়ে এসেছি। আর শুনে সে কথা যেন সাদরে বরণ করে, চিরকালের জন্য হৃদয়ে গেঁথে রাখে। সত্যই আমি মুক্তি নিয়ে এসেছি, যদি শুধু তোমাদের সাধুচ্ছা তাকে গ্রহণ করে। আর একটি মহাভুল ছাড়া মুক্তির সমান ওজন হয় না, আর আমার ভয় হচ্ছে শুধু ওজনে নয়, নিজেকেও...

গিদো

পিতা, আপনাকে মিনতি করি, এ সব হেঁয়ালি ছেড়ে দিন। কি এমন জিনিস দরকার যার জন্য এত কথা প্রয়োজন? আমরা সব শুনতে প্রস্তুত। আমরা এমন অবস্থায় এসে পড়েছি যখন কিছুই আর আশ্চর্য্যজনক মনে হয় না...

মার্কো

শোন তবে, আমি খ্রিষ্টিভালের দেখা পেয়েছি ও তার সাথে কথা বলেছি। যে মানুষকে আমরা ভয় করি তাকে কি অশুভরূপে, কি ভুলভাবে না চিত্রিত করি...খ্রিষ্টাব্দের মত আমি যেন একিলিসের শিবিরে যেতেছিলেম...ধারণা ছিল আমার সাক্ষাৎ হবে একজন দাম্ভিক নির্ব্বোধ বর্ব্বরের সাথে, সর্ব্বদায় ভরে রক্তে রঞ্জিত, নেশায় ভরপুর। লোকে যেমন তাকে অঙ্কিত করে, কেমন এক উন্মাদ, যুদ্ধক্ষেত্রই তার প্রতিভা বজ্র-রেখা সনে মেলে, কিন্তু কিন্তু কোথা তার উৎপত্তি তা কেউ জানে না...আমার ধারণা ছিল যার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি সে যেন রক্ত-পিশাচ, বিকৃতমস্তিষ্ক, নিষ্ঠুর, আত্মম্ভরী, কৃতঘ্ন, লম্পট...

গিদো

খ্রিষ্টিভাল এই রকমই বটে তবে শুধু সে কৃতঘ্ন নয়।

মার্কো

ঠিক কথা। সে বিশ্বাসী...তার প্রোটেস্টের অনুগত সে হোক না কেন! দুইবার এ কথার প্রমাণ সে আমাকে দিয়েছে।

মার্কো

কিন্তু আমি যে মানুষ দেখলাম সে ভাবগরিষ্ঠ শিষ্য, যেমন গুরুর সম্মুখে অবনত তেমনি আমার সম্মুখে অবনত হয়ে পড়ল। সে বিদ্বান, বাক্‌পটু, জ্ঞানের সেবক, বিজ্ঞানের

জিজ্ঞাসু। ধীরভাবে সে শুনতে জানে, সকল রকম সৌন্দর্যেরই গুণগ্রাহী। তার হাস্যে বুদ্ধিমত্তা বিলসিত। করুণ কোমল তার স্বভাব। যুদ্ধ সে ভালবাসে না। মনের বৃত্তির, স্থূলপদার্থের অনুসন্ধান করে সে নিভৃত কারণটি। নিজের অন্তরে দৃষ্টিপাত করতে সে জানে; বর্শবুদ্ধি ও একাগ্রতা পূর্ণমাত্রায় তার আছে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে কৃতঘ্ন এক রাজ্যের সেবা করছে। জীবনের আশাগত আবর্ত্ত, হয়ত বা নিয়তিই তাকে অস্ত্রশস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করছে, আর যে গৌরব সে ঘৃণা করে, যা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় তার দিকেই টেনে নিয়ে চলেছে। কিন্তু এখনও একটি কামনা পূরণ করবার অপেক্ষায় সে আছে। সে এক উৎকট কামনা। সে রকম কামনা এমন অনেকেরই থাকে যারা মনে হয় জন্ম নিয়েছে এমন এক নক্ষত্রে যার ফল বিপুল অপূরণীয় ভালবাসা...

গিদো

পিতা, ভুলে যাবেন না অনাহারে যারা মরণাপন্ন তাদের পক্ষে এ রকম অপেক্ষা করা কতদূর দুঃসহ। এ অনাবশ্যক গুণকীর্ত্তনে প্রয়োজন নাই। যে মুক্তিবাণী আমাদেকে বলবেন প্রতিশ্রুতি করেছেন শুধু তাই বলুন।

মার্কো

ঠিক কথা। আমি বোধহয় অনর্থক বিলম্ব করছি। ইহলোকে যে দুইটি প্রাণকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি তাদের পক্ষে সে কথা যতই কষ্টকর হোক না...

গিদো

আমার ভাগ আমি নিতে প্রস্তুত, কিন্তু অপর ভাগ কার জন্য...

মার্কো

শোন আমার কথা। আমি...এখানে এসে কি উদ্ভট কি কঠোরই না মনে হচ্ছিল। কিন্তু আবার অন্যদিকে পরিত্রাণের এমন মহৎ সুযোগ...

গিদো

বলুন!...

মার্কো

ফ্লোরেন্স আমাদের নির্মূল করতে দৃঢ়বদ্ধ। সমর পরিষদের নায়করা এটি অবশ্য-প্রয়োজন বলে নির্দ্ধারণ করেছে আর সাধুগণ এঁদের আদেশ সমর্থন করেন। সে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল নেই। কিন্তু কপাট সাধুবানী ফ্লোরেন্স যে মানবজাতিকে এক সভ্যতা দিয়েছে তারই চোখের সামনে এ দোষটি বহন করতে চায়না যে সে জয়ী হয়েছে অতিমাত্র রক্তপাত করে। সে ফোট করবে যে এক অনুকূল শর্ত্তে আক্র-

সমর্পণের সুযোগ দিলেও পিসা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। নগরী আক্রমণপূর্বক অধিকার করা হবে। তার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া হবে স্পেন ও জর্মন দেশীয় পেশাদার সৈন্যের দল। আর এদেরকে কোন বিশেষ আজ্ঞা দেবার প্রয়োজন হয় না যখন ব্যাপার শুধু বলাৎকার, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, হত্যাকার্য...তাদের অধ্যক্ষ সকলের হাত থেকে নিষ্কৃতি-টুকু পেলেই হল। আর সেদিন তাদের অধ্যক্ষরা নিজেদের অক্ষমতা দেখাতে বিশেষ দক্ষতাদের জন্য এই ভাগ্য নির্দ্ধারণ করা আছে। আর আশা করতেও যতখানি সে সাহস পায় না—তাও অত্যাচারের মাত্রা যদি ছাড়িয়ে যায় তবে রক্তবর্ণ লিলি ধ্বজাটির নগরীই সর্ব্বপ্রথম অনুতাপ দেখাবে। বলবে যে সকলই ব্যবসাদার সৈন্যদের আকস্মিক অবাধ্যতার ফল। বিরক্তির ভাব দেখিয়ে তখন কর্ম্মচ্যুত করে তাদের দল ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু সে শুধু আমাদের ধ্বংস সাধনের পর যখন তাদের সাহায্যের আর কোন প্রয়োজন বোধ করবে না...

গিদো

ফ্লোরেন্সেরই অনুরূপ কার্য বটে।

মার্কো

ফ্লোরেন্সের প্রতিনিধিগণ খ্রিস্টিভালকে যে গুপ্তাদেশ মুখে মুখে জানিয়েছে তা এই। আটদিন ধরে তারা এই শেষ আক্রমণটি করতে, তার উপর জোর করছে। এ পর্য্যন্ত নানা ছলনায় সে এ কার্য্য স্থগিত করে রেখেছে। অপরপক্ষে সে প্রতিনিধিদের অনেক চিঠি হস্তগত করেছে। তারা তার সকল গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য নিযুক্ত। এ সকলে সামন্তমণ্ডলীর কাছে তারপর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনেছে। ধ্বংস হলে, যুদ্ধের অবসান হলে, ফ্লোরেন্স নগরে তার জন্য রয়েছে সেই উৎপীড়ন আর মৃত্যু—পূর্ব্বে আরো একাধিক সেনাপতি যারাই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল তাদের জন্য ছিল যা। সুতরাং সে জানে তার ভাগ্য কি।

গিদো

উত্তম। এখন তার প্রস্তাব কি?

মার্কো

তার নিজের গড়া একদল তীরন্দাজের দায়িত্ব সে নিয়েছে—অবশ্য এমন তরল অতি অসভ্যের যতখানি দায়িত্ব নেওয়া যায়—সেটুকু সে নিয়েছে। সে যা হোক, একশত জনের এক রক্ষীদল সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। এরা তার একান্ত অনুরক্ত। আর এরাই হবে তার সেনাদলের কেন্দ্র। তোমাদের কাছে তার প্রস্তাব এই যে তাকে যারা অনুসরণ করতে চাইবে তাদের সকলকেই যেন পিসানগরে যেতে পথ ছেড়ে দেওয়া হয়—যে সেনাবাহিনী সে ছেড়ে চলে আসছে তার বিরুদ্ধে পিসানগরী রক্ষা করতে।

গিদো

কিন্তু আমাদের অভাব ত আর মানুষের নয়। আর এমন বিপজ্জনক বিত্রের আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা চাই গোলা, বারুদ, রসদ...

মার্কো

বেশ। তিনি পূর্ব্বে থেকেই বুঝেছিলেন যে এমন প্রস্তাব তোমাদের সন্দেহজনক বোধ হবে ও তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করবে। সুতরাং তিনি আর একটি কর্ম্মের ভার নিলেন। শিবির আবাসে তিনশ গাড়ী বোঝাই গোলাগুলি ও খাদ্যসম্ভার এই সবেমাত্র উপস্থিত হয়েছে। এ সকল তিনি নগরের মধ্যে আনিয়ে নেবেন।

গিদো

কি রকম?

মার্কো

তা আমি জানিনা। যুদ্ধের রাজনীতির সে সব কূটকৌশল তা আমি কিছু বুঝি না। তবে যা সে করতে চায় তা সে করে। যতদিন সামন্তরাওলী তাঁকে না কর্ম্মচ্যুত করছে ততদিন ফ্লোরেন্সের প্রতিনিধি সকল সত্বেও সেই হচ্ছে তার সেনানিবাসের একমাত্র কর্ত্তা। আর এ ঠিক জয়ের পূর্ব্বাহ্নে, সেনাবাহিনী এদের আপন শীকার করতলগত করেছে, এদের তার প্রতি অগাধ আস্থা। এ সকল কথা ভেবে তাকে কর্ম্মচ্যুত করতে তাদের সাহস হবে না। সুতরাং সুযোগের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে...

গিদো

তা হোক। বুঝলাম সে আমাদেকে রক্ষা করতে চায় নিজের রক্ষার জন্য, পূর্ব্ব হতেই প্রতিশোধ নেবার জন্য। কিন্তু কিন্তু একাজ সে ত আরও সুচারুরূপে আরও কৌশলে করতে পারত। শত্রুকে এত অপার করুণা দেখিয়ে তার লাভ কি? সে কোথায় যেতে চায়, কি করতে চায়? বিনিময়ে কি কি যাচ্ঞা তার?

মার্কো

বন্ধু। নিষ্ঠুর কঠোর বাক্যটি বলবার এই যে সময় উপস্থিত...বৎস এই যে মুহূর্ত্ত যখন দুইটি বা তিনটি কথা মাত্র যেন নিয়তির বলে বলীয়ান হয়ে উঠে, আপন বলি খুঁজে নেয়...একথা ভেবে আমি শিউরে উঠছি যে আমার কণ্ঠধ্বনি, আমার বলবার ভঙ্গিমা এতগুলি জীবন হানি করতে পারে, এতগুলি জীবন রক্ষা করতে পারে...

গিদো

আমি বুঝতে পারছিনে...কথা যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন তার ভারে সত্যকার বিপত্তি কিছু গুরুতর হয়ে উঠে না...

মার্কো

আমি পূর্ব্বেই তোমায় বলেছি। প্রিঞ্জিভালকে স্থিরচিত্ত বলেই বোধহয়। বুদ্ধিমান ও করুণাপর...কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন স্থিরচিত্ত কে আছে যার মধ্যে একটা পাগলামি নেই। কে এমন মানুষ আছে সাধু হয়েও যে কখন একটা উৎকট ভাব পোষণ করে নাই? দক্ষিণে রয়েছে ধী, দয়া, ন্যায়পরতা, বামে কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস, বাসনা, রিপু, আর কি কে জানে? আছে উন্মত্ততা অবিরত—যার মধ্যে আমাদের পদস্খলন হচ্ছে...আমি নিজেই তাতে পড়েছিলাম, তোমরাও বোধহয় পড়বে...মানুষ যে এই রকমই...এমন দুঃখ তোমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত যার স্থান হওয়া উচিত নয়...আর আমি নিজে স্পষ্টই যে দেখেছি এ দুঃখ যতখানি দুর্ভাগ্যের ছায়া বলে মনে হয় ততখানি তা সে নয়, আমিই আমার অবুঝ দুঃখ হতে এমন অজীকার করে এসেছি...আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তোমরা যদি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর তবে শত্রু শিবিরে আমি ফিরে যাব...আমার ভাগ্যে কি ঘটবে?...খুব সম্ভব উৎপীড়ন আর মৃত্যুই হবে নির্ব্বোধের মত সত্য পালনের পুরস্কার...তবুও আমি যাব...আমি বৃথাই নিজেকে বুঝাই যে আপন চোখে খাঁটি দেখার জন্যই আমি আমার এ পাগলামির অবশেষটুকুকে সোনালী সাজে সাজাব; যে পাগলামির নিন্দা করছি সে পাগলামি আমায় করতেই হবে। কারণ আমার বিচারবুদ্ধিকে অনুসরণ করবার মত শক্তি আমার আর নাই...কিন্তু আমার কথা যে বলছি না...ওঃ! এই যে বুঝি আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে; কথার সাথে কথা গুলিয়ে ফেলছি, শব্দের পর শব্দ পুঞ্জীভূত করছি—শেষ মুহূর্ত্তকে একটুখানি দূরে সরিয়ে দেবার জন্য...কিন্তু বোধহয় তোমাদের উপর এতখানি আস্থাহীন হওয়া আমার ভুল হয়েছে। শোন তবে, এই যে আমার স্বচক্ষে দেখা বিপুল দ্রব্যবাহিনী, এই যে আহার্য্যসম্ভার, এই গোধূম পরিপূরিত শকটশ্রেণী, এই যে মদ্যে কলে, শাক-শাকসবজিতে ভরা আরও কত শকট, এই যে মেষপাল বৃষপাল মাস মাস ধরে একটা দেশের লোকের জীবন রক্ষা করতে পারে, এই যে সব বারুদের পিপে, গুলির থলি যাতে করে ফ্লোরেন্সকে পরাজয় ও পিসাকে পুনর্জীবিত করা যাবে। এ সব আজ থেকেই নগরের মধ্যে আসতে থাকবে—যদি বিনিময় তোমরা প্রিঞ্জিভালের উপ-ভোগের জন্য তাকে শুধু একটি রমণী পাঠাও। ভোরের আলো না ফুটতেই সে তাকে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তার দাবি জয় ও আত্মসমর্পণচিহ্ন একটি প্রতীক; তাকে আসবে হবে একাকী এবং আলখাল্লার আড়ালে বিবস্ত্র...

গিদো

কে? কাকে তবে আসতে হবে?

মার্কো

ফিওভান্না...

গিদো

কে ? আমার পত্নী ?...ভান্না ?...

মার্কো

হ্যাঁ ; তোমার জিওভান্না...যেমন আমি বলেছি।...

গিদো

তার যদি এরকম বাসনাই তবে আমার ভান্না কেন ? আরও সহস্র রমণী আছে...

মার্কো

কারণ সে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও তাকে সে ভালবাসে...

গিদো

তাকে সে ভালবাসে ?...কোথায় সে তাকে দেখছে ?...সে ত তাকে চেনে না।...

মার্কো

তাকে সে দেখেছে ও চেনে। কিন্তু একথা বলতে চায়নি কতদিন থেকে কি রকমে...

গিদো

কিন্তু জিওভান্না কি তাকে দেখেছে ?...জিওভান্নার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় ?...

মার্কো

ভান্না কখন তাকে দেখে নাই। অন্ততঃ সে কথা তার স্মরণে নাই।

গিদো

আপনি কি করে জানেন ?

মার্কো

ভান্না নিজেই আমাকে বলেছে।

গিদো

কখন ?

মার্কো

তোমার সাথে আমার দেখা করবার পূর্ব্বে।

গিদো

আর আপনি তাকে ওকথা বলেছেন ?...

মার্কো

সব।

গিদো

সব? ...কি...এ ঘৃণিত সওদাগরির ব্যাপারখানি? ...আর সাহসও আপনার কুলিয়েছে?

মার্কো

হাঁ।

গিদো

আর কি প্রত্যুত্তর সে দিয়েছে?...

মার্কো

প্রত্যুত্তর সে দেয় নাই। শুনে তার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে উঠল। কথাটি না বলে সরে গেল।

গিদো

বেশ করেছে। এই ত আমি চাই!...সে ত গর্জে লম্ফ দিয়ে উঠতে পারত, আপনার মুখমণ্ডলে ফুৎকার দিতে পারত, অথবা আপনার পা-খানি জড়িয়ে ধরতে পারত... না, ভালই করেছে...মুখখানি নত করে সরে যাওয়া। ...স্বর্গের পরী এমনটিই করত...এ ত ভদ্রার মতনই কাজ। কিছু না বলাই ত উচিত। আর আসুন আমরাও এ সম্বন্ধে কিছু বলব না...দুর্গ প্রাকারে, আমাদের স্বস্ব স্থান অবিলম্বে আমরা অধিকার করব। যদি সেখানে মরতেই হয় তবে মরব কিন্তু পরাভবের সাথে আর কালিমা মেখে নয়...

মার্কো

বৎস, তোমার ভাব আমি হৃদয়ঙ্গম করছি। এ পরীক্ষা তোমার পক্ষে যতখানি শোকাবহ আমার পক্ষেও প্রায় ততখানি, কিন্তু আঘাত যখন পড়েছেই তখন ধৈর্য্য ধরা যাক, বিচার বিবেচনাকে সময় দেওয়া যাক কর্ত্তব্য আর ব্যক্তিগত দুঃখের মধ্যে পার্থক্যটি ধরতে।

গিদো

এমন ম্যকুকারজনক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একমাত্র কর্ত্তব্য আছে। আর যতই আমরা ভেবে দেখি না, সে কেবল এমন কাজের বীভৎসতা যে তার মাত্রাকে বাড়িয়ে দিতে থাকবে...

মার্কো।

তবুও, নিজেকে জিজ্ঞাসা কর ত, যে বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী তাকে কয়েকটি তুচ্ছ ঘন্টার জন্য দূরে রাখবে বলে একটা সমস্ত জনপদবাসীকে মৃত্যুর কবলে ধরে দেওয়ার তোমার কি অধিকার। কারণ নগর যখন অধিকৃত হবে, তখন ভান্না ত বিজয়ীর করতলগত...

গিদো।

না...এ আমার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার...

মার্কো।

হোক কিন্তু সহস্র সহস্র জীবন। বুঝাও তুমি নিজেকে এ যে অনেক। এবে অঙ্ক মাত্র। এ ত ন্যায়ানুমোদিত নয়। তোমার নিজের সুখস্বস্তি রক্ষা শুধু যদি এর উপর নির্ভর করত তবে এ দুয়ের মধ্যে মৃত্যুকেই তুমি বরণ করতে। এ কথা আমি বুঝতে পারি। আমি জীবনের শেষপ্রান্তে উপস্থিত, অনেক মানুষ আমি দেখেছি, সুতরাং মানুষের অনেক দুঃখ কষ্টও দেখেছি; এখন আমি নিজে কিন্তু মনে করি শারীরিক মানসিক যে কোন কষ্ট হোক না মৃত্যুকাল যাতে করে বিলম্বিত হয় তা ছেড়ে যে মৃত্যু, যে ঘোর হিন মৃত্যু তার শাশ্বত নীরবতাকে বরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; সে যা হোক, সহস্র সহস্র জীবের কথা, আপন ভ্রাতৃতুল্য সহকর্মী, নারীকুল, শিশুকুল নিয়ে কথা...এক পাগলে তোমায় যা করতে মিনতি করছে, তুমি কর সে কাজটি। তোমার কাছে যা বীভৎস বলে বোধ হচ্ছে, পরে প্রাণে বেঁচে থাকবে যারা তাদের কাছে বীরকর্ম্ম বলেই বোধ হবে, তারা তোমার কাজটিকে দেখবে আরও তৃপ্তির চোখে এবং আরও ন্যায়সঙ্গত এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে...আমার কথায় বিশ্বাস কর, একটি জীবনকে রক্ষা করার চেয়ে মহত্তর কিছুই নাই। এর তুলনায় সকল পুণ্য, মানুষের সকল আদর্শ, যার নাম দাও মর্য্যাদাসম্পন্ন একনিষ্ঠতা, আরও কত কি, সকলই শিশুর খেলা মাত্র...তুমি অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেও শুদ্ধ থাকতে চাও, বীরের মত তা পার হতে চাও। কিন্তু মৃত্যু ব্যতীত বীরত্বে আর যে কোন লক্ষ্য নাই এও ভুল ধারণা। যে কর্ম্ম সব চেয়ে কঠোর সেই কর্ম্মই সবচেয়ে বীরত্বব্যঞ্জক। আর জীবনের অপেক্ষা মৃত্যু অনেক সময়েই কম কষ্টকর।

গিদো।

আপনি কি আমার পিতা?...

মার্কো।

সেই ত আমার গরব...আজ তোমার সাথে আমার দ্বন্দ্ব কিন্তু সেই সঙ্গে আমার নিজের সাথে নিজের দ্বন্দ্ব চলেছে...আর তুমি অতি সহজেই যদি আত্মসমর্পণ করবে তবে তোমাকে এতখানি আমি ভালবাসতে পারতাম না...

গিদো

হ্যাঁ আপনি আমার পিতা। আর একথা আপনি প্রমাণ করেছেন। কারণ আপনিও মৃত্যুকে বরণ করে নেবেন। আমি এ উৎকট শর্তটি প্রত্যাখ্যান করছি। আপনি শত্রু-শিবিরে ফিরে যাবেন। সেখানে ফ্লোরেন্স আপনার ভাগ্য যা নির্দ্ধারণ করে রেখেছে তাই ভোগ করুন...

মার্কো

বৎস! এ ব্যাপার শুধু আমাকে নিয়ে। আমি ত এক অপদার্থ বৃদ্ধ, আমু আমার বনিয়ে এসেছে. আমি কারও কিছু কাজে আসব না...তাই আমি নিজেকে বুঝাই যে বরং পুরাতন পাগলামিটির সাথে মিলিয়েই না চলি, যা করা উচিত তা না করে—এটাই ত বুদ্ধিমানের পন্থা...আমি জানিনে কেন সেখানে আমি যাব...এ স্থবির দেহটির মধ্যে প্রাণটি আমার অতিমাত্র নবীন হয়েই আছে: সুবুদ্ধি যে যুগের ধর্ম্ম আমি কিন্তু তা হতে বহুপূর্ব্ববর্ত্তী...কিন্তু আমার দুঃখ এই—অতীতের গমস্তখানি শক্তি এ কুবুদ্ধি-প্রণোদিত অঙ্গীকারটি ভঙ্গ করতে বাধা দিচ্ছি...

গিদো

আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করব।

মার্কো

তুমি কি বলতে চাও?...

গিদো

আপনি যা করছেন আমিও তাই করব। আমিও এই অতীতের প্রেরণাকেই মেনে চলব। আপনার এ সকল বিদ্রূপ বলে বোধ হয় কিন্তু তবুও সৌভাগ্যক্রমে এখনও আপনার উপর তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ...

মার্কো

আমার উপর এদের প্রভাব আরও বেড়ে যায় যখন অন্য লোকের কথা ওঠে। আর তোমার মধ্যে জ্ঞানযোগ ফুটিয়ে তুলবার জন্য যদি মনে কর যে বৃদ্ধের কথা না রাখার মত তুচ্ছ বলিদানটি তোমার চাই তবে পণরক্ষার প্রতিজ্ঞা হৃদয় হতে আমি বিসর্জ্জন দিলেম। আর তুমি যতই করনা কেন আমি সেখানে যাব না...

গিদো

পিতা, যথেষ্ট হয়েছে। আমার মুখে এমন সব কথা আসছে যা বংশবৃদ্ধি পিতার সম্মুখে কোন পুত্রেরই বলা উচিত নয়।

মার্কো

পুত্র, ক্রোতে তোমার হৃদয় থেকে যে সব কথা উথলে উঠছে সে সবই আমাকে বল। তোমার বেদনার কথা ন্যায্য, তারই চিহ্ন স্বরূপ আমি তাদের গ্রহণ করব...তোমার উপর আমার যে ভালবাসা তা তুমি আমায় কি কথা বলবে তার উপর নির্ভর করবে না...আমায় অভিশাপ দাও। কিন্তু তোমার অন্তর থেকে যে কঠোর বাণী নির্গত হবে তার পরিবর্তে সেখানে সুবুদ্ধি, শোভন মহানুভবতা যেন আসনটি পায় তা দেখো...

গিদো

আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট। আর কিছু আমি শুনব না। আপনি ভেবে দেখুন। নিজের মনে এঁকে দেখুন আমায় দিয়ে যে কাজটি করাতে আপনার অভিলাষ। এ মুহূর্তে আপনারই সুবুদ্ধির অভাব, সে মহীয়ান গম্ভীরান ভাবুকতার অভাব, মৃত্যুর আশঙ্কা আপনার সকল জ্ঞানকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। আমার নিজের সম্বন্ধে, মৃত্যু আমাকে আপনার চেয়ে কমই চিন্তাকুল করে। বয়স আর বৃথা গ্রন্থপাঠের ফলে সাহস যখন আপনার মধ্যে মন্দীভূত হয়ে আসেনি তখন আপনি সে সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা আমি স্মরণে জাগিয়ে তুলতে পারব। এ কক্ষে আমরা একাকী। আপনার হৃদয়দৌর্বল্য কারো নজরে পড়েনি। আমার কর্মচারী দু'জন আমার মতই একখাটি গুপ্ত রাখবে। কিন্তু হায়, এ গুপ্তকথা বেশীদূর বহন করে আমাদের চলতে হবে না। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এ বিষয়টি চাপা দিয়ে রাখি। আসুন এখন আমরা আমাদের শেষ সংগ্রামের কথা বলি...

মার্কো

না বৎস, এ কথাকে চাপা দেওয়া যায় না। কারণ বয়স আর নিরর্থক গ্রন্থপাঠ আমায় শিখিয়েছে যে যে-কারণেই হোক একটি মানবপ্রাণকেও এই রকম করে সমাহিত করা উচিত নয়। তোমার যদি এই বিশ্বাস যে তুমি শুধু যে রকম সাহসকে সম্মান করে চল সে সাহস আমার নাই, তবে আমারও অন্য রকম সাহস আছে। বোধহয় তা তেমন জমকাল নয়, মানুষ তার সুখ্যাতিও বোধকরি তেমন পায় না। কারণ তা হতে অনিষ্ট কমই হয়, আর মানুষ সেই জিনিস পূজা করে যা তাদেরকে কষ্ট দেয়...আর এই সাহসের প্রসাদে আমি আমার কর্তব্যের অবশিষ্টাংশটুকু সম্পাদন করব।

গিদো

অবশিষ্টাংশটুকু কি?

মার্কো

নিরর্থক যে কর্মটি আরম্ভ করেছি তা আমি এই শেষ করছি। তুমি ছিলে একজন বিচারক মাত্র, কিন্তু একলা তুমিই বিচারক নও। আর এক মুহূর্তে যাদের জীবন

মরণের ব্যবস্থা হচ্ছে তাদের সকলেরই জানার অধিকার আছে তাদের ভাগ্য কি, কিসের উপর তাদের উদ্ধার নির্ভর করছে...

পিদো

আমি ভাল বুঝলেম না। অন্ততঃ আমি আশা করি আমি এখন পর্য্যন্তও বুঝি নাই ...আপনি বলছেন?...

মার্কো

আমি বলছি এ কক্ষ হতে বের হয়ে আমি পুরবাসী সকলকে জানাব যে প্রিন্সিভাল আমার কাছে কি সন্ধিপ্রস্তাব করেছিল আর তা তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ।

পিদো

উত্তম। এবার আমি বুঝেছি। দুঃখের কথা বৃথা বাক্যব্যয়ে আমরা এতদূর এসে ঠেকেছি। আর এও দুঃখের কথা যে আপনার মস্তিষ্কবিকৃতির ফলে গুরুজনের প্রতি যে সম্মান দেখান আমার উচিত ছিল তা পারছি না। কিন্তু যে পিতা ভুলপথে চলেছে পুত্রের কর্ত্তব্য তাঁর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাঁকে রক্ষা করা। এ ছাড়া পিসানগরী যতক্ষণ মাথা তুলে, ততক্ষণ আমিই তার প্রভু, তার মান রক্ষার ভার আমারই উপর। যোর্গো! তোরেল্লো! আমার পিতাকে তোমাদের জিম্মায় দিলাম। যে পর্য্যন্ত তাঁর বুদ্ধি না ফিরে আসে সে পর্য্যন্ত তোমরা তাঁকে চোখে চোখে রাখবে। কোন ব্যাপারই ঘটেনি, কেউ কিছু জানবে না। পিতা, আপনাকে আমি মার্জ্জনা করলেম। যখন সেই সব দিনের স্মৃতি আপনার মধ্যে পুনরায় জেগে উঠবে যখন আপনি আমাকে নির্ভীক ও স্বেচ্ছায় দুর্ব্বলতার অধীন না হতে শিক্ষা দিয়েছিলেন সে শেষ মুহূর্ত্তে আপনিও আমাকে মার্জ্জনা করবেন।

মার্কো

পুত্র, সে শেষ মুহূর্ত্ত আসবার পূর্ব্বেই তোমায় আমি বর্জ্জন করলেম। তুমি যা করেছ আমিও তাই করলেম। তুমি আমার কারারুদ্ধ করবে। কিন্তু আমার এ গুপ্ত কথা উন্মুক্ত। আমার কণ্ঠরোধ করার সময় আর যে নেই।

পিদো

এ কথার অর্থ?

মার্কো

এই মুহূর্ত্তেই সামন্তমণ্ডলী প্রিন্সিভালের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করছেন।

পিদো

সামন্তমণ্ডলী? কে তাদের একথা বুঝিয়েছে?

মার্কো

আমি স্বয়ং। তোমাকে জানাবার পূর্বেই...

গিদো

না। এ কখনও সম্ভব নয় যে মৃত্যুভয়, বৃদ্ধত্ব আপনার হৃদয়ে যে-ভাঙন ভুড়ে দিয়েছে তারা আপনাকে এতদূর পর্যন্ত ক্ষিপ্ত করে তুলেছে যে আমার একমাত্র সুখ, আমার সকল প্রেমপ্রিয়া, সকল আনন্দ, আমাদের যুগল জীবনের সকল নির্মলতা আপনি বয়ে দিয়েছেন অপরিচিতজনের হাতে আর তাদের সে-সকলকে উদাসীনচিত্তে ওজন করবার জন্য পরিমাপ করবার জন্য—ঠিক যেমন দোকানে বসে তারা নুন ওজন করে, তেল মাপ করে!...একথা আমি এখনও বিশ্বাস করিনে...যে পর্যন্ত স্বচক্ষে না দেখি সে পর্যন্ত বিশ্বাস করব না...আর যদি নিজ চোখেই দেখি তবে এই যে সাপিট ঘৃণিত বস্তুটি আমাদেকে আজ সকল রকম কুৎসিৎ পঙ্কে নিমজ্জিত করেছে তাকে আমি যে নয়নে দেখি তা অপেক্ষা বেশী বিস্ময়াকুল সেই ভীতিবিহ্বল নয়নে দেখব আপনাকে—আপনি যিনি আমার স্থবির পিতৃদেব, যাকে আমি ভালবেসেছি, যাকে আমি চিনি বলে করেছি, যার সাদৃশ্যে নিজেকে একটুমাত্র গড়ে তুলবার জন্য কত প্রাণপণ করেছি!

মার্কো

তুমি ঠিক বলেছ বৎস। আমাকে তুমি সম্পূর্ণ ভাবে চিনতে পারনি। আর এ ত্রুটির জন্য নিজেকেই আমি দোষী বলে করি। বার্ধক্য যখন এসে উপস্থিত হল তখন প্রতিদিন সে মানুষের জীবন সম্বন্ধে, প্রেম সম্বন্ধে, সুখ সম্বন্ধে, দুঃখ সম্বন্ধে আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে তার কিছুই তোমাকে জানাইনি...এই রকমে ঢের মানুষ সচরাচর জীবন কাটায়। যাদেকে ভালবাসে কাছে থেকে, যে সকল জিনিস তাদেকে বলা প্রয়োজন ঠিক সেই জিনিষগুলিই তাদেকে বলে না...মানুষ চলেছে অতীতের কোলে তন্দ্রাবেশে। সে মনে করে তার নিজের মতনই আর সব জিনিষও পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। আর যখন কোন দুর্ঘটনা তোমার তন্দ্রা ভেঙে দেয় তখন তুমি বিচলিত হয়ে দেখ যে পরস্পর পরস্পর থেকে কতদূর তোমরা, পৃথক...আমার অন্তরে যে পরি-বর্ত্তন সব হয়েছে, যে মোহঘোর সব একে একে খসে পড়েছে, তাদের স্থানে সত্যকার জ্ঞান ফুটে উঠেছে সে সব যদি তোমাকে কিছুদিন আগে বলতেম তবে ত আজ তোমার সম্মুখে তোমার ঘৃণার পাত্র অভাগার মত প্রতীয়মান হতেম না...

গিদো

আমার সৌভাগ্য আপনাকে আমি এত বিলম্বে চিনতে পেরেছি...সে জন্য আমি সুখী। সামন্তমণ্ডলী কি স্থির করবেন তা আমি এখন হতেই জানি। একটিমাত্র মানুষ বলি দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার মত সহজ কাজ আর কি আছে; পরোপকারী বুদ্ধি যাদের সম্বল, নিজের ভাণ্ডারের প্রতি চেয়ে যারা কেবল ক্ষুণ্ণ তাদের অপেক্ষাও

সাহস বীর্য্য যাদের আছে তারাও প্রলোভনের সম্মুখে আত্মরক্ষা করতে পারে না। কিন্তু এর জন্য আমি তাদের কাছে ঋণী নই! কারও কাছে নয়। তাদের আমি দিয়েছি আমার রক্ত আর আমার অনিদ্র নিশি; এ দীর্ঘ অবরোধজনিত যে প্লানি, যে কষ্ট সে সবগুই তাই যথেষ্ট। তাই সব। তার বেশী যা তা আমার প্রাপ্য। আমি তাদেকে জানাব না। এ কথা ভুলে যাব না যে এখনও আমিই নেতা;— অন্ততঃ আমার নিজের ভিসশ স্রাদিওত সৈন্য আছে। তারা চেনে কেবল আমার কথা। কাপুরুষদের কথা তারা কখন শুনবে না!...

মার্কো

বৎস তুমি ভুল বুঝেছ। এই যে পিসার সামন্তবর্গণী, তারা কি সিদ্ধান্ত করবে তা না জেনেই তুমি যাদেকে ভীরু বলে অবজ্ঞা করেছ কিন্তু তারা বিপৎকালে মহানুভবতা ও শুচিতারই পরিচয় দিয়েছে। একজন নারীর প্রেম ও সম্ভ্রমকে বলি দিয়ে তারা আপনাদের পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করে নাই আর তোমার সাথে দেখা করার জন্য যে সময়ে তাদের কাছ থেকে চলে আসি ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তারা নগরীর ভাগ্য তার হাতে তারা সমর্পণ করতে ও কথা বলবার জন্য ভান্যাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

গিদো

কি!...এত তাদের স্পর্দ্ধা! আমি যখন অনুপস্থিত তখন কিপ্ত ভণ্ডের পৈশাচিক কথা সব তার সম্মুখে উচ্চারণ তাদের!...আমার ভান্যা!...আমার স্মরণে পড়ে তার সেই মুখমণ্ডল যা একটি দৃষ্টিপাতে লজ্জারক্ত হয়ে উঠে। সকল সময়ের ছায়া যার উপর লীলায়িত, প্রতিনিয়ত তাতে তার কান্তি কমনীয়তর হয়ে উঠছে। মন্দ জল্ চক্ষুসার বৃদ্ধ সব, অল্পপ্রাণ ব্যবসাদার মুখে কপট হাসি তারা যে দেবোদ্দিষ্ট সামগ্রীটির ন্যায় তাকে শঙ্কা ক'রে চলে।... তারাই তাকে মুখ ফুটে বলবে: "যাও একলা যেমন ভাবে চেয়েছে, উলঙ্গভাবে"... অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় সে তনুখানি বাসনার অবলেপে কেহ স্পর্শ করতে পারে নাই সে তনুখানি তাকে গিয়ে উৎসর্গ কর। আমি তার পতি, আমি যখন তার আবরণ উন্মোচিত করতে গিয়েছি তখন পাছে কোন অনাহত চঞ্চলতা তাকে মলিন করে করে ফেলে এই ভয়ে প্রার্থনা করেছি —আমার হাত দু'খানি আমার চক্ষু দু'টি যেন শুদ্ধ পবিত্র থাকতে পারে...আর যে মুহূর্ত্তে আমি এই সব কথা বলছি তখনই তারা সকলে তাকে বলছে...তারা স্থির-প্রতিজ্ঞ, তারা মহানুভব; সে যদি না যেতে চায় তবে তাকে জোর করে তারা পাঠাবেনা কিন্তু আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তারা কি করে জোর করবে?...তারা চায় শুধু তার সম্মতি,...কিন্তু আমার সম্মতি, কে তা চেয়েছে?...

মার্কো

বৎস, আমি কি চাই নি? আর আমি-যদি না পাই, সমরমত তারাও সকলে আসবে...

গিদো

আমার আশা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দুজনের ঘরে তারা নিশ্চয়ই উত্তর দিয়েছে।

মার্কো

আমার আশা তাই, শুধু তুমি যদি তার উত্তর মেনে নিতে আপত্তি না কর।

গিদো

তার উত্তর!...এতেও তবে আপনার সন্দেহ? আর আপনি না তাকে জানেন। আপনিই না তাকে দিনের পর দিন দেখেছেন। সেই প্রথম যেদিন ফুলে সর্বাঙ্গ ঢেকে হৃদয়ে একমাত্র প্রেমধন পেয়ে স্মিত বদনে এই কক্ষে পদার্পণ করে, যেখানে আপনি এসেছেন এখন তাকে বিক্রি করতে, যেখানে আপনার সাহস হচ্ছে সন্দেহ করতে কি হবে বাপের কাছে মেয়ের অনিবার্য্য একটি উত্তর, যে বাপ ভুলে গিয়েছেন তার মেয়ের জন্য কামনা করতে এমন...

মার্কো

বৎস, লোকে নিজের মধ্যে যা দেখে পরের মধ্যে তাই দেখে। একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন মানুষ জানে বিভিন্ন রকমে, নিজের চেতনার চূড়া অবধি...

গিদো

ঠিক সেই জন্যই আপনাকে আমি ভাল চিনতে পারিনি। আমার চোখ ফোটানর জন্য বারবার দুইবার দুইটি সবান নির্মম ভুলের প্রয়োজন হয় তবে, ভগবান আমার চোখ যেন চিরদিনই নিমীলিত থাকে!

মার্কো

বৎস, আরও বৃহত্তর জ্যোতির পরশেই তা ফুটে উঠবে।...আমি এসব কথা বলছি, তার কারণ আমি তার মধ্যে এমন এক শক্তি দেখেছি, তুমি তা দেখ নাই; আর সেই-জন্যেই সে যে উত্তর দিবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই...

গিদো

আপনার যদি কোন সন্দেহ না থাকে তবে আমারও কোন সন্দেহ আর নাই। আমি তার উত্তর স্বীকার করলেম এইখানেই, আগে হতেই, অন্তভাবে, অধিষ্ঠাতাভাবে, অপ্রতিষ্ঠার্থ্যরূপে। আর আমার উত্তর যদি একই না হয় তবে বুঝব প্রথম দিন হতে এই শেষ মুহূর্ত অবধি আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝে এসেছি। মিথ্যা এখন খসে পড়তে চলেছে। তাহলে বুঝব তার মধ্যে যে সকল জিনিষ ছিল আমার আপনার ধন সে সবই ছিল শুধু এইখানে, এই অতিমাত্র বিশ্বাসপ্রবণ মস্তিষ্কের মধ্যে এখন যা

পাগল হয়ে উঠেছে, আমার এই অভাগা হৃদয়ের মধ্যে, যার ছিল শুধু একমাত্র সুখ, যে একটা ছায়াকে কেবল ভালবেসে এসেছে।

৬৩

তৃতীয় দৃশ্য

অনুরূপ, ভান্না

(বাহিরে শোনা গেল জনতার গুঞ্জন ধ্বনি 'মোনা ভানা'। ভিতরে দরজা খুলিলে দেখা গেল কক্ষের মধ্যে ভানা আগাইয়া আসিতেছে, একাকী পাংশুবর্ণ, দ্বারোপান্তে অনির্দিষ্ট স্ত্রীপুরুষ জনতার ঠেলাঠেলি, অথচ প্রবেশের তাদের সাহস নেই)

গিদো

(ভানাকে দেখিয়া ছুটিয়া তার কাছে গেল, তার দুটি হাত নিল নিজের হাতে, তার মুখে দিল আদরের স্পর্শ, আবেগভরে তাকে করিল আলিঙ্গন)

ভান্না আমার !...তারা কি করছে ?...না, না, যা তারা বলছে সে সব আমার মুখে এনো না !...এস ত, দেখি তোমার ললাট, আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাও... আহা, দেবজনেরা যেখানে অবগাহন করেন সেই সলিলরাশীর মত অপাপবিদ্ধ ! আমার যা কিছু প্রিয় তার উপর কোন কালিমার লেপ তারা দিতে পারে নাই। আকাশের দিকে চিল ছুঁড়লে তা যেমন এক মুহূর্তের জন্যও সে দীপ্ত নীলিমা কান্তিকে বিক্ষুব্ধ করে না তাদের কথা সব তেমনই বৃথাই নিক্ষেপিত হয়েছে। আমি কি বলতে পারি এ নয়নযুগল দেখে আদৌ কিছুই জিজ্ঞাসা করা আসেনি... উত্তরের জন্য তারা কিছু পীড়াপীড়ি করেনি। তোমার অমন দৃষ্টিই যথেষ্ট উত্তর। এ দৃষ্টি তাদের চিন্তা ও তোমার চিন্তার মধ্যে এমন এক জ্যোতির প্রেমের সাগর সৃষ্টি করে দিয়েছে তা হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়...কিন্তু এখন, চেয়ে দেখ, কাছে এস...এখানে আমার এক ব্যক্তি আছেন যাকে আমি পিতা বলে ডাকি...দেখ, তিনি মাথা নিচু করছেন, শুধু বেশে আপনাকে ঢেকে রাখছেন... তাঁকে মার্জনা করতে হবে। তিনি বৃদ্ধ, নিজেকে বোঝেন না...তাঁকে আমাদের করুণা দেখান উচিত...যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত তিনি আমাদের হতে এত দূরে সরে পড়েছেন যে তোমার চোখ দেখেও তিনি আশ্বস্ত হতে পারছেন না। তিনি আর আমাদেরকে চেনেন না। শ্রাবণের বারিধারা যেমন আমাদের প্রণয়ও তেমনি তাঁর দৃষ্টিহারা বার্ধক্যের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে...সে প্রণয়ের একটি কিরণলেখাও তিনি কখন ধরতে পারেন নি : আমাদের একটি চুম্বনও তাঁর চোখে পড়ে নি... তিনি মনে করেন যারা ভালবাসে না তাদের ভালবাসা যেমন আমাদের ভালবাসাও তেমনি...বুঝতে হলে তিনি চান কথা। তিনি চান উত্তর...যাও, বল তাকে তোমার উত্তর।

ভান্না (মার্কোর নিকট যাইয়া)
আমি আজ সন্ধ্যাকালে যাব...

মার্কো (ললাটে চুম্বন পূর্ব্বক)
বৎস, আমি তা জানতেম...

গিদো
কি ?...তুমি কি বললে ?...আমার হয়ে না তাঁর হয়ে তুমি কথা বলছ ?

ভান্না
তোমারও হয়ে গিদো...আজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর কথামত...

গিদো
কার ? এখানেই ত সব। আমি এখনও বুঝতে পারছি নে...

ভান্না
আজ সন্ধ্যায় আমি খ্রিষ্টিভালের শিবিরে যাব।

গিদো
সে যেমন চেয়েছে তেমনি ভাবে নিজেকে তার কাছে বলি দিতে ?

ভান্না
হাঁ তাই।

গিদো
তার সাথে মরতে ?...আগে তাকে খুন করে তারপর ?...এ কথা আমার মনে হয় নাই...এইটুকু...আহা শুধু এইটুকু—তা হলে আমি সব বুঝব...

ভান্না
আমি তাকে খুন করব না...নগরী তার হাতে যে।

গিদো
কি ?...এ তুমি !...তবে তুমি তাকে ভালবাস ? তাকে ভালবাসতে...কতদিন হতে তুমি তাকে ভালবাসতে ?

ভান্না
আমি তাঁকে চিনি না আমি তাকে কখন দেখি নাই।

গিদো

তবে তুমি জান সে কেমন পুরুষ?...নিশ্চয়ই তারা তোমায় বলেছে...তোমায় বলেছে সে...

ভান্যা

কে যেন আমায় এই সেদিন বললে সে বৃদ্ধ। এর বেশী আমি কিছু জানি না...

গিদো

সে বৃদ্ধ। ...সে যুবা, সে সুন্দর পুরুষ...আমার চেয়ে অল্প বয়স...কিন্তু কেন সে আর কোন জিনিষ আমার কাছে চাইল না! আমি তাহলে নিজে সেখানে যেতেম। আমাদের নগরটি রক্ষার জন্য গড় করে, নতজানু হয়ে...আমি একা, এদেশ ছেড়ে চলে যেতেম। একা, তোমার সাথে সাথে কাঙাল আমি সুদূরের পথে পথে ঘুরে, জনহীন পথে মুষ্টিভিক্ষা করতেম...কিন্তু এ কি পৈশাচিক বীভৎস পরিকল্পনা! কখন কোন সময়, কোন গল্পে কোন কোন বিজয়ী পুরুষকে... (ভান্যার নিকট গিয়ে ও তাকে আলিঙ্গন করে) ওঃ ভান্যা! ভান্যা আমার! আমার এখনও বিশ্বাস হয় না! ...এ তোমার কথা নয়!... আমি কিছুই শুনি নাই, তবে সব যেমন তেমনি আছে...দেয়ালের ভিতর থেকে আমার পিতারই কণ্ঠস্বর শুধু বেরিয়েছে...বল, আমি ভুল শুনেছি, বল যে এমন লজ্জাকর কর্ম্মের সম্মুখীন হয়ে আমাদের সব ভালবাসা, তোমার সব সতীত্ব বলছে 'না', উচ্চরবে ঘোষণা করছে 'না'। আমি একটা বিলম্বিত প্রতিধ্বনি মাত্র শুনেছি...অকুণ্ঠ নিস্তব্ধতাকেই তোমার কণ্ঠ এই জীর্ণ করতে চলেছে। দেখ, সকলেই কান পেতে আছে। কেউ কিছু জানেনা, তোমার প্রথম কথাটি এখনও বলবার আছে।...শীঘ্র বল সে কথাটি, ভান্যা। তারা সকলে তোমাকে চিনুক। বল শীঘ্র, ভান্যা, জানুক তারা আমাদের ভালবাসা, ভেঙ্গে যাক দুঃস্বপ্নটি...আমি যে কথাটির অপেক্ষায় আছি, যে কথাটি বলা উচিত বল সেই কথাটি, আমার যা সব চুরচুর হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে তাকে যেন আমি তুলে ধরতে পারি...

ভান্যা

আমি খুব জানি, গিদো, তুমি বহন করছ সব চেয়ে যা গুরুভার...

গিদো (তাকে প্রবৃত্তিবশে ঠেলিয়া দিয়া)

কিন্তু আমি যে তা একাই বহন করছি। যে ভালবাসে তাকেই দেখছি সব ভার বহন করতে হয়। ...তুমি আমাকে ভালবাস নাই...যাদের হৃদয় নাই তাদের এতে কিছুই আসে যায় না...এ যে অপ্রত্যাশিত...বোধহয় এ একটা উৎসব...ওঃ! এ উৎসব কি করে বাধা দিতে হয় তা আমি জেনে নেব! ...লোকে যাই বলুক, লোকে যাই করুক, আমি এখনও নেতা। আর আমি যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করি তবে

তুমি বলবে কি ? আমি যদি তোমাকে সেখানে আবদ্ধ করি, সেই সুন্দর কারাগারে, এ কক্ষটির নীচে সেই রক্ষীর কারা, সেই সুশীতল অন্ধকূপ সকলের মধ্যে, আর প্রত্যেক গরাদে দেওয়া দরজার সম্মুখে আমার সৈন্যদিগকে স্থাপন করি ? আর আমি যদি বসে সেখানে অপেক্ষা করি, দেখি তোমার তেজ নিবে আসছে, তোমার বীরত্ব ক্রমে শীতল হয়ে উঠছে ? ...বেশ তাই হোক। এই আমার শেষ কথা, আমার হুকুম... যাও আমার আজ্ঞা পালন কর।

ভান্না

গিদো তুমি ত বেশ জান...

গিদো

তারা আমার কথা শুনছে না ? ...কেউ আমার আদেশ পালন করে নি ? তুমি, বোর্গো, তুমি তোরেল্লা, তোমাদের হাড় কি পাথরে গড়া ? ...আমার কণ্ঠধ্বনি কি আর কেউ শুনতে পায় না। ...আর তোমরা আর সকলে ওখানে যে দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে, তোমাদের শ্রবণে কি আমার কথা পশে না ?...আমার চীৎকারে যে পাহাড়ও দ্বিখণ্ড হয়ে যায়। ভিতরে এস সকলে, ধর তাকে, যে পার ধর।... বুঝলেম, ওদের ভয় হচ্ছে ! হাঁ্যা, ওরা চায় প্রাণে বেঁচে থাকতে ? ওরা বেঁচে থাকবে কিন্তু আমি যে মরতে বসেছি।...ভগবান। এ ত খুবই সহজ কর্ম-কাজ ! সমস্ত জনতার বিরুদ্ধে একজন। ...একজন সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করছে ! ...কিন্তু আমি কেন আর তোমরাই বা না কেন ?... তোমাদের সকলের ত পত্নী আছে।

(অসি অর্দ্ধনিবারিত পূর্ব্বক তার দিকে অগ্রসর হইয়া) আর আমি যদি বুঝি অসম্মানের অপেক্ষা তোমার পক্ষে শ্রেয়।...এ কথা তোমার মনে হয় নাই...কিন্তু দেখ, চেয়ে দেখ...শুধু একটু ইঙ্গিত করলেই...

ভান্না

গিদো, যদি ভালবাসা তোমাকে আদেশ দেয় তবে তাই করো...

গিদো

যদি ভালবাসা তোমাকে আদেশ দেয়।...যে ভালবাসা তুমি চেন নাই সে ভালবাসার কথা তোমার মুখেই সাজে।...তুমি কখনও ভালবাস নাই।...আজ তোমাকে আমি দেখছি মৃত্তিকা অপেক্ষাও তুমি ঊষর, তার মধ্যে আমি সব।...কিছু নাই।...এক বিন্দু অশ্রুকণাও নাই ! ...আমি ছিলাম আশ্রয়স্থল স্বরূপ...এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি...

ভান্না

গিদো, তুমি দেখছ না কি, আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না...চেয়ে দেখ আমার মুখখানি...আমার শরীর হয়ে উঠছে, আমি মরতে বসেছি...

গিদো (সহসা তাকে বাহুবদ্ধে লইয়া)
এস ভান্যা ! আমার বাহুমধ্যে...সেখানেই যে তুমি আবার জীবন পাবে...

ভান্যা (দূরে সরিয়া এবং কণ্ঠে কঠিন হইয়া)
না, না, না, না, গিদো...আমি জানি...না বলতে পারি নে...আমি চাই...আমি ভেবে দেখেছি, আমি জানি তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমা হতে আমার সব... আমি বোধহয় বীভৎস...তবুও আমি যাব। যাব। যাব!

গিদো (তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে দিতে)
বেশ, যাও তবে, যাও, দূরে চলে যাও। যাও যেখানে আমি সব দিলেম, আমি তোমার বিসর্জন দিলেম...

ভান্যা (তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া)
গিদো...

গিদো (তাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া)
ওঃ ! তোমার উষ্ণ ও সুকোমল হাতখানি দিয়ে আর আমাকে ধরে রেখো না... পিতা ঠিকই বলেছেন...তিনি তোমার ভাল চিনতেন...পিতা, এই ধরুন...পিতা, এ আপনারই হাতে গড়া জিনিষ...আপনার রচনা আপনিই সম্পূর্ণ করুন, শেষ পর্য্যন্ত নিয়ে চলুন...একে শিবির অভ্যন্তরে সঙ্গে নিয়ে যান...আমি এখানেই থাকব : আমি আপনাদেকে যেতে দেখব...কিন্তু মনে করবেন না যে—আহার্য্যের জন্য সে তাকে মূল্য দিতে চলেছে তার কোন অংশ আমি পূর্ণ করব...আমার আছে এক জিনিষ, আপনি শীঘ্রই জানতে পারবেন...

ভান্যা (তার সন্নিকটস্থ হইয়া)
গিদো, চেয়ে দেখ আমার...তোমার চোখ ঢেকে রেখো না...এই এক ভয়ে চেয়ে দেখ...আমি দেখতে চাই...

গিদো (স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখিয়া আরো অনাসক্ত ভাবে দূরে সরিয়া)
দেখ,...যাও চলে, আমি আর তোমায় চিনি না...সময় হয়ে এল, সে অপেক্ষা করছে, সন্ধ্যা ঘিরে আসছে...কোন ভয় নাই...কোন আশঙ্কা করো না...আমার চোখ দেখে কি মনে হয় আমি কিছু পাগলামী করতে যাচ্ছি ? ...ভালবাসা ভেঙ্গে যাচ্ছে বলে কেউ কি কখন মরে ? চিত্ত বিক্ষিপ্ত হতে থাকে মানুষ যখন ভাল-বাসে...আমার চিত্ত স্থির হয়ে এসেছে...প্রেমের আমূল পর্য্যন্ত আমি দেখেছি, প্রেম আর সরল...আমার আর কিছু বলবার নাই...না, না, তোমার আঙুলগুলি

756.3/002/25

নেবুফুল...যে প্রেম বিদায় নিয়েছে তাকে আর ধরে রাখা কেন? ...এই শেষ: সব শেষ...তার চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই, সমস্ত অতীত সমস্ত ভবিষ্যৎ অতলে ডুবছে... আহা। এই যে ছোট ছোট সব আঙুল, এই যে নিশ্চল নয়ন, এই যে অধর...এক সময়ে আমি মনে করেছিলাম...আর আমার কিছুই নাই...(ভানুর দুটি হাতই সরাইয়া দিয়া) কিছুই নাই, কিছু মতেও কিছু নাই...বিদায়, ভানু, যাও চলে, বিদায়...তুমি সেখানে যাবে?

ভানু

যাব...

গিদো

ফিরে আসবে না?

ভানু

আসব...

গিদো

দেখা যাবে...আঃ এ বেশ...দেখা যাবে...কে আমায় বলতে পারত যে পিতা তাকে আমার চেয়ে বেশী ভাল চিনতেন?...

(সে গিয়ে প্রস্তরস্তম্ভের গায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। ভানু তার দিকে না তাকাইয়া একাকী ধীরে চলিয়া গেল)

।। প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ।।

P8447

(ক্রমশঃ)

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone : 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

•

16/1 Chandranath Chatterjee Street
Calcutta-25

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-73

Phone: 34-3720

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সমগ্র রচনাবলী

পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

★

অমলেশ ভট্টাচার্য

নিঃসঙ্গ আকাশ

নিঃসঙ্গ আকাশের মতোই উদার উন্মুক্ত চেতনার সুরে
রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

★

রমেন সেনগুপ্ত

প্রণতি

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত কাব্যগ্রন্থ
মূল্য ৩·০০ টাকা

★

অণিমা মজুমদার

মঞ্জিরা

(কাব্যগ্রন্থ)

★

সমীরকান্ত গুপ্ত

কাব্যলোকে

মূল্য : ৮·০০

শতাব্দীর পূজা

শ্রীমা ও আশ্রম প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ, মূল্য : ৪·০০

★

কৃপাসিন্ধু অনিলবরণ

শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের অলৌকিক কৃপা

১৯২ পৃষ্ঠায় একটানা কাহিনীর মধ্যে [illegible] অলৌকিকতার

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ [illegible]
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

শ্রীঅরবিন্দ ভবন
৮ শেক্সপীয়র সরণী
কলিকাতা—৭১

[illegible]
৬৩ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২